ময়ূখ চৌধুরী

কমিক্স-সমগ্র

নারায়ণ দেবনাথ চিত্রিত ময়ূখ চৌধুরী

এক সময়ের বাংলা কিশোর সাহিত্যে সুপরিচিত নাম। 'প্রসাদ রায়' নামটা অপরিচিত ঠেকবে না তখনকার কিশোর, আজকের প্রবীণত্বকে ছুঁয়ে ফেলা পাঠকদের কাছে, কারণ এ-নামেই অলংকরণের কাজ করেছেন তিনি।

আসলে এই দুই ছদ্মনামের আড়ালেই থেকে গিয়েছেন শক্তিপ্রসাদ রায়চৌধুরি।

বাংলা চিত্রকাহিনি বা কমিক্‌সের জগতে প্রবেশ 'সন্দেশ' পত্রিকার প্রথম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, মার্চ, ১৯৬২ 'ঋণশোধ' কমিক্‌সটি প্রস্তুতের মাধ্যমে। সময়টা উল্লেখ করার মতো কারণ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ওই বছরই সত্যজিৎ রায় নতুন ভাবে 'সন্দেশ'-এর পুনঃপ্রকাশ শুরু করেন যিনি ছিলেন ময়ূখ চৌধুরীর গুণগ্রাহী।

কমিক্‌স বস্তুটি বাংলার পাঠকমহলে সে-রকম সমাদৃত ছিল না। অপরিণত বাংলা কমিক্‌সকে পাশ্চাত্য কমিক্‌সের আধুনিকতা ও কারিগরিক বৈশিষ্ট্যে গঠন করে পত্রপত্রিকার বহু পাতায় পরিবেশন করলেন ময়ূখ চৌধুরী।

অভিযান বা আরণ্যজীবন, নগর, গ্রাম, গ্রহান্তর থেকে ইতিহাসের প্রান্তর— রোমাঞ্চকর স্বরচিত মৌলিক কাহিনিভিত্তিক ময়ূখের কমিক্‌সগুলি প্রায় তিন দশক ধরে কিশোর পাঠকদের রোমাঞ্চিত করে রেখেছিল। ছবির অসাধারণত্বই শুধু নয় তাঁর সাবলীল ও ছন্দময় ভাষাও কমিক্‌সগুলির অনন্য সম্পদ... যে-ভাষাতে বেশ কিছু কিশোর সাহিত্যও সৃষ্টি করেছেন ময়ূখ, করেছেন কিছু স্বচ্ছন্দ অনুবাদও।

পুরোনো দিনের সেই রোমাঞ্চকে কয়েকটি খণ্ডে পাঠকদের কাছে ফিরিয়ে দেবার পরিকল্পনা করেছে 'লালমাটি' প্রকাশন। তার ফসল রূপেই ময়ূখ চৌধুরীর 'কমিক্‌স সমগ্র'-১ম খণ্ড প্রকাশিত হল।

ময়ূখ চৌধুরী

কমিক্স-সমগ্র

১

প্রমা

ময়ূখ চৌধুরী
কমিক্স-সমগ্র
১

সম্পাদনা

বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায়

সৌম্যেন পাল

লা ল মা টি

Mayukh Chowdhury Comics-samagra
Edited by
Biswadeb Gangopadhyay
Soumen Paul

ISBN 978-93-81174-13-5

আন্তর্জাতিক কপিরাইট কনভেনশন অনুযায়ী সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

প্রথম প্রকাশ
কলকাতা বইমেলা ১৪১৮
জানুয়ারি ২০১২

গ্রন্থনা স্বত্ব
লালমাটি

প্রকাশক
নিমাই গরাই
লালমাটি প্রকাশন
৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০৭৩
ফোন ২২৫৭ ৩৩০০ / ৯৮৩১০২৩৩২২

গ্রাফিক্স
সুব্রত মাজী
১২এ গৌর লাহা স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ
ময়ূখ চৌধুরী অঙ্কিত চিত্র অবলম্বনে

মুদ্রক
নিউ রেনবো ল্যামিনেশনস
৩১এ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

দাম : ৪০০ টাকা

ভূমিকা

ময়ূখ চৌধুরী নামটি শুনলেই আমাদের বাল্যস্মৃতির আকাশে ভেসে আসে তাঁর আঁকা অসাধারণ সেই চিত্রকাহিনি বা কমিক্‌সগুলির ছবি। কমিক্‌স নির্মাতা ছাড়াও তাঁর যে আর একটা পরিচিতি ছিল লেখক রূপে সেটা স্বীকার করে নিলেও... লেখক ময়ূখ চৌধুরীর আকৃতি আবৃত থেকে যায় শিল্পী ময়ূখ চৌধুরীর অবয়বের আড়ালে। কিন্তু তাঁর চিত্রকাহিনি আর লেখা গল্পকাহিনিগুলির তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যাবে তাঁর চিত্রকাহিনিগুলিতে গল্পের টান, ভাষার গতিময়তা, আবহের রোমাঞ্চ যতটা ঠিক ততটাই তাঁর গল্প-কাহিনিতেও বর্তমান।

প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে মানুষ তার মনের ভাবকে ফুটিতে তুলতে ছবি আঁকছে। চিত্রশিল্পের ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে ভাষার বিবর্তন এবং কাব্য ও সাহিত্যের আবির্ভাব ও তার ক্রমোন্নতি। সময়ের ধারাবাহিকতায় গল্প, উপন্যাসের চরিত্রদের প্রতি পাঠকের আকর্ষণকে বৃদ্ধি করতে এল অলংকরণ। আর এই অলংকরণ শিল্পের হাত ধরে চিত্রশিল্পীদের কাছে কল্পনা ও বাস্তবের মেলবন্ধনের সুযোগ চলে এল। লেখকের কল্পনা শিল্পীর তুলিতে বাস্তব রূপ নিল, ক্রমে অলংকরণের নান্দনিকতা আর সৌন্দর্য পাঠকের দৃষ্টির সামনে সাহিত্যকে আরও শোভনসুন্দর করে তুলল।

'কমিক্‌স' নামক যে-বস্তুটিকে আমরা 'চিত্রকাহিনি' বলে অভিহিত করে থাকি তার উদ্ভব পাশ্চাত্যদেশের পত্রপত্রিকায় ঠিকই কিন্তু তার বহু আগেই কি অজন্তা গুহার দেয়ালে অজ্ঞাত শিল্পীদের বুদ্ধ জাতকের কাহিনিগুলির চিত্রায়ণ রূপায়িত হয়নি? কিংবা মল্লভূমের অজ্ঞাত শিল্পীদের টেরাকোটায় সেকালের নানা দৃশ্যের মৃত্তিকায়ন অথবা বাংলার প্রাচীন অবজ্ঞাত পটচিত্রকরদের তুলিতে কোনো সামাজিক বা পৌরাণিক ঘটনার পটচিত্রায়ণ যা দেখিয়ে বর্তমানে প্রায়-হারিয়ে-যাওয়া পটুয়ারা গ্রামীণ জনতাকে গল্পের সঙ্গে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে পটের ছবি দেখিয়ে মুগ্ধ করে রাখত। সে-কথা থাক—

ইয়াংকি মুল্লুকের কাগজে ছাপা রিচার্ড এফ আউল্ট কাল্টের শিল্পায়নে 'ইয়ালো কিড'কেই অবশ্য আধুনিক কমিক্‌সের পূর্বপুরুষ বলে আমাদের মেনে নিতে হয়। ছবির ইতিহাস বলে কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্রের সৃষ্টি কমিক্‌সের অনেক আগে। যখন দেখা গেল একটি কার্টুন ছবিতে ছবির মজাটা বিস্তারিতভাবে দেখানো গেল না তখন একটি ছবির পাশে আর একটি ছবিতে পরের ঘটনাটা একটু এগিয়ে নেওয়া হল। তারপর আর একটি ক্রমান্বয়ে আরও কয়েকটি। অর্থাৎ ছবির মাধ্যমে গল্পটা এগিয়ে চলল। একটা পাতা ভরে গেলে আর এক পাতায় গড়িয়ে চলল গল্পটা। সুতরাং ছবির ক্রমানুসারে ধারাবাহিকভাবে পত্রিকার পাতায় যদি কমিক্‌সের গল্পটা পরিবেশন করা যায়, পাঠকদের আগ্রহ উত্তরোত্তর বাড়তে থাকবে গল্পটা অনুসরণ করার। আর ঠিক এই বিষয়টার উপর নির্ভর করে তৈরি হল কমিক্‌সের বাণিজ্যিকরণ।

ছড়ার সঙ্গে ছবি এঁকে বাংলা কমিক্‌সের সূত্রপাত করেন সুকুমার রায়। ছড়ার গল্পটাকে ছবি এঁকে বুঝিয়ে দিতে এগিয়ে এসেছিলেন যোগীন সরকারও। ৫০-এর দশকে সাহিত্য সংসদ ছেপেছিল 'ছবিতে রামায়ণ'— 'ছবিতে মহাভারত'। শিল্পী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী। চার রং-এ ছাপা মহাকাব্যের দুই চিরায়ত কাহিনিকে ছোটোদের মতো করে সাজিয়ে দিয়েছিলেন শিল্পী। ৫০-এর দশকে যুগান্তরের পাতায় কাফি খাঁ (প্রফুল্ল চন্দ্র লাহিড়ী) শুরু করলেন একেবারে নতুন জিনিস। এর আগে তিনি অমৃতবাজারের পাতায় এনেছিলেন খুড়োকে। নির্ভেজাল বাঙালির বাঙালিয়ানা আর সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে খুড়োর নাজেহাল হওয়া দেখাতে গিয়ে প্রফুল্ল চন্দ্র সাহেবি আদলে ছদ্মনাম নিয়েছিলেন পিসিয়েল। পাঠকের মন জয় করলেও 'খুড়ো' কিংবা বাংলায় করা শিয়াল পণ্ডিত কিন্তু চিত্রকাহিনি নয় বড়োজোর কার্টুন স্ট্রিপ অর্থাৎ সারিবদ্ধ কার্টুনের মাধ্যমে ছোট্ট করে একটু কৌতুক আলাপন।

৫০-এর দশকে কাফি খাঁ নামেতেই লাহিড়ী শুরু করলেন ছবিতে গল্প পরিবেশনের কাজ। গল্প রচনা তাঁর নিজের। সেই মৌলিক কাহিনিগুলিকে নিজের করা মজাদার ছবি দিয়ে সাজিয়ে চলল তার ধারাবাহিক পরিবেশন। কুম্ভকর্ণ, রিকশাওয়ালা, ট্রলিবাবু... যেমন মজাদার তার সিকোয়েন্স তেমন জমজমাট কার্টুনধর্মী ছবি। প্রথমে চার রং-এ ছাপা হত তারপর এসে দাঁড়াল সাদাকালো... প্রায় ১৯৭৫ পর্যন্ত কাফি খাঁ কাজটা করেছেন। পাশাপাশি অমৃতবাজারের পাতায় 'এলিয়াস' নাম নিয়ে শৈল চক্রবর্তী ডাকুকে হাজির করেছিলেন। যুগান্তর ও অমৃতবাজারের পাতায় শৈলবাবু নিজের মৌলিক কাহিনি নিয়ে ধারাবাহিক কমিক্‌সও করেছেন। আর ৬০-এর দশক থেকেই নারায়ণ দেবনাথের 'বাঁটুল' ও 'হাঁদা ভোঁদা'র শুকতারার পাতায় আবির্ভাব মজার রেশ ছড়িয়ে দিতে শুরু করেছিল। সেটা এখনও পুরোটা কাটেনি। সত্যি কথা বলতে গেলে এগুলোও কিন্তু কমিক্‌স নয়, জনপ্রিয় দুই চরিত্রকে নিয়ে কার্টুন স্ট্রিপ করে যাওয়া।

১৯১৩ সালে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠা করেন 'সন্দেশ', তাঁর মৃত্যুর পর সুকুমার রায় ও সুবিনয় রায়ের প্রয়াসে প্রায় ১৯৩১ পর্যন্ত চলার পর সন্দেশের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। একেবারে নতুন করে সত্যজিৎ রায় যখন 'সন্দেশ'-এর প্রকাশনা শুরু করলেন সময়টা ছিল ১৯৬১। কমিক্স তাঁর পছন্দের তালিকায় ছিলই...১৯৬২ সালে সন্দেশে প্রকাশিত হল 'ঋণশোধ' ...একেবারে নতুন আঙ্গিকে বাংলা কমিক্স, শিল্পী প্রসাদ রায়। প্রকৃত নাম শক্তিপ্রসাদ রায়চৌধুরী...পরে আর একটা ছদ্মনাম নিয়েছিলেন 'ময়ূখ চৌধুরী'। বস্তুত সেই নামে বাংলা কমিক্সের আধুনিকতা আর সাবালকত্ব এনে দিলেন ওই অজ্ঞাত শিল্পী। সন্দেশে আরও কয়েকটি কমিক্স উপহার দিয়ে আর একটি প্রকাশনা সংস্থার পূজাবার্ষিকীতে বর্ণময় যে-চিত্রকাহিনিটি তিনি উপস্থাপনা করলেন সেটি হল 'শয়তানের দ্বীপ'। অতঃপর ওই সংস্থার মাসিক পত্রিকায় 'খাপে ঢাকা তলোয়ার' ধারাবাহিক বাংলা কমিক্সের সূত্রপাত ঘটাল যা একাধারে মৌলিক কাহিনি নির্ভর অন্যদিকে রোমাঞ্চের পটভূমিকায় আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে সেই কাহিনির অসামান্য চিত্ররূপ। কমিক্সের ছবি যে নিছক ছবি নয় তার একটা নড়াচড়া আছে আর ফিল্মের ক্যামেরার ফ্রেমের মতো তারও যে একটা ফ্রেম আছে তা আমরা বুঝতে পারলাম। কমিক্সের বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে গিয়ে ময়ূখ বেছে নিলেন অ্যাডভেঞ্চার, বন্যপ্রাণী জগৎ, ইতিহাসকে।

ময়ূখের কমিক্সের বৈশিষ্ট্য কী? যা তাঁকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছিল ও সেই বৈশিষ্ট্যগুলির মাধ্যমে ময়ূখের কমিক্সগুলি হয়ে উঠেছিল পাশ্চাত্য কমিক্সগুলির প্রায় সমকক্ষ। প্রথমেই আসবে কাহিনির পশ্চাৎপটের সঙ্গে বিশ্বাসযোগ্য-ভাবে তার চরিত্রাঙ্কন, কাহিনির গতি, চরিত্রদের শানিত সংলাপ ও বাস্তবমুখিতা। আরণ্যক পরিবেশ ও বন্যপশুদের প্রতি ময়ূখের পক্ষপাতিত্ব ছিল তাই কমিক্সের পাতাতেও তার প্রাধান্য। প্রতিটি প্রাণীর শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও চলাফেরার ছন্দকে নিখুঁতভাবে তুলে ধরতে শিল্পীর জুড়ি মেলা ভার। এইসব ছবিকে নিখুঁত করতে শিল্পীকে যে কতটা ব্যাবহারিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়েছে তা আমরা বুঝতে পারি। কমিক্সের মনুষ্য চরিত্রগুলিকে নির্বাচন করতে গিয়ে ময়ূখ কল্পনা ও সত্যের মিশ্রণে এমন অবয়ব গঠন করেছেন যা সাধারণ হয়েও অসাধারণ। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কমিক্সের ক্রমোন্নয়ন ঘটেছে। এসেছে রং-এর ব্যবহার। তবে কমিক্সকে বর্ণময় করে তোলার ক্ষেত্রে ময়ূখ কখনো চড়া রং ব্যবহার করেননি। কমিক্সের বেলায় একটি কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে, ভালো গল্প না হলে কমিক্স জমে না, সেক্ষেত্রে ময়ূখ একজন নির্ভরযোগ্য গল্পকার তার পরিচয় তো আমরা ময়ূখের লেখা নানা গল্প ও রচনার মাধ্যমে পেয়ে গেছি। অধিকন্তু ময়ূখের অসাধারণ গতিময়, সুনিয়ন্ত্রিত ভাষা পাঠককে ভালোলাগার রাসায়নিক জুগিয়েছে। বিজ্ঞাননির্ভর পশ্চাৎপট তিনি সেভাবে কাজে লাগাননি দু-একটি ছাড়া। পাশ্চাত্য কমিক্সে বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনির বড়ো একটা প্রভাব থাকলেও ময়ূখ নিজের কমিক্সে সচেতনভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক কল্পকাহিনি খুব একটা ব্যবহার করেননি। ময়ূখের লেখা পড়ে জনপ্রিয় রহস্য-অ্যাডভেঞ্চার লেখক হেমেন্দ্রকুমার রায়ের নাম স্মরণে আসে। ছোটোবেলায় যাঁরা হেমেন রায়ের লেখার ভক্ত ছিলেন অনিবার্যভাবে ময়ূখের লেখা তাঁদের অতীতের ভালোলাগার জগতে নিয়ে যাবে।

ইতিহাসের পাতা থেকে বিখ্যাত কিংবা অবজ্ঞাত চরিত্রদের নিয়ে এসে ময়ূখ তাদের চিত্রকাহিনিতে চিত্রায়িত করেছেন। সাগরপারের লোকচরিত্র রবিন হুডকেও এনেছেন চিত্রকাহিনিতে। ইতিহাসনির্ভর কমিক্সগুলিতে ময়ূখ ছবির ভৌগোলিক অবস্থান ও চরিত্রদের সাজপোশাক এঁকেছেন অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যভাবে। তথ্যভিত্তিক কমিক্স বা ছবিতে তথ্যজ্ঞানের পরিবেশন ও তার সামগ্রিক চিত্ররূপায়ণ ময়ূখের আর এক পারদর্শিতার পরিচয়। তাই ময়ূখ চৌধুরী আজও প্রাসঙ্গিক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায়

শুভ দীপাবলি
২৫/১০/২০১১

কমিক্স-সাহিত্যিক ময়ূখ চৌধুরী

ছবির প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ মানুষের সেই আদিম যুগ থেকেই। প্রাচীন মানুষ ছবি আঁকত পাহাড়ের গুহায়, পাথরের বুকে। সুদূর অতীতের সেই আকর্ষণ কমেনি তো বটেই, বরং উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। ছবি, তা সে যে-ধরনেরই হোক, স্থির কি চলমান, সবাক কি নির্বাক, টেনে রাখে ছেলে বুড়ো সকলকেই। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির প্রচণ্ড অগ্রগতির ফলে আজকের দিনে প্রয়োজন এবং অবসর সময়ের অনেকটাই ব্যয় হয় কম্পিউটার মনিটরের সামনে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কি রুপোলি পর্দা কিংবা টেলিভিশনের দর্শক উপস্থিতির হার নিম্নগামী? বোধ হয় না। আর কমিক্স বা চিত্রকাহিনি, যা কিনা চলচ্চিত্রেরই আরেক রূপ, তার আকর্ষণ তো সারাবিশ্ব জুড়েই। অবশ্য কার্টুন নেটওয়ার্কের দাপটে চিত্রকাহিনি এই মুহূর্তে কিছুটা পিছিয়ে, কিন্তু তার জন্য আশঙ্কিত হবার কারণ নেই, কেননা কার্টুন নেটওয়ার্কের গল্পগুলি তো কমিক্স-এরই চলমান সংস্করণ।

বাংলা চিত্রকাহিনি বা ছবিতে গল্পের আসর কিন্তু সীমাবদ্ধ ছোটোদের জগতেই। বিদেশে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য প্রচুর চিত্রকাহিনি প্রকাশিত হয়েছে এবং এখনও নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে। কিন্তু বাংলা চিত্রকাহিনি বড়োদের জগতে প্রবেশাধিকার পায়নি। অবশ্য এটা ঠিক যে চিত্রকাহিনি তৈরি করা মোটেই সহজ কাজ নয়। সত্যজিৎ রায় ছিলেন চিত্রকাহিনির ভক্ত। তবে কোনো কমিক্স নির্দিষ্ট মান স্পর্শ করতে না-পারলে সেই কমিক্স ওঁর মন কাড়ত না। সত্যজিৎ রায়ের মতে ছবিতে গল্প বলার একটা বিশেষ কায়দা আছে। সেই কায়দাটি যাঁর ভালো করে জানা আর সেইমতো ছবি আঁকার হাতটিও পাকা তাঁর হাত দিয়েই ভালো কমিক্স বেরোয়।

সত্যজিৎ রায়-উল্লিখিত ওই 'কায়দা'টি খুব ভালো জানা ছিল ময়ূখ চৌধুরীর। এবং তাঁর আঁকার হাতটি শুধু পাকা বললে একটু কমই বলা হয়। এর সঙ্গে উপরি পাওনা ছিল বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, বিশেষ করে ইতিহাস এবং জীবজগতের বিষয়ে, বাংলা ভাষায় অসামান্য দখল আর অপূর্ব হস্তাক্ষর। সব মিলিয়ে তাই নিঃসন্দেহে বাংলার শ্রেষ্ঠ কমিক্স-শিল্পীর নাম ময়ূখ চৌধুরী।

বাংলা চিত্রকাহিনির সূচনা গত শতাব্দীর মাঝপর্বে। শিশু সাহিত্য সংসদ-এর 'ছবিতে রামায়ণ' ও 'ছবিতে মহাভারত' প্রকাশিত হয়েছিল গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে। কমিক্সের সবকটি বৈশিষ্ট্য অনুসরণ না-করলেও প্রথম বাংলা চিত্রকাহিনির বই বলতে এই দুটি বইকেই বোঝায়। অবশ্য ১৩২৮ পৌষ সংখ্যা সন্দেশে সুখলতা রাও এঁকেছিলেন এক পাতার কমিক্স। খুব সম্ভবত সেটিই প্রথম বাংলা কমিক্স। তবে মৌলিক কাহিনিকে ভিত্তি করে বাংলা চিত্রকাহিনির পথিকৃৎ কিন্তু ময়ূখ চৌধুরী। ১৯৬২তে প্রকাশিত হয় ওঁর প্রথম ছবিতে গল্প— 'ঋণশোধ'।

শুরু করেছিলেন ১৯৬২তে। তারপর প্রায় চার দশক ধরে অসংখ্য চিত্রকাহিনি তৈরি করেছেন ময়ূখ চৌধুরী। সংখ্যায় অর্ধশত পার করা এই ছবিতে গল্পগুলির গুণগত মানের রেখাচিত্র কখনো নিম্নমুখী হয়নি। এত দীর্ঘ সময় ধরে বাংলা কমিক্স শিল্পে জনপ্রিয়তার শীর্ষে ময়ূখ চৌধুরীর সঙ্গী কিন্তু একজনই— তিনি নারায়ণ দেবনাথ। অবশ্য এই দুই শীর্ষস্থানীয় শিল্পীর ধারা কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। নারায়ণ দেবনাথের দক্ষতা মূলত 'ফানিস' অর্থাৎ ছোটো ছোটো মজার ছবিতে গল্পে আর ময়ূখ চৌধুরীর চিত্রকাহিনির মূল আকর্ষণ অ্যাডভেঞ্চার, রোমাঞ্চ, উত্তেজনা। হাস্যরস বা কৌতুক খুব কমই এসেছে ময়ূখ চৌধুরীর কমিক্সে। ঋণশোধ গল্পে (এবং দ্বিতীয় চিত্রকাহিনি পেক্কাতেও) রেখা-লেখার রূপকার হিসেবে নাম ছিল প্রসাদ রায়ের। তৃতীয় গল্প থেকেই শিল্পী ছদ্মনামে (ময়ূখ চৌধুরী) চিত্রজগতে প্রবেশ করেন। কোনো গল্পের অলংকরণের সময় কিন্তু শিল্পী ময়ূখ চৌধুরী নামটি ব্যবহার করতেন না। তখন শিল্পী হিসেবে নাম থাকত 'প্রসাদ রায়'-এর। অবশ্য 'প্রসাদ রায়'ও কিন্তু ওঁর পুরোপুরি আসল নাম নয়। ওঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল শক্তিপ্রসাদ রায় চৌধুরী। ময়ূখ চৌধুরী ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে আরও তিনটি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলেন শিল্পী— সূত্রধর গুপ্ত, আত্মনাম গুপ্ত ও রাজা রায়। একটি ছদ্মনামের পর্দা তুলেছিলেন শিল্পী বেশ সরস ভঙ্গিতে। সূত্রধর গুপ্ত নামে পরপর তিনটি চিত্রকাহিনি পরিবেশন করার পরে চতুর্থ চিত্রকাহিনির শুরুতেই শিল্পী জানালেন, 'চিত্রকাহিনির ''সূত্রধর'' দীর্ঘকাল ''গুপ্ত'' থাকার পর এই চিত্রকাহিনি থেকে নিজস্ব নামে প্রকাশ ময়ূখ চৌধুরীর।' হ্যাঁ, ময়ূখ চৌধুরী নামটিই হয়ে উঠেছিল তাঁর স্বনাম। এই নামেই তিনি এঁকে গেছেন অজস্র ছবিতে গল্প। পরিবেশন করেছেন অসংখ্য গল্প উপন্যাস। ইলাস্ট্রেটর প্রসাদ রায়, কমিক্স শিল্পী ময়ূখ চৌধুরী এবং গল্পকার ময়ূখ চৌধুরী— এই তিনটি সত্তার মধ্যে তুলনামূলক বিচারে কে যে কাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে বলা মুশকিল। তিনটি সত্তার আলোচনায় প্রয়োজন দীর্ঘ পরিসর। তাই আমাদের আজকের আলোচনা সীমাবদ্ধ মূলত কমিক্স শিল্পী ময়ূখ চৌধুরীকে নিয়ে। অবশ্য এই তিনটি সত্তাই একে অন্যের পরিপূরক। তাই কখনোই কাউকে পুরোপুরি পরিত্যাগ করা যাবে না।

বিভিন্ন বিষয়ে চিত্রকাহিনি করেছেন ময়ূখ চৌধুরী। তবে প্রধান দুটি বিষয় অবশ্যই জীবজন্তুদের নিয়ে চিত্রকাহিনি এবং ইতিহাসনির্ভর চিত্রকাহিনি। এই দুটি বিষয়ই ছিল তাঁর খুব প্রিয় এবং এই দুই বিভাগেই তাঁর দক্ষতার ত্রিসীমানায় দ্বিতীয় কোনো শিল্পী নেই। বিশেষ করে জীবজগতের গল্প ছবি তাঁর কলম আর তুলিতে হয়ে উঠত জীবন্ত। অ্যাকশনধর্মী ছবি এবং অ্যানিম্যাল ড্রয়িং-এ ময়ূখ চৌধুরী ছিলেন অতুলনীয়। ওঁর আঁকা যেকোনো পশুর ড্রয়িং-এর জুড়ি বাংলা বা ভারতবর্ষে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, আর অন্তত এই বিষয়ে তিনি যে পৃথিবীর প্রথম সারির শিল্পীদের অন্যতম, সে-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপারটি হল যে, যেকোনো জন্তুর ড্রয়িং তিনি শুরু করতেন লেজের দিক থেকে। চিড়িয়াখানায় গিয়ে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করতেন জন্তুজানোয়ারদের প্রতিটি পদক্ষেপ। দিনের পর দিন তিনি এভাবেই তাঁর তুলির নিখুঁত হবার রসদ জোগাড় করতেন। জীবজগতের ছবি নিখুঁত করার ব্যাপারে ময়ূখ চৌধুরীর নিষ্ঠার বিষয়ে একটা ঘটনা বলি।

জনৈক লেখকের শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশের জন্য মনোনীত একটি লেখা ময়ূখ চৌধুরীকে দেওয়া হয়েছিল অলংকরণের জন্য। লেখাটি পড়া শেষ করেই ময়ূখ চৌধুরী হাজির হয়েছিলেন ওই লেখকের কাছে। ওঁরা দুজনেই পূর্বপরিচিত। গল্পটি চেকোস্লোভাকিয়ার বিশেষ প্রজাতির একটি কুকুরকে নিয়ে। ময়ূখ চৌধুরী লেখককে অনুরোধ করলেন ওই প্রজাতির কুকুরদের কোনো ফটো জোগাড় করে দেবার জন্য। আকাশ থেকে পড়লেন লেখক। তিনি গল্পটি বিদেশি ভাষা থেকে শুধু অনুবাদ করেছেন। ওই কুকুরটির চেহারা সম্বন্ধে তাঁর বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। তিনি ময়ূখবাবুকে অনুরোধও করলেন যে যাহোক একটা কুকুরের ছবি এঁকে দিলেই তো হয়। প্রচণ্ড বিরক্তিতে সেই স্থান ত্যাগ করলেন ময়ূখ চৌধুরী। তারপর একের পর এক লাইব্রেরিতে অনুসন্ধানে রত হলেন ওই প্রজাতির কুকুরের একটা ফটোগ্রাফের জন্য। কিন্তু ব্যর্থ হলেন। অবশেষে বেশ কয়েকদিন পর কোনো এক সূত্র থেকে সন্ধান পেয়ে মির্জা গালিব স্ট্রিটের একটি পুরোনো বইয়ের দোকানে নিজের পকেট থেকে সাড়ে তিনশো টাকা খরচ করে একটি বই কিনলেন। এবং তারপরেই ওই লেখকের কাছে এসে বইটির একটি পাতা খুলে দেখিয়ে দিলেন ওই বিশেষ প্রজাতির কুকুরের একটি ফটোগ্রাফ— যে-ফটোগ্রাফের সাহায্য নিয়ে তিনি আঁকবেন ওই গল্পটির মূল চরিত্রের একটি নিখুঁত ছবি।

ময়ূখ চৌধুরীর প্রথম চিত্রকাহিনিটির মূল বিষয় জীবজগৎ। আফ্রিকার জঙ্গলের নিগ্রো উপজাতি নান্দী গোষ্ঠীর এক শিকারি ও একটি ব্ল্যাক প্যান্থার (এবং তার সন্তানও) কাহিনির মূল চরিত্র। ঋণশোধ নামের এই তিন পাতার চিত্রকাহিনি দিয়ে অভিযান শুরু করে বহুবার নানান ধরনের জন্তুজানোয়ার নিয়ে এসেছেন ময়ূখ চৌধুরী। ব্ল্যাক প্যান্থার, সিংহ, জেব্রা, কেপ বাফেলো, চিতাবাঘ, কুমির, অজগর, রয়েল বেঙ্গল টাইগার— শিল্পীর তুলিতে ওদের সবার চেহারাই অসাধারণ, খুঁতহীন এবং পশুগুলির চরিত্রচিত্রণেও নেই বিন্দুমাত্র অবাস্তবতা। আর একইসঙ্গে রুদ্ধশ্বাস রোমাঞ্চ, টানটান উত্তেজনা প্রতিটি গল্পের প্রতিটি পাতায় ধরে রেখেছেন লেখক, কিন্তু শুধু উত্তেজনাই নয়, গল্প শেষ হবার পর আরও কিছু অদ্ভুত অনুভূতি আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে যায়। ব্ল্যাক প্যান্থার তার সন্তানের রক্ষাকারী একটি মানুষকে নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করে (ঋণশোধ)। পশুরাজ সিংহ সারারাত অতন্দ্র প্রহরীর মতো একটি মানুষকে পাহারা দেয়, কারণ ওই মানুষটি তার প্রাণরক্ষা করেছিল (বনবাসী বন্ধু)। যূথবদ্ধ একটি দলের দলপতির যে কতটা দায়িত্বজ্ঞান থাকে, মমতা থাকে তার দলের প্রতি, তা ফুটে ওঠে পেক্কা, মবোগো, নায়কের মৃত্যু এই চিত্রকাহিনিগুলিতে। মানুষ আর রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ভালোবাসায় আমাদের মনও সিক্ত হয়ে ওঠে (বঙ্গ দেশের রঙ্গ)। আর রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় নিশ্বাস প্রায় বন্ধ করে পড়ে ফেলতে হয় জাভার কোমোডো দ্বীপের বিশালাকার ড্রাগনদের মোকাবিলার কাহিনি (রূপকথা নয়), ক্যালিফোর্নিয়ার মূল ভূখণ্ড থেকে দূরে একটি দ্বীপে ভয়ংকর মাংসাশী শুয়োরের দলের সঙ্গে একজন মানুষের লড়াইয়ের গল্প (শয়তানের দ্বীপ)। উপরের উল্লিখিত গল্পগুলি ছাড়াও ফাঁদ, চফুমায়া, রক্তমাখা চাঁদ, সিংহের শত্রু, মহাকালের মন্দির, রক্তাক্ত মানচিত্র কাহিনির মূল চরিত্র জীবজন্তুরা।

ময়ূখ চৌধুরীর চিত্রকাহিনির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল শিল্পীর অসাধারণ লেটারিং। অপূর্ব ছিল তাঁর হস্তাক্ষর। তাঁর এই সুন্দর হাতের লেখা চিত্রকাহিনিগুলিকে দিয়েছে এক অন্য মর্যাদা। একমাত্র প্রথম কাহিনির লেটারিং ছিল মুদ্রিত। কিন্তু দ্বিতীয় গল্প থেকে শুরু করে শেষ চিত্রকাহিনি অবধি লেটারিং-এ কোনো বিকৃতি হয়নি।

জীবজগৎ ময়ূখ চৌধুরীর প্রথম পছন্দের বিষয় হলে দ্বিতীয় পছন্দ অবশ্যই ইতিহাস। তাঁর ইতিহাসনির্ভর চিত্রকাহিনিগুলিকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। তিনটি চরিত্রকে নায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে অনেকগুলি চিত্রকাহিনি করেছেন তিনি। ময়ূখ চৌধুরীর রেখা-লেখায় সেই তিন নায়ক চন্দ্রগুপ্ত, রুদ্রদমন ও রবিনহুড— তিনটি চরিত্রই হয়ে ওঠে আমাদের অত্যন্ত প্রিয়।

সময়টা যিশু খ্রিস্টের জন্মের তিনশো বছরের আগের ভারতবর্ষ। মগধের এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবক চন্দ্রগুপ্ত ছদ্মবেশে অরণ্যময় প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার উচ্চাশা মগধের সিংহাসন দখল। জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে সে জড়িয়ে পড়ে নানান ঘটনায়। 'ছদ্মবেশী', 'আমি আগন্তুক', 'বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে' ও 'রাজকুমারের অসি' কাহিনিগুলির নায়ক সেই চন্দ্রগুপ্ত। বিভিন্ন কাহিনিগুলিতে চন্দ্রগুপ্তর সহচরিত্রে এসেছেন আলেকজান্ডার, সেলুকাস, বিভিন্ন ছোটো ছোটো গ্রামের কিছু কিশোরও। এই গল্পগুলিকে আমরা হয়তো ইতিহাসের পাতায় খুঁজে পাব না। কিন্তু তাই বলে ইতিহাসকে কোথাও বিকৃত করেননি ময়ূখ চৌধুরী। গল্পগুলি আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে, আর একইসঙ্গে সেই সময়ের ভারতীয়দের পোশাক-পরিচ্ছদ, অস্ত্রশস্ত্র, গ্রিকদের পোশাক-অস্ত্র, সেই সময়ের পরিবেশ, সব কিছুরই নিখুঁত ছবি ফুটে ওঠে শিল্পীর তুলিতে। এই প্রসঙ্গে ময়ূখ চৌধুরীর অলংকরণ সংক্রান্ত আরও একটি কাহিনি শোনাবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না।

একবার ছোটোদের একটি মাসিক পত্রিকায় ময়ূখ চৌধুরীর একটি ধারাবাহিক উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল, যার পটভূমি সেই চন্দ্রগুপ্ত-আলেকজান্ডারের সময়ের ভারতবর্ষ। উপন্যাসটির অলংকরণও করেছিলেন প্রসাদ রায়। উপন্যাসটি সম্পূর্ণ হবার পর একদিন জনৈক পাঠক ওই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত দ্বিতীয় একজন লেখকের কাছে তাঁর উষ্মা প্রকাশ করেন। তাঁর বক্তব্য শিল্পী যে ধরনের তরোয়ালের ছবি এঁকেছেন সেই ধরনের তরোয়াল ওই সময়ের ভারতবর্ষে আদৌ ছিল না। দ্বিতীয় লেখক নিজেকে বিতর্কে না-জড়িয়ে ওই পাঠককে দিনকয়েক পরে আবার আসতে বলেন— উদ্দেশ্য শিল্পীর সঙ্গে তাঁর সরাসরি সাক্ষাৎ। ওই পাঠক সেই স্থান ত্যাগ করার কিছুক্ষণ পরেই সেখানে হাজির হন ময়ূখ চৌধুরী এবং সম্পূর্ণ ঘটনা শোনার পর তাঁর মুখের ভাবে প্রচণ্ড পরিবর্তন হয়। কিন্তু কোনো কথা না-বলে তখনই সেই স্থান ত্যাগ করেন এবং নির্দিষ্ট দিনে ওই পাঠক উপস্থিত হবার অনেক আগেই ওই স্থানে এসে হাজির হন। যথাসময়ে এলেন সেই পাঠক। প্রাথমিক পরিচয়ের পরেই বিনা বাক্যব্যয়ে কাগজ কলম বার করেন ময়ূখ চৌধুরী। পরের তিন ঘণ্টায় দুই শ্রোতা (এবং দর্শকও বটে) মুগ্ধ হয়ে দেখলেন ভারতীয় অস্ত্রের ইতিহাস। ময়ূখ চৌধুরী একের পর এক এঁকে দেখালেন আর্যদের ভারতে আগমনের সময় থেকে অস্ত্রের বিভিন্ন চেহারা। ঘণ্টা তিনেক কাগজে কলমে অস্ত্র শিক্ষার পর মুগ্ধ সেই পাঠক নির্দ্বিধায় তাঁর ভুল স্বীকার করে নিলেন।

শুধু চন্দ্রগুপ্ত নয়, ইতিহাসকে ভিত্তি করে শেরউড বনের কিংবদন্তি নায়ক রবিনহুডকে নিয়েও বেশ কয়েকটি চিত্রকাহিনি করেছেন ময়ূখ চৌধুরী। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ইংল্যান্ডের পটভূমিকায় রচিত কাহিনিগুলি। রবিনহুড যে ছিলেন ময়ূখ চৌধুরীর প্রিয় চরিত্র সেটি বোঝা যায় কাহিনির শুরুতেই তিনি রবিনহুডের পরিচয় যেভাবে দিয়েছেন— 'সে কোন বিশেষ দেশের বিশেষ মানুষ নয়, নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের কাছে অন্যায়-এর বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামের জীবন্ত প্রতীক, জনশ্রুতি ও ইতিহাসে যুগ যুগান্তের অমর নায়ক-রবিনহুড'। 'বিভ্রান্ত রবিনহুড', 'জলদস্যুদের কবলে রবিনহুড', 'নায়ক যখন রবিনহুড', 'শেরউড বনে গুপ্তচর', 'রহস্যময় রবিনহুড'— রবিনহুডকে নিয়ে প্রতিটি ছবিতে গল্পেই ফুটে উঠেছে অ্যাংলো-স্যাক্সনদের ওপর নর্মানদের অত্যাচারের ছবি, আর রবিনহুডের সদর্প প্রতিবাদ। সেই সময়ের পরিবেশকে সুন্দরভাবে রূপায়িত করেছেন ময়ূখ চৌধুরী।

আরেকটি প্রিয় চরিত্র ছিল ময়ূখ চৌধুরীর। প্রাচীন ভারতের শ্রাবস্তীর রাজা— মহারাজ রুদ্রদমন। এই মহারাজ প্রজাদের হিতসাধনের উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝেই ছদ্মবেশে রাজ্যত্যাগ করেন এবং জড়িয়ে পড়েন বিভিন্ন রুদ্ধশ্বাস রোমাঞ্চকর অভিযানে। অসাধারণ যোদ্ধা রুদ্রদমন। বাঘের মতো ভয়ংকর দস্যু পরন্তপ রুদ্রদমনের সঙ্গে তরোয়াল যুদ্ধের সময় আতঙ্কিত হয়, পশুরাজ সিংহকে অক্লেশে ছুড়ে ফেলে দিতে পারেন রুদ্রদমন— এহেন রুদ্রদমনের অভিযানগুলি সত্যিই রোমাঞ্চকর। 'রুদ্রদমনের অভিযান', 'মহাকালের মন্দির', 'সংখ্যার নাম চার' কাহিনিগুলি রুদ্রদমনেরই বিভিন্ন কীর্তিকাহিনি। 'সংখ্যার নাম চার'-এর চিত্ররূপ শিল্পী সম্পূর্ণ করেননি। অবশ্য কাহিনিটির গল্পরূপ আগেই প্রকাশিত হয়েছিল।

ইতিহাসভিত্তিক চিত্রকাহিনির প্রথম তিনটি ভাগে রয়েছে উপরে উল্লিখিত তিন নায়কের কাহিনি। চতুর্থ ভাগের প্রথম কাহিনিটি কোঙ্কণের বীর কনোজী আংরেকে নিয়ে 'দুরন্ত কাহিনি'। এ ছাড়া ইতিহাসকে ভিত্তি করে তিনি এঁকেছেন 'ইতিহাসে পলাতক', 'ইতিহাসে অস্ত্র' ও 'এক নাম অন্য মুখ'। এগুলিকে অবশ্য সেই অর্থে সঠিক চিত্রকাহিনি বলা যায় না। কিন্তু দু-পাতা জোড়া ছবিতে রয়েছে তথ্যবহুল ইতিহাস। ইতিহাসে পলাতক সিরিজে রয়েছে বেশ কিছু উত্তেজক কাহিনি। চরিত্রগুলির মুখে কোনো সংলাপ নেই, অর্থাৎ বেলুনের ব্যবহার করেননি শিল্পী। ইতিহাসে অস্ত্র-র ধারাটিও একই। ছবির মাধ্যমে আমরা জানতে পারি বিভিন্ন অস্ত্রের তথ্যবহুল ইতিহাস। অস্ত্রগুলির মধ্যে রয়েছে মেশিনগান বা গ্যাটলিং গান-এর জন্ম, প্রথম বোমারু বিমান, ভয়ংকর গুলতি, ক্রসবো, ভাসমান মাইন, প্রথম যুদ্ধরথ, প্রথম ডুবোজাহাজ, প্রথম রকেট, রণহস্তী, নেপোলিয়নের বেলুন বাহিনি, ইংলিশ লংবো, প্রথম আগ্নেয়াস্ত্র গ্রিক ফায়ার।

পৌরাণিক কাহিনির ওপর ভিত্তি করেও একটি চিত্রকাহিনি (রামধনুর সন্ধানে) করেছিলেন ময়ূখ চৌধুরী। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুর্যোধনকে সাহায্য করে, সমুদ্রবেষ্টিত দেশ অম্বরের যুবরাজ, যুদ্ধ শেষে দেশে ফিরে দেখে তার পিতা-মাতা এবং প্রিয় বন্ধু অকালে প্রাণ হারিয়েছে। দেবরাজ ইন্দ্র ওকে প্রিয়জনদের প্রাণ ভিক্ষা দিতে রাজি হলেন একটি শর্তে, যদি সে খল নামক এক দানবের লুকিয়ে রাখা রামচন্দ্রের ধনুকটি খুঁজে বার করতে পারে। সেই রামধনুর সন্ধানে বেরিয়ে যুবরাজ একের পর এক বিপদের সম্মুখীন হয় এবং মুখোমুখি হয় অদ্ভুত সব চরিত্র এবং বস্তুর যাদের মধ্যে আছে ছাগমানুষ, বৈতরণীর খেয়া, বিশ্বকর্মার নেহাই, বেশি দানব, কৃষ্ণ ব্যাঘ্র, শার্দূল দ্বীপ, ময়দানব ইত্যাদি।

সেই সুদূর পুরাণ থেকে আধুনিক কল্পবিজ্ঞানের জগতে আসতে অসুবিধে হয় না ময়ূখ চৌধুরীর। প্রথম জীবনে তিনি তৈরি করেছিলেন 'গ্রহে গ্রহে'। এরপর তিনি সৃষ্টি করেন 'আগন্তুক'। সেখানে মঙ্গলগ্রহের কিছু বাসিন্দা, চেহারায় যারা মানুষেরই মতো, তফাত শুধু কান আর হাতের নখে, এসেছিল পৃথিবীতে এক বৈজ্ঞানিকের গোপন ফর্মুলা চুরি করতে। রুদ্ধশ্বাস এই কাহিনিতে সূক্ষ্মভাবে এসেছে মানবিকতা (নাকি মাঙ্গলিকতা), বন্ধুর ভালোবাসা। শিল্পী জীবনের শেষদিকে কল্পবিজ্ঞানের একটি চরিত্র নিয়ে চারটি চিত্রকাহিনি করেছিলেন তিনি। ইউরেনাস

গ্রহ থেকে পৃথিবীতে বেড়াতে এসেছিল ইবসিস ওরফে দেবাশিস। এখানে এসে তার সঙ্গে পরিচয় হয় সমবয়সি স্কুল ছাত্র তপনের। এই দুই বন্ধুর কীর্তি 'অতিথি', 'ভেলকির খেলা', 'বিদ্যালয়ে বিভ্রাট' ও 'যুগযুগান্তের যাত্রী'। শেষ কাহিনিটি অসমাপ্ত। ময়ূখ চৌধুরীর বেশিরভাগ কাহিনিই সিরিয়াস পর্যায়ে পড়লেও এই সিরিজের প্রথম তিনটি গল্পে রয়েছে কৌতুকের আভাস। বিশেষ করে 'বিদ্যালয়ে বিভ্রাট' গল্পের একটি দৃশ্যে চোখ ফেললে বোঝা যায় আপাতগম্ভীর ময়ূখ চৌধুরীর সুপ্ত সরসতা। দৃশ্যটিতে তপনদের স্কুলের একটি ঘরের দেওয়ালে টাঙানো কয়েকটি ছবি ভুল করে ছেঁড়া হয়েছিল। তারপর সেগুলি আবার জুড়ে দেবার সময় উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চেপেছিল। একটি ছবিতে শিক্ষকের শরীরের ওপরে মাথার বদলে ঘড়ির ছবি এবং তার ওপরে লাগানো হয়েছিল যুদ্ধজাহাজের ছবি। নেহাতই ছেলেমানুষি ভুল। কিন্তু স্কুল পরিদর্শনে আসা আধুনিক চিত্রকলার এক বিশেষজ্ঞ ছবিটি দেখে মন্তব্য করেন, 'অসাধারণ কল্পনা শক্তি। শিক্ষকের মাথা নেই— মাথার বদলে ঘড়ি— ওই ঘড়ির ওপরে উঠেছে এক যুদ্ধজাহাজ। অর্থাৎ ছাত্ররা ঘড়ির মতো নিয়মশৃঙ্খলায় অনুবর্তী হবে এবং যুদ্ধজাহাজের মতো দুর্বার বেগে অগ্রসর হবে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে।... ছাত্রদের এমন গভীর চিন্তাশক্তির প্রকাশ দেখে আমি মুগ্ধ এবং নিঃসন্দেহে ওরা আধুনিক চিত্রশিল্পে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছে।' এই দৃশ্যের পরে ময়ূখ চৌধুরীর রসবোধ সম্বন্ধে কারো কি কোনো সন্দেহ থাকতে পারে? এ ছাড়াও 'স্মারক' নামে আরেকটি সাই-ফাই কমিক্স করেছিলেন তিনি।

কৌতুকী বা মজার চিত্রকাহিনির কথা এলেই মনে পড়ে অধ্যাপক ত্রিবেদীর কথা। আত্মনাম গুপ্ত ছদ্মনামে ময়ূখ চৌধুরী-সৃষ্ট এই ত্রিলোকনাথ ত্রিবেদী একজন উদ্ভিদবিজ্ঞানী। রোগা, দুর্বল এই উদ্ভিদবিজ্ঞানী একটি বুনো পাতার সাহায্যে হয়ে ওঠে অসীম বলশালী এবং শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীদের মোকাবিলা করেন অনায়াসে। অধ্যাপক ত্রিবেদী ও হানাবাড়ি, কালো বেড়াল, বাবা মুকুন্দ, খেলোয়াড় গদাই ও ডা. সাটিরা নামের চিত্রকাহিনিগুলিতে ময়ূখ চৌধুরীর রসবোধের আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। ডা. সাটিরা গল্পে তো আত্মনাম গুপ্ত অর্থাৎ লেখক-শিল্পী স্বয়ং একটি চরিত্র হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন, কিন্তু মুখ ঢেকে— পাছে পাঠকেরা ময়ূখ চৌধুরীকে আবিষ্কার করে ফেলেন। দুঃখের বিষয় এই সিরিজের শেষ চিত্রকাহিনি 'অধ্যাপক ত্রিবেদী ও ডা. সাটিরা' শিল্পী সম্পূর্ণ করেননি।

নারায়ণ দেবনাথ-সৃষ্ট নন্টে আর ফন্টেও একবার রূপায়িত হয়েছিল ময়ূখ চৌধুরীর তুলিতে। অবশ্য সেই গল্পের কৌতুকরস তেমন ফুটে ওঠেনি। ওই গল্পের মূল বিষয় ছিল বক্সিং। বক্সিং বিশদভাবে এসেছে আগন্তুক গল্পেও। ছিপছিপে লম্বা চেহারার ময়ূখ চৌধুরীর স্কুলজীবন কেটেছে মিত্র ইনস্টিটিউশনে। ১৯৪২-এ ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করার পরে ভবানীপুর অঞ্চলেই একটি বক্সিং আখড়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। ছিপছিপে চেহারায় সাহস ছিল প্রচণ্ড। পকেটে একটা ছোটো হাতুড়ি থাকত তাঁর। ওই হাতুড়ির সাহায্যেই বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন এসপ্ল্যানেড অঞ্চলে একবার একজন চিনাম্যানকে দুজন দুষ্কৃতীর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন।

ময়ূখ চৌধুরীর প্রায় সব চিত্রকাহিনিরই লেখক শিল্পী স্বয়ং। মাত্র তিনটি ক্ষেত্রে শিল্পী অন্য লেখকের গল্পের চিত্ররূপ দিয়েছিলেন। প্রথমটি দৈনিক পত্রিকার জন্য ধারাবাহিক সিঙ্গল স্ট্রিপের কমিক্স। গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর কাহিনি অবলম্বনে 'নিশীথ রাতের আহ্বান' কাহিনিটির শিল্পী ছিলেন ময়ূখ চৌধুরী। ধরাবাঁধা নিয়ম এবং ঘাড়ের ওপর দ্বিতীয় ব্যক্তির নিশ্বাস— এই দুটি জিনিসই বিলকুল না-পসন্দ ছিল ময়ূখ চৌধুরীর। তাই হয়তো এই কাহিনিটি তাঁর দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম ও শেষ কমিক্স। এই চিত্রকাহিনির বহুদিন পরে অন্য লেখকের গল্পে কমিক্স করেছিলেন তিনি। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের জনপ্রিয় গল্প 'আবার যখের ধন' অবলম্বনে সুবিশাল চিত্রকাহিনিটির নাম 'গুপ্তধনের সন্ধানে'। এ ছাড়াও নির্বেদ রায়ের কাহিনি অবলম্বনে রাজা রায় ছদ্মনামে তিনি এঁকেছিলেন মানুষের আগুন আবিষ্কারের চিত্রকাহিনি 'পদক্ষেপ'। অবশ্য বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে কিছু ছবিতে গল্প করেছিলেন তিনি, যেমন 'শিকার'।

এই চিত্রকাহিনিগুলি ছাড়া ছোটো বড়ো আরও বেশ কয়েকটি চিত্রকাহিনি করেছিলেন ময়ূখ চৌধুরী। 'অন্ধ মাকড়শা' কিংবা 'খাপে ঢাকা তরোয়াল' চিত্রকাহিনি দুটির ছবির মানই শুধু উঁচু পর্যায়ের নয়, গল্প দুটিও আমাদের মুগ্ধ করে। অন্ধ মাকড়শার সেই নাম-না-জানা চোরটি আমাদের হৃদয়ে দাগ কেটে যায়, অন্ধ প্রতাপ চৌধুরীর মহানুভবতায় আমরা মোহিত হই। আর খাপে ঢাকা তরোয়ালের সেই লাঠিয়ালের ছেলের সঙ্গে নিজেকে এক করে ফেলতে ইচ্ছে হয় সব পাঠকেরই। বিদ্যাসাগরের জীবনকথাও শুনিয়েছেন শিল্পী। এ ছাড়াও আছে তিনটি ছোটো চিত্রকাহিনি— যাত্রী বন্ধু ও মুক্তি পেল রতনলাল। শেষ কাহিনিটি ময়ূখ চৌধুরীর একমাত্র ভৌতিক কমিক্স।

ময়ূখ চৌধুরীর চিত্রকাহিনির একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য হল তাঁর গল্পের ভাষা। সে-ভাষা একেবারে সহজ সরল আদৌ নয়। কিন্তু ওই ভাষাই গল্পের মর্যাদা বাড়িয়ে দেয় অনেকটাই। লেখকের নিজের মত ছিল যে বিষয় যদি গুরুগম্ভীর হয় তবে তার ভাষাও হওয়া উচিত মানানসই। সাধারণ কথ্য ভাষা কোনো গুরুগম্ভীর লেখার সঙ্গে নিতান্তই বেমানান। এই কথা প্রযোজ্য তাঁর লেখা গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও। যদিও এই লেখায় কাহিনিকার ময়ূখ চৌধুরীকে নিয়ে কোনো আলোচনা করা হচ্ছে না, কিন্তু এককথায় বলা যায় তাঁর আপাত গুরুগম্ভীর ভাষার জন্য বিশাল উপন্যাস থেকে শুরু করে ছোটো গল্পে কখনো হোঁচট তো খেতে হয়ই না, বরং এই ভাষাই হয়ে ওঠে তাঁর লেখনীর এক আকর্ষণীয় অঙ্গ।

ছড়াকার ময়ূখ চৌধুরী? না, এবার নিশ্চয়ই পাঠকের কপালে ভাঁজ পড়বে। কারণ শিল্পীর এই গুণটির কথা আদৌ শোনা যায় না। কিন্তু ঘটনা এটাই যে ময়ূখ চৌধুরীর একটি চিত্রকাহিনিতে রয়েছে দুটি ছোটো ছড়া, যা কিনা যথেষ্ট মজার এবং ছন্দবদ্ধ। ছড়া দুটি হল:

লাগ ভেলকি লাগ!
এই যে দুটি দস্তানা,
কাজে কেন লাগছ না।
কাটা ছেঁড়া জোড়া দিয়ে,
তাড়াতাড়ি যাও নিয়ে,
যেখানে যা ছিল সব
রাখো চটপট।
আরিগাতো সুবিসোনা
হিং টিং ছট।

এবং

এই যে দুটি দস্তানা
খুব হয়েছে, আর না।
পাখার সুইচ বন্ধ করে
ঘুমিয়ে পড়ো চটপট
হেই লাগে লাগ ভেলকি লাগে
গোজাইমাস্তে চটাপট।

অসম্ভব বই পড়তে ভালোবাসতেন ময়ূখ চৌধুরী। বিষয় নিয়ে তেমন বাছবিচার ছিল না তাঁর। সব ধরনের বই পড়তেই তিনি ভালো-বাসতেন। আর ভালোবাসতেন সিনেমা দেখতে। প্রচুর সিনেমা দেখতেন। এবং ছিলেন দক্ষ সিনেমা বোদ্ধাও। সিনেমা সম্বন্ধে ওঁর মতামতকে গুরুত্ব দিতেন অনেক সিনেমা বোদ্ধাই। কমিক্সকেও সিনেমার মতোই ভাবতেন। অনেক এক্সপেরিমেন্ট করতেন কমিক্স নিয়ে। সত্যজিৎ রায় এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে ময়ূখ চৌধুরীর ছিল নিবিড় ঘনিষ্ঠতা। পুজোর সময় তাঁর প্রায় পুরো দিনই কাটত রায়বাড়িতে। কারণ বিশপ লেফ্রয় রোড অঞ্চলটিতে পুজোর হুল্লোড় তুলনায় অনেক কম। হইহট্টগোল আদৌ পছন্দ করতেন না বলেই পুজোর সময় ভবানীপুরের তুমুল শব্দদূষণের হাত থেকে রেহাই পেতে চলে যেতেন রায়বাড়িতে। ময়ূখ চৌধুরীর গর্ব ছিল (এবং এই গর্ব মোটেও অস্বাভাবিক নয়) স্বয়ং সত্যজিৎ রায়ের লেখাতেও (সেপ্টোপাসের খিদে) অলংকরণ করেছিলেন প্রসাদ রায়। কমিক্স নিয়েও ময়ূখ চৌধুরী দুই কমিক্সপ্রেমী পিতা-পুত্র সত্যজিৎ রায়-সন্দীপ রায়ের সঙ্গে প্রচুর আলোচনা করতেন। প্রথম জীবনে ময়ূখ চৌধুরীর কমিক্সে সামান্য দুর্বলতা ছিল কথায় অর্থাৎ বেলুনের ব্যবহারে। চরিত্রগুলি তুলনায় একটু বেশিই কথা বলত। সত্যজিৎ রায় এবং সন্দীপ রায়ের পরামর্শে এই ত্রুটি কাটিয়ে উঠেছিলেন শিল্পী। পরবর্তী পর্যায়ের কমিক্স চরিত্রগুলির মুখে কথা থাকত তুলনায় অনেক কম।

ময়ূখ চৌধুরীর 'চক্ষুমায়া' চিত্রকাহিনির নায়ক ছিলেন আত্তিলিও গত্তি। (অবাক কাণ্ড নয় কি? চাঁদের পাহাড়েও রয়েছে এক উল্লেখযোগ্য চরিত্র আত্তিলিও গত্তি) এই আত্তিলিওর অভিযানগুলি নিয়ে ময়ূখ চৌধুরী বেশ কয়েকটি বড়ো গল্প লিখেছিলেন 'কায় না', 'শয়তানের ফাঁদ', 'শত্রু', 'নরখাদক দেবতা' ও 'প্রতিহিংসা'। দুর্দান্ত এই কাহিনিগুলি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার পরিসর নেই আজকে। শুধু কমান্ডার আত্তিলিও গত্তির পরিচয় জানাতে ময়ূখ চৌধুরী যে-লাইনগুলি উল্লেখ করেছিলেন সেগুলিই এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি— 'প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কমান্ডার আত্তিলিও গত্তি নামক মিত্র পক্ষের জনৈক সৈনিক আফ্রিকার বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে যে সব ভয়াবহ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, সেই বিচিত্র অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিগুলিই আত্তিলিওর অভিযান। ...নিয়ম শৃঙ্খলার রাজ্যে এই ঘটনাগুলি হচ্ছে নিয়মের ব্যতিক্রম।'

আত্তিলিও গত্তির অভিযানগুলির মতো অনেক ব্যতিক্রমী ঘটনা শুনিয়েছেন, ব্যতিক্রমী ছবি এঁকেছেন ময়ূখ চৌধুরী। আসলে বাংলা চিত্রকাহিনির জগতে ময়ূখ চৌধুরী স্বয়ং এক ব্যতিক্রম। ভালো কমিক্স যিনি করেন তাকে বলা হয় কমিক্স শিল্পী। ময়ূখ চৌধুরী কমিক্স শিল্পী তো বটেই, একইসঙ্গে গল্প উপন্যাস লেখার সুবাদে তিনি সাহিত্যিকও। কিন্তু বাংলা চিত্রকাহিনিকে তিনি দিয়েছেন সাহিত্যের মর্যাদা। তাই কাহিনিকার ময়ূখ চৌধুরীর প্রতিভা পৃথক করে শুধু তাঁর সৃষ্ট চিত্রকাহিনিগুলির জন্যই তাঁকে কমিক্স সাহিত্যিক অ্যাখ্যা দেওয়া যায়।

হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে বাংলা তথা ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কমিক্স সাহিত্যিকের নাম 'ময়ূখ চৌধুরী'।

দেবাশিস সেন

এই লেখাটি প্রস্তুত করার সময় প্রচুর তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন শ্রীসন্দীপ রায়, শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য ও শ্রীমঞ্জিল সেন। এ ছাড়াও সাহায্য নেওয়া হয়েছে সরশুনা উপনগরী নারী স্বেচ্ছাসেবী জনকল্যাণ সংস্থা হিতাশীর বার্ষিক মুখপত্র সূচনার কাছে। সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

কিছু কথা

ময়ূখ চৌধুরীর শিল্পকর্ম আমাদের এই বঙ্গে প্রগতিশীলতার মুখ। অরণ্যদেব গোয়েন্দা রিপ বা ম্যানড্রেক ইত্যাদি বিদেশি 'কমিক্স' দেখে সবাই যখন মুগ্ধ এবং সেসবের গুণকীর্তনে ব্যস্ত তখন ময়ূখ চৌধুরী বাস্তবসম্মত (realistic) ড্রয়িং করে 'কমিক্স' বানিয়েছেন। এদেশে হাস্যরস থাক বা না-থাক, সিরিয়াল ড্রয়িং থাকলেই তাকে কমিক্স বলার রেওয়াজ আছে। আমিও তা ভুল জেনেও, সাধারণ পাঠকের বোধগম্যতার জন্য 'সিরিয়াল' না-বলে কমিক্স আখ্যা দিচ্ছি।

ময়ূখকে কেন প্রগতিশীল বলছি তার ব্যাখ্যা হল অরণ্যদেব বা গোয়েন্দা রিপ আগে সিনেমা হয়েছে। তারপর সেই ফিল্ম প্রসেস করে আয়োডিন পদ্ধতিতে, খুব সহজেই সিরিয়ালে রূপান্তর করা হয়। এটি মূল সিনেমার বাই প্রোডাক্ট। হাতে আঁকার ব্যাপার প্রায় নেই। অ্যানিমেশন-চর্চা করতে গিয়ে এই পদ্ধতির সঙ্গে আমার নিজের পরিচয় ঘটেছে। আমাদের কিশোর বয়সে 'Zorro'-র জনপ্রিয়তা ছিল খুব। সবটা কীভাবে বানানো হয়েছে তার বিবরণ ডিসনে লিখে গেছেন।

শুনেছি ময়ূখ যৌবনে আর্ট কলেজে পড়েছেন। অনুমান করি, চিড়িয়াখানায় জীবজন্তু নিজে স্টাডি করেছেন। আমাদের শৈশব-যৌবনে মেট্রো-টকি-শো হাউসে, নিউ-এম্পায়ারে সকালের শো-তে টারজান (জনি ওয়েসমুলার), জোরো, ফ্যানটম (অরণ্যদেব) এসব নিয়মিত দেখানো হত, কাগজে কোনো কমিক্স ছাপা হত না। সেই সিনেমা দেখে এবং সেসব ছবির স্টিল ছবি ইংরেজি কাগজে ছাপা হত (চিতাবাঘের, হাতির বিভিন্ন ভঙ্গি— ভয় পাওয়া, আক্রমণে উদ্যত হওয়া, সারিবদ্ধভাবে বাচ্চা সামলাতে সামলাতে এগিয়ে যাওয়া)। উৎসাহী শিল্পীমাত্রই সেসব সংগ্রহ রাখতেন। আমিও সেকাজ প্রচুর করেছি। ময়ূখ দুটোকে সাফল্যের সঙ্গেই মিলিয়েছিলেন। অর্থাৎ চিড়িয়াখানায় গিয়ে নিজ হাতে স্কেচ এবং বিদেশি ফিল্মের অ্যাকশন— দুটো মিলিয়ে পাঠকদের চমকে দিয়েছেন। King Features Syndicate-এর কল্যাণে সারাবিশ্বে কমিক্সের প্রসার ঘটেছে। তাঁরা রিয়েলিস্টিক ছবির প্রিন্ট ছাপিয়ে এবং ছড়িয়ে আমাদের শৈশবকে কল্পনায় সমৃদ্ধ করে এবং ময়ূখদের মতো শিল্পীকে স্বাধীন চিন্তা করতে, একটু স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করে মৌলিক গল্প বানাতে সাহায্য করে।

আজকের এই ইন্টারনেটের যুগে বাঘ সিংহ হাতি বোয়া (অজগর) কুমির সব কিছুর ড্রয়িং সহজলভ্য। ময়ূখরা কিছুই পাননি। কেবল নতুন কিছু করার অদম্য ইচ্ছাই ছিল তাঁদের সম্বল।

আমি শুরু থেকেই রাজনৈতিক কার্টুনে লিপ্ত থাকায় সমসাময়িক শিল্পীদের অরাজনৈতিক কার্টুনের ব্যাপারে তেমন আগ্রহী ছিলাম না। ময়ূখই যে সন্দেশের প্রসাদ রায় সেটা অজানা ছিল। তার মৃত্যুর খবরটা শুনেছিলাম বন্ধুবর সুবোধ দাশগুপ্তর (চিত্রশিল্পী) কাছে। স্বভাবে সে নাকি খুবই বাউন্ডুলে এবং কাজ দিলেও বেশি নির্ভর করা যায় না। একা একা থাকতে ভালোবাসে।

এদেশে বড়ো দৈনিকে (আনন্দবাজার ও যুগান্তর) যাঁরা চাকরি করেছেন তাঁরা ব্যতিক্রম। বাকি সবাই অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটিয়েছেন। প্রসাদ রায় ময়ূখ নাম নিলেই যে তার দু-বেলা আহারের গ্যারান্টি থাকবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। বাউন্ডুলে শব্দটির সে সময়ের অর্থ আজ বুঝি। যখন ঘরে বসে ছবি আঁকবে সে সময়টা গেছে টাকার তাগিদে।

কার্টুনের ডকুমেন্টেশন সব দেশেই হয়। ব্যতিক্রম ভারতবর্ষ। প্রকাশক নিমাইবাবু খুব ঝুঁকি নিয়ে সেই ডকুমেন্টেশনের কাজটা শুরু করেছেন। একালের পাঠক তো বটেই আগামী দিনের গবেষকদের কাছেও তিনি সাধুবাদ পাবেন। আরও বহু অজানা তথ্য এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে। অন্য প্রকাশকরা যদি একটু সহযোগিতার হাত বাড়ান আগামী প্রজন্ম কৃতজ্ঞ থাকবে। মনে রাখবেন, ইউরোপ ও আমেরিকায় কার্টুন স্ট্রিপ, কমিক্স এসব নিয়ে পিএইচ.ডি.-র থিসিস তৈরি হচ্ছে। কারণ কার্টুন হল সমসাময়িক কালের দলিল। ইতিহাসের অপরিহার্য অঙ্গ।

এই হতভাগ্য দেশে কার্টুন শিল্পীরা জীবদ্দশায় স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখেননি। 'হা অন্ন' করেই তাঁদের দিন কেটেছে। আজ সেই দুর্ভাগারা আর কিছু না-পান একটু মর্যাদা কি পেতে পারেন না! দেশের শিশু কিশোরদের মনে তাঁরা আনন্দ জুগিয়েছেন। সার্কাসের ক্লাউন তবু খেতে পান, দু-বেলা বেতন পান। একজন কার্টুনিস্ট সেই সামান্য বেতন বা মজুরি জীবদ্দশায় পাননি। এখন গ্রন্থাকারে বই ছাপা হওয়ায়, আমার ধারণা, নিমাইবাবু তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদার কিছুটা দিলেন। এজন্য এই পরিণত বয়সে, আমি ব্যক্তিগতভাবে আনন্দিত।

চণ্ডী লাহিড়ী

সূচিপত্র

ছদ্মবেশী	...	...	১৩
দূরন্ত কাহিনি	...	...	২১
বঙ্গ দেশের রঙ্গ	...	...	২৯
শয়তানের দ্বীপ	...	...	৩৭
রক্তাক্ত মানচিত্র	...	...	৪৫
ঋণশোধ	...	...	৫৩
ফাঁদ	...	...	৫৬
মবোগো	...	...	৬৪
পেক্কা	...	...	৭২
প্রান্তরে মৃত্যুর হানা	...	...	৭৭
বনবাসী বন্ধু	...	...	৮৭
সাক্ষী ছিল চাঁদ	...	...	৯৬
মহাকালের মন্দির	...	...	১০০
রবিনহুড (কালোসাপ)	...	...	১০৭
রক্তমাখা চাঁদ	...	...	১১৬
এক নাম অন্য মুখ	...	...	১২৪
দ্বৈরথ	...	...	১২৬
ইতিহাসে অস্ত্র	...	...	১২৮
ইতিহাসে পলাতক	...	...	১৩৮
স্মারক	...	...	১৫২
যাত্রী	...	...	১৬০
ত্রিলোকনাথ ত্রিবেদীর বিচিত্র কীর্তি!		...	১৬৮
অধ্যাপক ত্রিবেদী ও হানা বাড়ী		...	১৬৯
অধ্যাপক ত্রিবেদী ও কালো বিড়াল		...	১৭১
অধ্যাপক ত্রিবেদী ও বাঘা মুকুন্দ		...	১৭৫
অধ্যাপক ত্রিবেদী ও খেলোয়াড় গদাই		...	১৭৭
নন্টে আর ফন্টে	...	...	১৮২
বন্ধু	...	...	১৮৬
মুক্তি পেল রতনলাল	...	...	১৯০
অন্ধ মাকড়সা	...	...	১৯৪
রূপকথা নয়	...	...	২১০
পদক্ষেপ	...	...	২৩৪
অপরাধী কে?	...	...	২৬২

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

চণ্ডী লাহিড়ী সন্দীপ রায় ব্রাত্য বসু দেবাশিস সেন
প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত শান্তনু ঘোষ
এবং
ন্যাশানাল লাইব্রেরি দেবসাহিত্য কুটির আনন্দ পাবলিশার্স ও পত্র ভারতী

ছদ্মবেশী

খৃঃ পূঃ ৩২৭ সাল… ভারতবর্ষ তখন ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং সেই বিভিন্ন ভূখন্ডের উপর রাজত্ব করতেন বিভিন্ন নরপতি। আচম্বিতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিকে হানা দিল দুর্ধর্ষ গ্রীক-বাহিনী — তাদের নেতৃত্ব করছিলেন মহাবীর আলেকজান্দার!

খৃঃ পূঃ ৩২৭ সাল … ভারতের বুকের উপর সর্বনাশের ছায়া মেলে এগিয়ে এল আলেকজান্দারের বিপুল বাহিনী … দুরন্ত যবনের তরবারির নীচে লুটিয়ে পড়ল একাধিক ভারতীয় রাজ্য … রক্ত আর আগুনের সেই ভয়ংকর পটভূমিকায় আর্যাবর্তের এক অরণ্যপথে আবির্ভূত হ'ল — আমাদের কাহিনীর নায়ক …

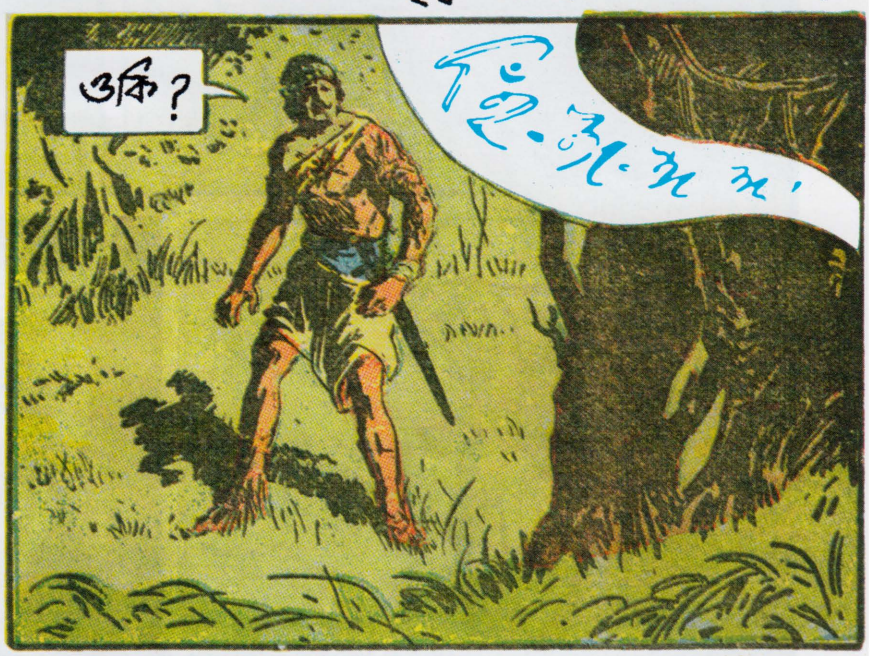

ময়ূখ চৌধুরী

ছদ্মবেশী

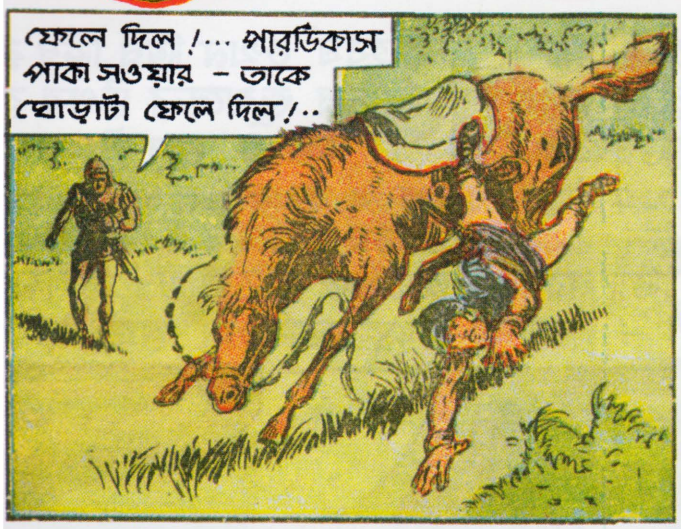

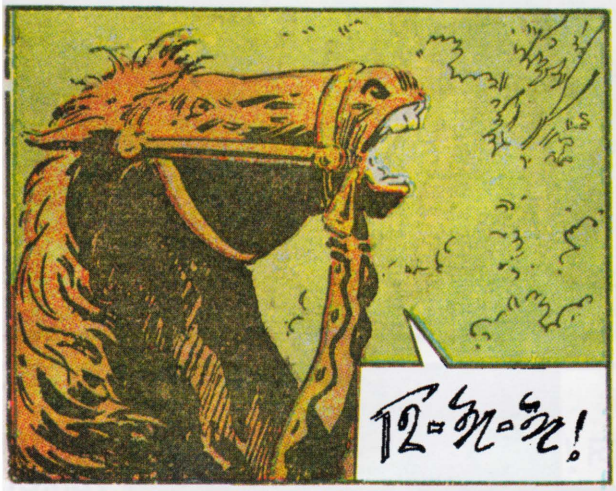

ছদ্মবেশী

আমার ঘোড়া চুরি করা সহজ নয় — হাঃ! হাঃ!
উদ্ধত হিন্দু! আমাকে তুমি বিদ্রূপ করছো!.. তোমার মৃত্যু নিশ্চিত!
ওহে গ্রীক চোর! আমিও তলোয়ার চালাতে জানি — বুঝেছ?
পারডিকাস! দাঁড়াও! লোকটি আহত!...
লোকটি আহত — ওর মাথা এবং দেহের বাঁধনগুলি থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে! ওর সঙ্গে লড়াই করা উচিত নয়।
আহত মানুষ বিদ্রূপ করতে পারে কিন্তু নিহত মানুষ কথা কয় না; আমি ওকে হত্যা করব।
ওহে গ্রীক! অত সহজ নয়!
অনেক যুদ্ধ করেছ — এখন একটু ঘুমাও!
আঃ!

ময়ূখ চৌধুরী

ছদ্মবেশী

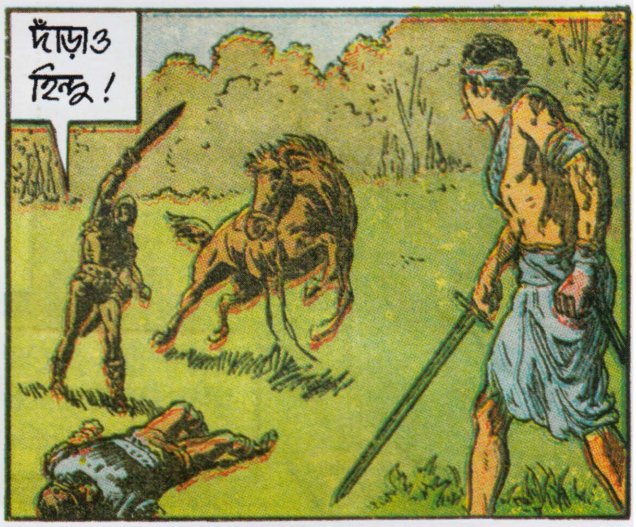

ছদ্মবেশী

কলহের কারণ আমি জানি না — কিন্তু যুদ্ধের ফলাফল তো স্বচক্ষে দেখলাম.. দু'দুজন গ্রীক একটি হিন্দুর কাছে পরাজিত — লজ্জার কথা !

আমি লজ্জাবোধ করছি না — গ্রীক দু'জনের দেহে রক্তের চিহ্ন নেই, কিন্তু গ্রীক সৈনিকের অসি শত্রুর মাথায় ও বুকে এঁকে দিয়েছে রক্তের আলপনা !

গ্রীকের অসি আমার রক্তপান করতে পারে নি, — রক্তপাতের কারণ বন্য ব্যাঘ্রের দন্ত ও নখর !
বন্য ব্যাঘ্র ?

যুবকের অশ্ব প্রভুর পাশে এসে দাঁড়াল...
আমার ঘোড়া অঞ্জন— ওকে নিয়েই যত বিপত্তি... সমস্ত ঘটনা খুলে বলছি শুনুন-

... কাল রাত্রে বনের পথে বিশ্রাম করছি, এমন সময়ে একটি ব্যাঘ্র আমাকে আক্রমণ করল। আমি খাপ থেকে তরবারি টেনে নিতে পারলাম না — হিংস্র শ্বাপদ মুহূর্তের মধ্যে আমাকে দন্ত ও নখরের কঠিন আলিঙ্গনে বন্দী করে ফেলল... অতিকষ্টে কটিবন্ধে আবদ্ধ ছুরিকা টেনে নিয়ে ব্যাঘ্রকে বধ করলাম। ইতিমধ্যে আমার অশ্ব অঞ্জন ভীত হয়ে পলায়ন করে ... আজ প্রভাতে বনপথে অশ্বের অনুসন্ধান করছি, অকস্মাৎ হ্রেষাধ্বনি শুনে চমকিত হলাম — আমার অশ্বের কণ্ঠস্বর ! এখানে এসে দেখি এই দু'জন গ্রীক সৈনিক আমার ঘোড়া চুরি করার চেষ্টা করছে — পরবর্তী ঘটনা আপনি জানেন।

ময়ূ

ময়ূখ চৌধুরী

হসমবেশী

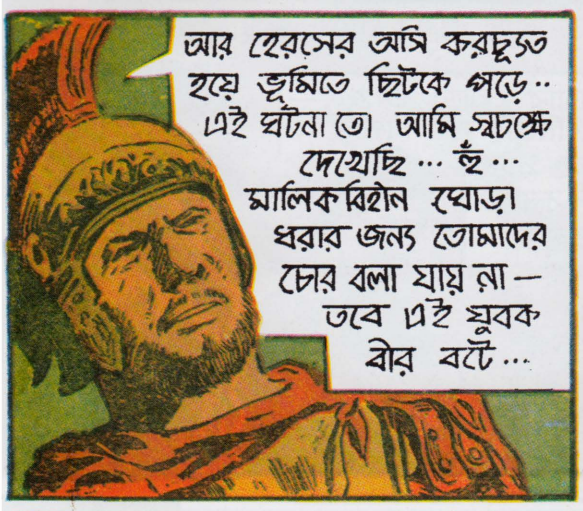

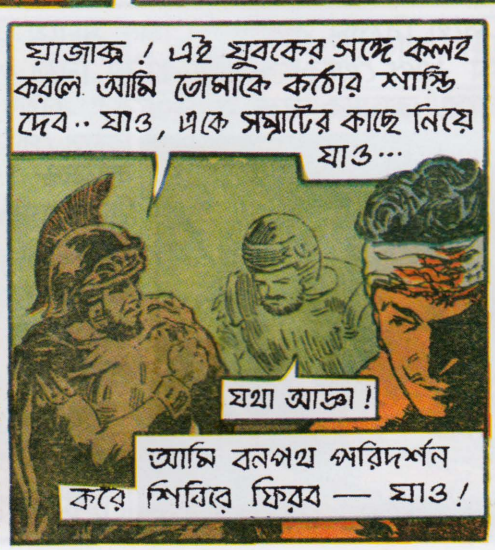

ছদ্মবেশী

এসো যুবক! য়াজাক্রের কাছে সব শুনলাম — তুমি আমার সেনাদলে যোগ দেবে? তোমার পরিচয় দাও।
আলেকজান্দারের শিবির...
সম্রাট! মগধ-শাসিত পিপ্পলীবনের আমি এক নাগরিক, — যুদ্ধ ও রথচালনা আমার পেশা... আমার নাম —
আমার নাম চন্দ্রগুপ্ত আমি আপনাকে মগধের পথ দেখাব — অবশ্য যদি আপনি আমার শর্তে রাজী থাকেন।

মগধের পথ· তোমার পরিচিত·· হুঁ··· তোমার সাহায্য প্রয়োজন হবে·· কিন্তু কি তোমার শর্ত?
লুণ্ঠিত ধন নিয়ে আপনাকে মগধ ত্যাগ করতে হবে — এই আমার শর্ত!
গ্রীক সম্রাটের পতিবিধির উপর কোনও শর্ত আরোপিত হতে পারে না — আমি এই শর্তে রাজী নই।
আমার শর্তে রাজী না হলে মগধ জয়ের আশা ত্যাগ করুন সম্রাট! সে বড় কঠিন ঠাঁই!

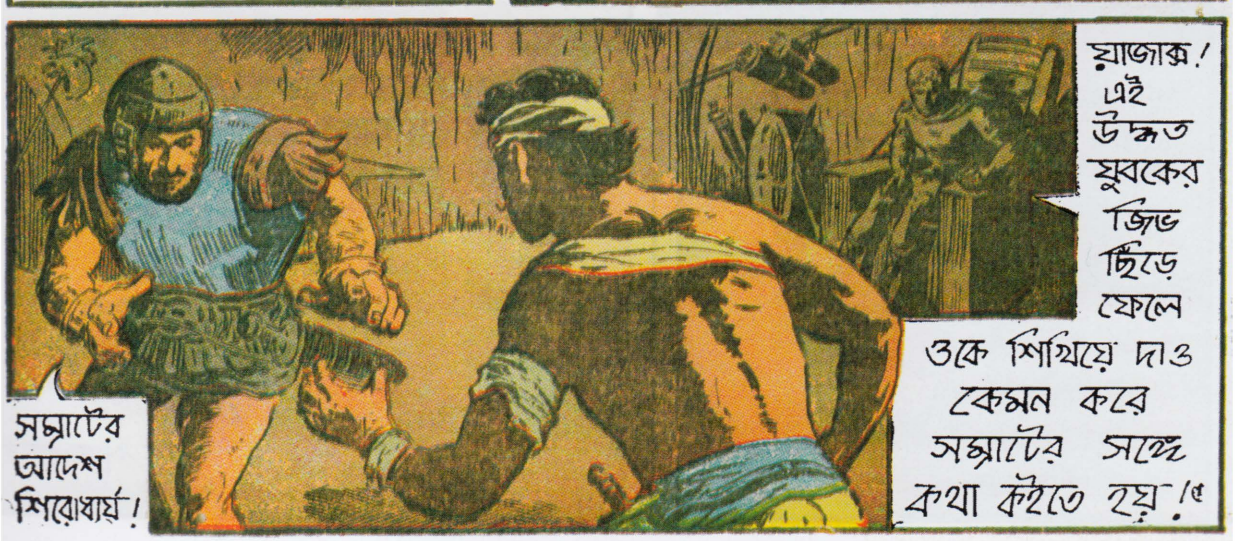
য়াজাক্র! এই উদ্ধত যুবকের জিভ ছিঁড়ে ফেলে ওকে শিখিয়ে দাও কেমন করে সম্রাটের সঙ্গে কথা কইতে হয়!
সম্রাটের আদেশ শিরোধার্য!

ময়ূখ চৌধুরী

ছদ্মবেশী

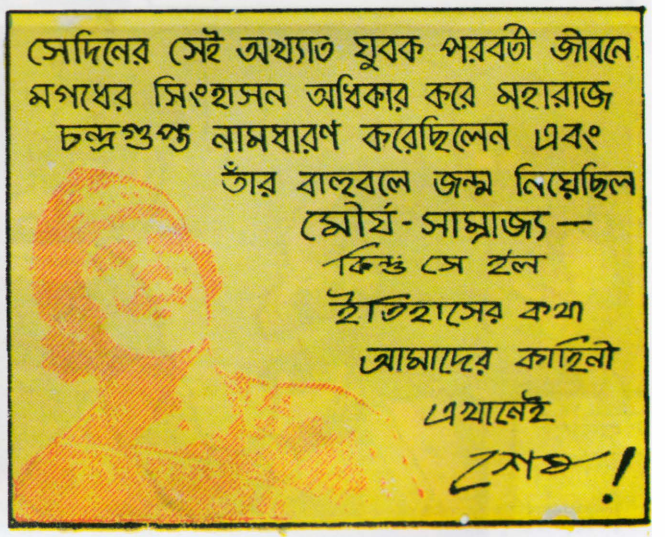

চরন্ত কাহিনী

আজ থেকে বহু বৎসর আগেকার কথা...

ছত্রপতি শিবাজীর মৃত্যুর পরে মহারাষ্ট্রের কর্ণধার হলেন তাঁর পুত্র শম্ভাজি। সেই সময় বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের হাবসি নৌবলাধ্যক্ষ সিদ্দি ইয়াকুব খাঁ তার দুর্জয় নৌবহর নিয়ে কংকণ উপকূলে হানা দিল। সিদ্দি দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, কিন্তু সে কৌশলীও বটে — প্রচুর উৎকোচ অর্থাৎ ঘুষ দিয়ে সে দুর্গস্বামীদের বশ করে ফেলতে লাগল। ঘুষের মহিমায় অনেকগুলি দুর্গ বিনাযুদ্ধে অধিকার করলে সিদ্দি — অবশেষে অবরুদ্ধ হল সুবর্ণদুর্গ...

সুবর্ণ মোহরের লোভে সুবর্ণদুর্গের অধিপতি অচলাজি মোহিতে সিদ্দির হাতে দুর্গ সমর্পণ করার উদ্যোগ করতে লাগলেন। দুর্গরক্ষী সৈন্যরা ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারল কিন্তু তারা প্রতিবাদ করতে চাইল না। সৈন্যরা ভাল ভাবেই বুঝেছিল উৎকোচের কিছু অংশ তাদের মধ্যেও ভাগ-বাঁটোয়ারা হবে — তাই যুদ্ধের কথা ভুলে মোটা বকশিশের লোভে তারা মত্ত হয়ে উঠল...

বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্তের ফলে যখন সুবর্ণদুর্গের পতন আসন্ন ঠিক সেই সময় একদিন গভীর রাত্রে দুর্গের নীচে খাড়ির জলে নিঃশব্দে নেমে পড়ল এক নির্ভীক কিশোর...

দুরন্ত কাহিনী

জলের মধ্যে মূর্তিমান মৃত্যুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে আমাদের কাহিনীর নায়ক তীরভূমির উপর এসে পড়ল…

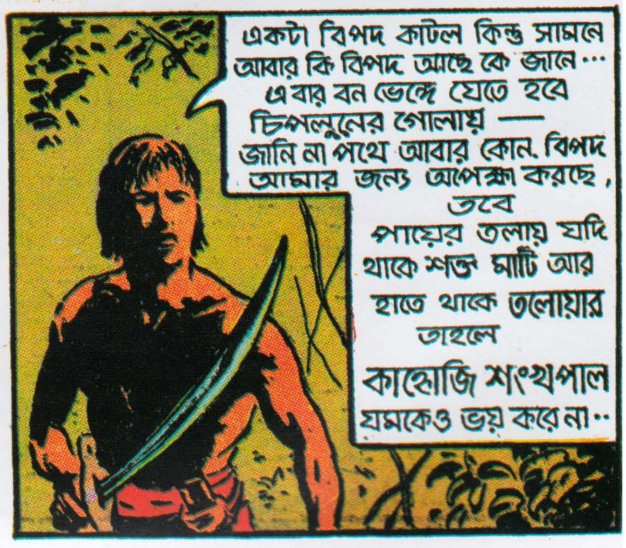

দুরন্ত কাহিনী

উপকূলে অবস্থিত গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলে রহস্যময় কিশোর, — জঙ্গল আর পাহাড়ের উপর দিয়ে দুর্গম বনপথ ভেঙে তার যাত্রা শুরু হ'ল...
গভীর রাত্রি...
বনের মধ্যে অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে বসে ধ্যান করছেন এক সন্ন্যাসী...

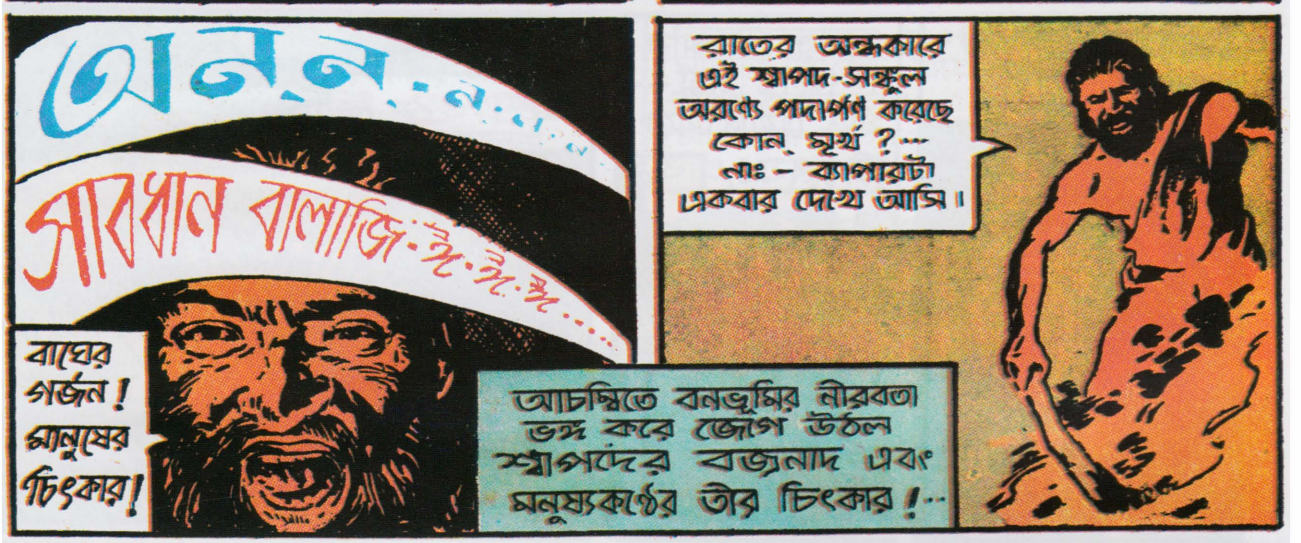
অন্ন...ন...ন...
সাবধান বালাজি...হঁ...হঁ...হঁ....
বাঘের গর্জন! মানুষের চিৎকার!
রাতের অন্ধকারে এই শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যে পদার্পণ করেছে কোন্ মূর্খ?... নাঃ – ব্যাপারটা একবার দেখে আসি।
আচম্বিতে বনভূমির নীরবতা ভঙ্গ করে জেগে উঠল শ্বাপদের বজ্রনাদ এবং মনুষ্যকণ্ঠের তীব্র চিৎকার!...

অন্ন্!
সাবধান বালাজি!

দুরন্ত কাহিনী

তিষ্ঠ !

তিষ্ঠ !
শার্দুল ! তিষ্ঠ !

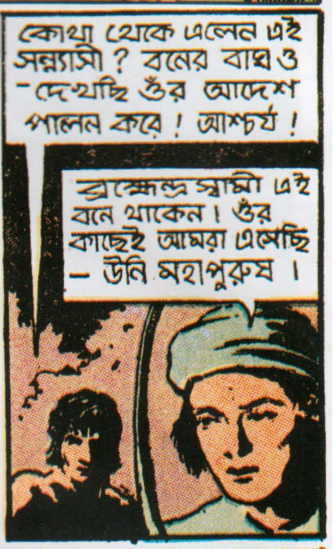
কোথা থেকে এলেন এই সন্ন্যাসী ? বনের বাঘও -দেখছি ওঁর আদেশ পালন করে ! আশ্চর্য !
ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী এই বনে থাকেন। ওঁর কাছেই আমরা এসেছি – উনি মহাপুরুষ ।

গররর !..

এরা তোমার শিকার নয়... যাও. এখান থেকে তুমি চলে যাও!

যাও !

একি! বালাজি ! তুমি এখানে ?

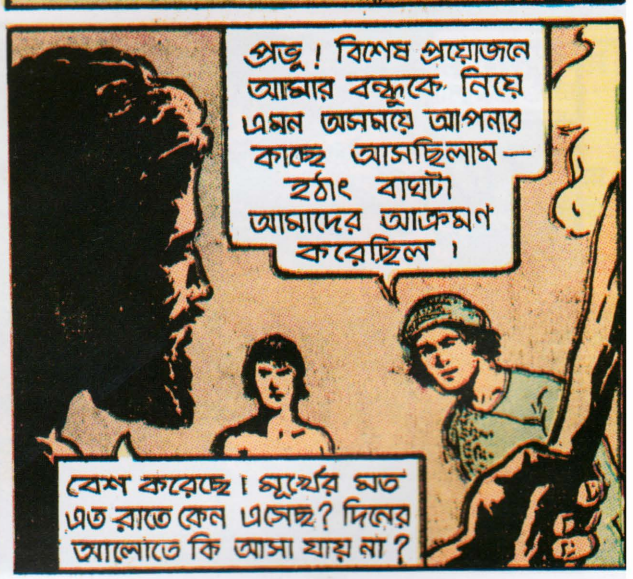
প্রভু ! বিশেষ প্রয়োজনে আমার বন্ধুকে নিয়ে এমন অসময়ে আপনার কাছে আসছিলাম— হঠাৎ বাঘটা আমাদের আক্রমণ করেছিল ।
বেশ করেছে। মূর্খের মত এত রাতে কেন এসেছ? দিনের আলোতে কি আসা যায় না ?

দুরন্ত কাহিনী

প্রভু! দিনের আলোতে আমি আসতে পারিনা…
বিশেষ দরকারে এমন অসময়ে এসেছি। প্রয়োজন আমার — বালাজি পথপ্রদর্শক মাত্র।

বেশ, আমার কুটিরে চলো। তোমার সব কথা আমি শুনব, কিন্তু আগে তোমার পরিচয় জানতে চাই। বালাজি বিশ্বনাথ আমার পরিচিত, — চিপলুনের লবণগোলায় সে কেরানীর কাজ করে এবং ঐখানেই বাস করে, — কিন্তু তুমি কে?

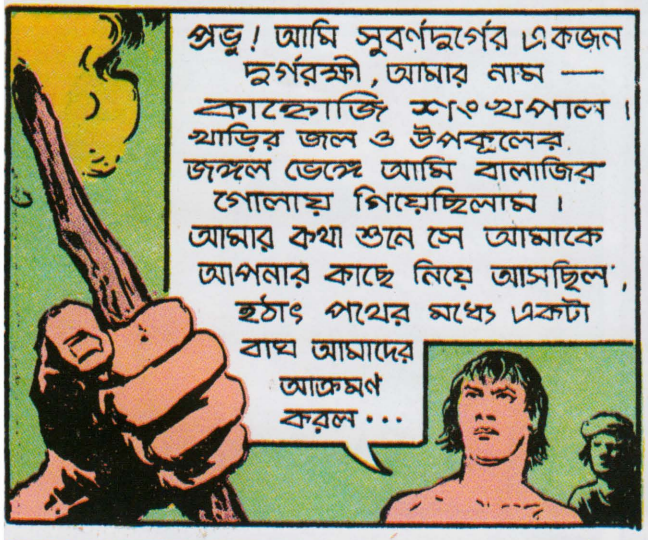
প্রভু! আমি সুবর্ণদুর্গের একজন দুর্গরক্ষী, আমার নাম — কাঙ্কোজি শংখপাল। খাড়ির জল ও উপকূলের জঙ্গল ভেঙে আমি বালাজির গোলায় গিয়েছিলাম। আমার কথা শুনে সে আমাকে আপনার কাছে নিয়ে আসছিল, হঠাৎ পথের মধ্যে একটা বাঘ আমাদের আক্রমণ করল…

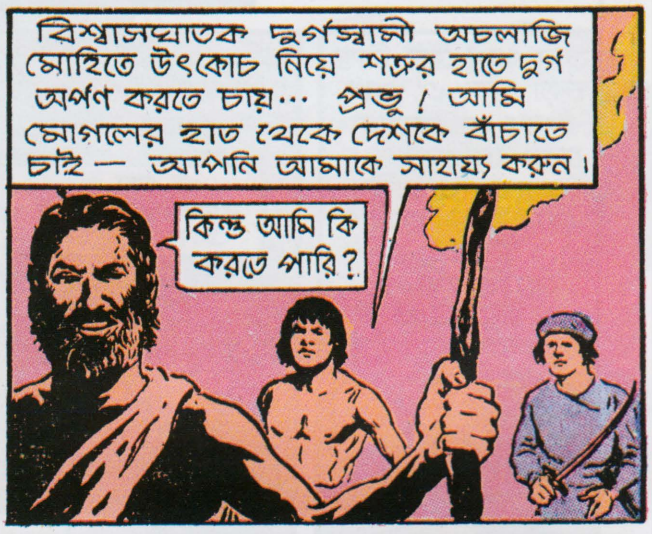
বিশ্বাসঘাতক দুর্গস্বামী অচলাজি মোহিতে উৎকোচ নিয়ে শত্রুর হাতে দুর্গ অর্পণ করতে চায়… প্রভু! আমি মোগলের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে চাই — আপনি আমাকে সাহায্য করুন।
কিন্তু আমি কি করতে পারি?

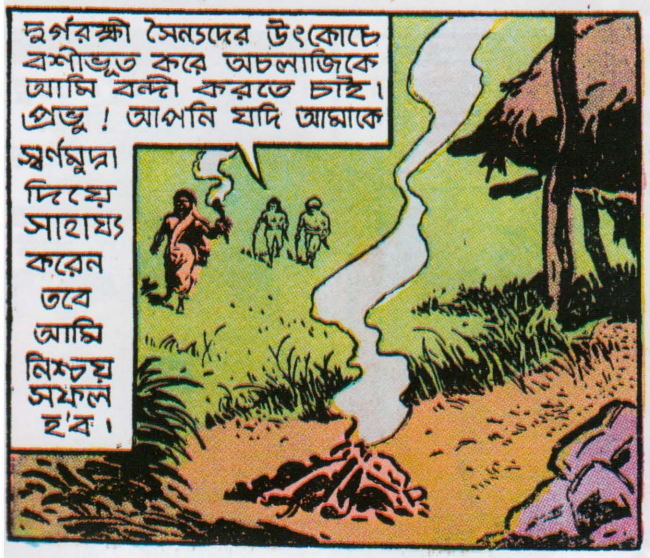
দুর্গরক্ষী সৈন্যদের উৎকোচে বশীভূত করে অচলাজিকে আমি বন্দী করতে চাই। প্রভু! আপনি যদি আমাকে স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে সাহায্য করেন তবে আমি নিশ্চয় সফল হ'ব।

তোমরা দু'জন ঐ কুটিরের সামনে অপেক্ষা করো — আমি একটু ঘুরে আসছি।

দুরন্ত কাহিনী

আশ্চর্য মানুষ !
সত্যি আশ্চর্য মানুষ। ব্রহ্মেন্দ্রস্বামী কৈশোর থেকেই সংসার-ত্যাগী; — উনি মহাযোগী মহাপুরুষ

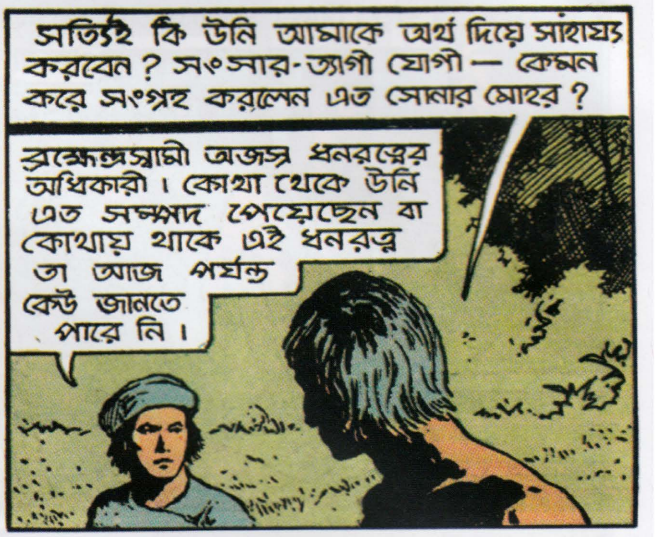
সত্যিই কি উনি আমাকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করবেন? সংসার-ত্যাগী যোগী — কেমন করে সংগ্রহ করলেন এত সোনার মোহর?
ব্রহ্মেন্দ্রস্বামী অজস্র ধনরত্নের অধিকারী। কোথা থেকে উনি এত সম্পদ পেয়েছেন বা কোথায় থাকে এই ধনরত্ন তা আজ পর্যন্ত কেউ জানতে পারে নি।

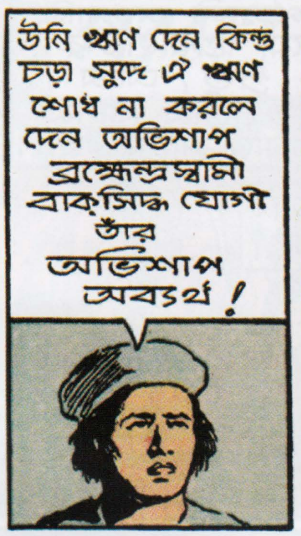
উনি ঋণ দেন কিন্তু চড়া সুদে ঐ ঋণ শোধ না করলে দেন অভিশাপ ব্রহ্মেন্দ্রস্বামী বাক্‌সিদ্ধ যোগী তাঁর অভিশাপ অব্যর্থ !

ঐ যে ব্রহ্মেন্দ্রস্বামী আসছেন।

কাহ্নোজি! এই থলে ভর্তি সোনার মোহর তোমাকে দান করলুম।

শোনো কাহ্নোজি! দেশের জন্য সৎকার্যে এই অর্থ তুমি ব্যয় করবে। যদি লোভের বশে এই অর্থ আত্মসাৎ করো তাহলে আমার অভিশাপে তুমি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হবে।
প্রভু! সোনার মোহরের চাইতে জন্মভূমির স্বাধীনতার মূল্য অনেক বেশী।

সাধু! সাধু! কাহ্নোজি সৎপুত্র, তুমি জন্মভূমির সন্তান বটে!

দুরন্ত কাহিনী

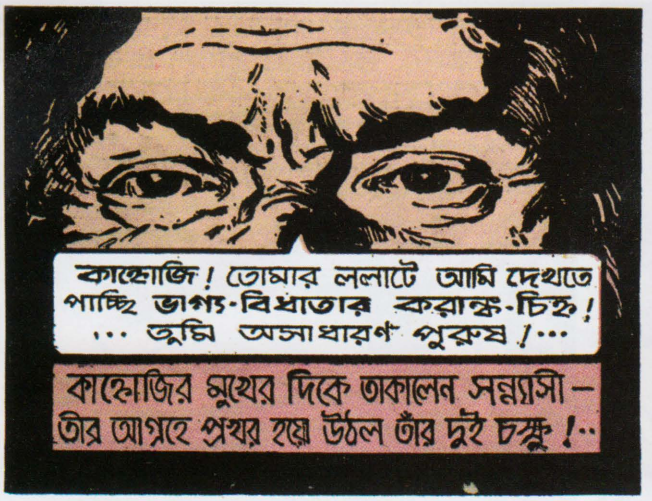
কাহ্নোজি! তোমার ললাটে আমি দেখতে পাচ্ছি ভাগ্য-বিধাতার করাঙ্ক-চিহ্ন! ... তুমি অসাধারণ পুরুষ!...
কাহ্নোজির মুখের দিকে তাকালেন সন্ন্যাসী — তীব্র আগ্রহে প্রখর হয়ে উঠল তাঁর দুই চক্ষু!..

আমি দেখতে পাচ্ছি অচলাজি মোহিতে এখন গভীর নিদ্রায় অচেতন!... আমি দেখছি... দেখছি... খাড়ির জলে সন্তরণ করছে ক্ষুধার্ত কুম্ভীর!... যাও কাহ্নোজি, কুম্ভীর তোমায় গ্রাস করতে পারবে না — তোমার পথ নিষ্কণ্টক!...

দুর্গস্বামী অচলাজি মোহিতে স্বপ্ন দেখছেন — সোনার মোহর!... রাশি রাশি সোনার মোহর!...

অকস্মাৎ মোহরের স্তূপ ভেদ করে আবির্ভূত হ'ল একটি বিষধর সর্প!

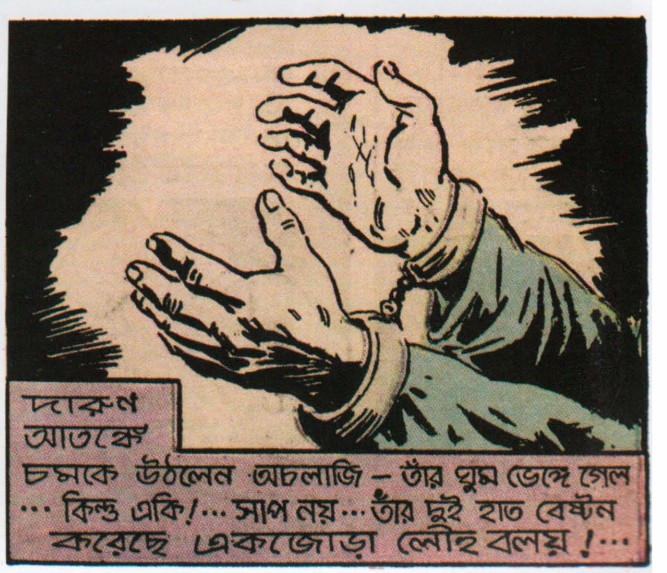
দারুণ আতঙ্কে চমকে উঠলেন অচলাজি — তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল ... কিন্তু একি!... সাপ নয়... তাঁর দুই হাত বেষ্টন করেছে একজোড়া লৌহ বলয়!...

দুরন্ত কাহিনী

কাহ্নোজি শংখপাল! এর মানে কি?
আপনি আমার বন্দী।

ওরে কে আছিস এই শয়তান কাহ্নোজিকে বন্দী কর... আমি এক এক জনকে পাঁচ মোহর করে বকশিশ দেব —
রঘুনাথ! সদাশিব! পিংলে!

ওরা কেউ আসবে না ... ওদের সবাইকে দশ-দশ মোহর আমি বকশিশ দিয়েছি। অচলাজি মোহিতে! আপনি এখন আমার বন্দী; পরে মহারাজ শম্ভাজীর দরবারে আপনার বিচার হবে...

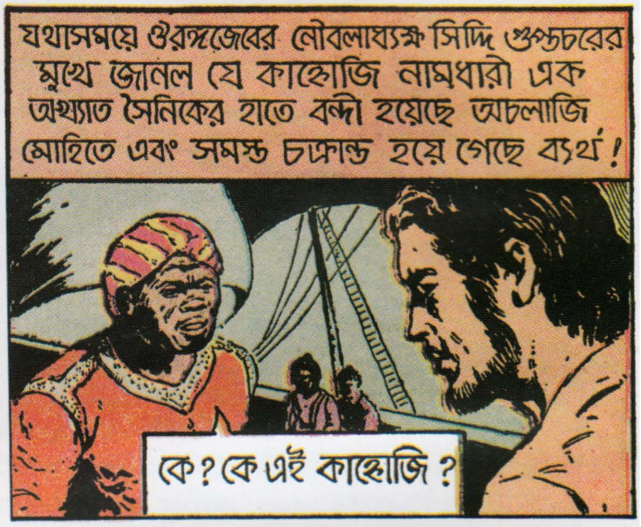
যথাসময়ে ঔরঙ্গজেবের নৌবলাধ্যক্ষ সিদ্দি গুপ্তচরের মুখে জানল যে কাহ্নোজি নামধারী এক অখ্যাত সৈনিকের হাতে বন্দী হয়েছে অচলাজি মোহিতে এবং সমস্ত চক্রান্ত হয়ে গেছে ব্যর্থ!
কে? কে এই কাহ্নোজি?

কাহ্নোজির বাবার নাম তুকোজি শংখপাল, ওদের বড়ি ছিল আঙ্গারওয়াদি গ্রামে।

আংগারিয়া? আংগার? ঐ আংগারিয়াকে দেখে নেব আমি...

সিদ্দির কথার প্রতিধ্বনি তুলে কাহ্নোজিকে আংগ্রে বা আংগারিয়া নামে ডাকতে লাগল শত্রুমিত্র সবাই।
কাহ্নোজি শংখপাল ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করল ভিন্ন নামে —
কাহ্নোজি আংগ্রে!

বঙ্গদেশের রঙ্গ

আমাদের কাহিনীর পটভূমি
ব্রেজিলের এক অরণ্যময় প্রদেশ,
ইংরেজি সাল ১৮৮৫ খৃঃ ...

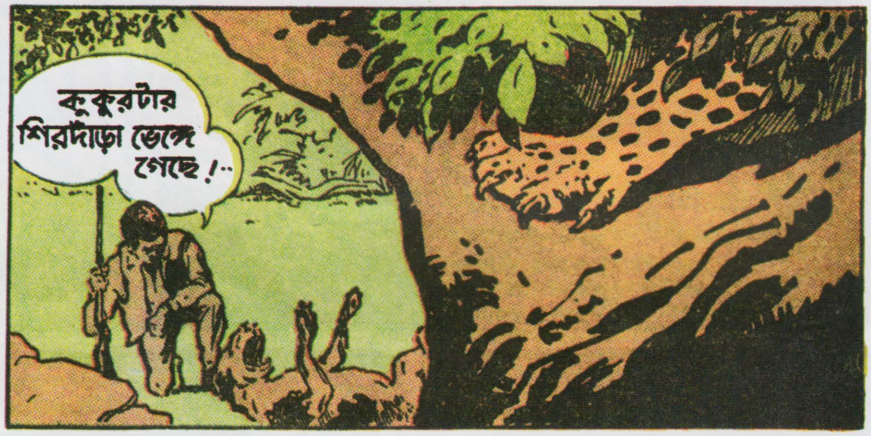

রফফ্!
গররর!
ওঃ!
অররর!
রর!
হেল্প!
!
হেল্প রর্র!

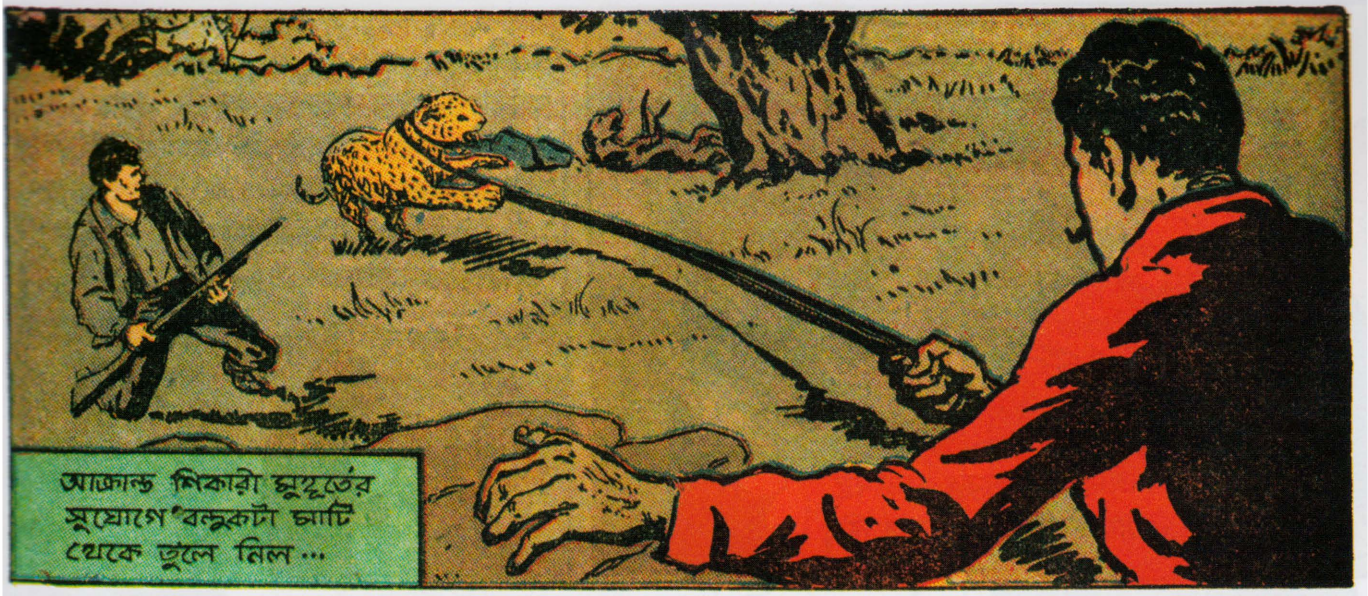
আক্রান্ত শিকারী মুহূর্তের সুযোগে বন্দুকটা মাটি থেকে তুলে নিল...

গর্জে উঠল শিকারীর বন্দুক...
দুম্!

গুলিটা না ছুঁড়লেই ভাল ছিল।
আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ বলে ধন্যবাদ – কিন্তু গুলি না ছুঁড়লে তোমার মৃত্যু ছিল নিশ্চিত...

হঠাৎ চাবুক চালিয়ে জন্তুটাকে তুমি কাবু করেছ বটে, কিন্তু চাবুকের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত ক্ষ্যাপা জাগুয়ারের সঙ্গে লড়াই করা চলে না.. গুলি না ছুঁড়লে তোমার মৃত্যু ছিল নিশ্চিত।
জাগুয়ারের চাইতে অনেক ভীষণ জানোয়ারের সঙ্গে আমি চাবুক হাতে লড়াই করেছি।

তুমি দেখছি বিদেশী – এই জঙ্গলে কেন এসেছ? আমি স্বীকার করছি তুমি চাবুকের খেলায় পাকা খেলোয়াড় – কিন্তু একখানা চাবুকের ভরসায় এই জাগুয়ারের আড্ডায় যদি কেউ ঘুরে বেড়ায় তাহলে সে হয় নিরেট মূর্খ আর নয়তো বদ্ধ উন্মাদ!
তুমি তো পাগলও নও বোকাও নও তুমি এমন অসাবধান হয়ে পথ চলো কেন?... তুমি কি জানো না এই বনে গাছের উপর থেকে যে-কোনও মুহূর্তে জাগুয়ার লাফিয়ে পড়তে পারে?

হঠাৎ আমার কুকুর টমের মৃতদেহ দেখে চমকে উঠেছিলাম। মুহূর্তের জন্য অসাবধান হয়েছিলাম - তাই এই বিপদ।
তোমার কুকুরের মৃতদেহ এখানে এল কি করে? মিঃ -
মিঃ লিনস - আমার নাম বার্নান্দো লিনস। এই জঙ্গল থেকে কয়েক মাইল দূরে আমাদের একটা গো-শালা আছে। আমি আর আমার ভাই পুনান্দো ঐ গো-শালার গরুগুলিকে দেখা-শুনা করি। গতকাল রাত্রে একটা জাগুয়ার গো-শালার ভিতর ঢুকে একটা বাছুর মেরেছে। সকাল হতেই আমার ভাই পুনান্দো কুকুর নিয়ে ...
আমার ভাই পুনান্দো পাঁচটা শিকারী কুকুর নিয়ে জাগুয়ারের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে বনের ভিতর হানা দিল। পুনান্দো পাকা শিকারী, আমি তার জন্য চিন্তা করি নি - কিন্তু যখন দুপুর গড়িয়ে বিকাল হতে চলল তখন বন্দুক হাতে আমি ভাইয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম। টমের মৃতদেহ দেখে..
আমি চমকে গিয়েছিলাম। আরও আশ্চর্য হচ্ছি জাগুয়ারটাকে দেখে... টমকে মেরে জন্তুটা গাছের উপর উঠে আত্মরক্ষা করল কেমন করে? ... এই ধরণের দুর্ঘটনা ঘটলে দলের অন্য কুকুরগুলো গাছের তলায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে থাকে এবং কুকুরের চিৎকার শুনে শিকারী অকুস্থলে এসে গুলি চালিয়ে জাগুয়ারকে হত্যা করে। কিন্তু আমাদের কুকুরগুলো হঠাৎ সরে পড়ল কেন? বার্নান্দোই বা কি করছিল?
মিঃ বার্নান্দো! তোমাদের কুকুর টমকে যে জন্তুটা হত্যা করেছে, তার পিছু নিয়ে অন্য কুকুরগুলো ছুটেছে। তোমাকে এখন যে জাগুয়ারটা আক্রমণ করেছিল, টমের মৃত্যুর জন্য সে দায়ী নয়..

তোমাকে একলা পেয়ে জন্তুটা হঠাৎ আক্রমণ করেছিল। কিন্তু টমের মৃত্যুর জন্য এই জাগুয়ারটা দায়ী নয়। তুমি ভেবে দ্যাখো, পাঁচ-পাঁচটা কুকুরের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা কুকুরকে হত্যা করে যে জানোয়ার সরে পড়তে পারে সে কিরকম ভয়ংকর জীব। কিন্তু তোমার গুলিতে যে জন্তুটা মারা পড়েছে সেটা বিশেষ বড় নয়।
তোমার কথা সত্যি। টমের মৃতদেহ দেখে আমি বুঝেছি কুকুরটার মেরুদন্ড থাবার আঘাতে ভেঙ্গে গেছে। এতবড় কুকুরের মেরুদন্ড এক থাবায় ভেঙ্গে পাঁচ-পাঁচটা শিকারী কুকুরের ব্যূহ ভেদ করে পালাতে পারে এমন জানোয়ার আমি ব্রেজিলের বনে কখনও দেখি নি!
টমের হত্যাকারী হয়তো ভিনদেশী জানোয়ার! হয়তো আমার মতই সে বিদেশে বেড়াতে এসেছে!
তা হতে পারে। হয়তো —
হয়তো ভারতের বাঘ কিংবা আফ্রিকার সিংহ আমার গরুর গায়ের গন্ধ পেয়ে সাঁতার কেটে সাগর পেরিয়ে ব্রেজিলে চলে এসেছে! তোমার কথাগুলো বেশ!...
হ্যাঁ, ভাল কথা — বিদেশী তোমার নাম কি?
আমি বাংলা দেশের মানুষ। আমার নাম —
ওকি! কিসের গর্জন!
হুন্নন্নন্!...
হুন্নন্নন্! হুন্নন্! আ-আ-আ!...
পুনান্দোর আর্তনাদ! একটা ভয়ংকর গর্জন! কুকুরের চিৎকার!
ভোক্! ভোক্!
রঙ্গ! রঙ্গলাল!

ভোক্! ভোক্!
হুণ্ড্রুম্ ! রর!
অরর!
অরর!
ভোক্! ভোক্! ভোক্!
টাইগার! অবিশ্বাস্য! ব্রেজিলের বনে টাইগার!
দাঁড়াও বন্ধু!

দাঁড়াও বন্ধু ! অত চটপট গুলি চালানো উচিত নয়।
রঙ্গ !
হনুন !
রঙ্গ ! রঙ্গলাল !
নুন ! অনুন !
রঙ্গলাল !... খবর্দার, কেউ বন্দুকে হাত দেবে না।

ব্রেজিলের বনে সেদিন যে নাটকীয় ঘটনা ঘটেছিল তার উল্লেখ ইতিহাসে নেই। কিন্তু সেদিনের অখ্যাত বাঙ্গালী যুবক পরবর্তী জীবনে ব্রেজিলের সেনাবাহিনীতে প্রবেশ করেছিল, এবং ব্রেজিলের গৃহযুদ্ধে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করে যে নামটিকে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর করে রেখেছিল, সেই নামটি হল — কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস।

শয়তানের দ্বীপ

সত্য ঘটনা অবলম্বনে...

ক্যালিফর্ণিয়ার মূল ভূখন্ড থেকে কয়েক মাইল দূরে একটি ছোট দ্বীপের কাছে, সমুদ্রের বুকে একদিন দুটি নৌকা দেখা গেল...

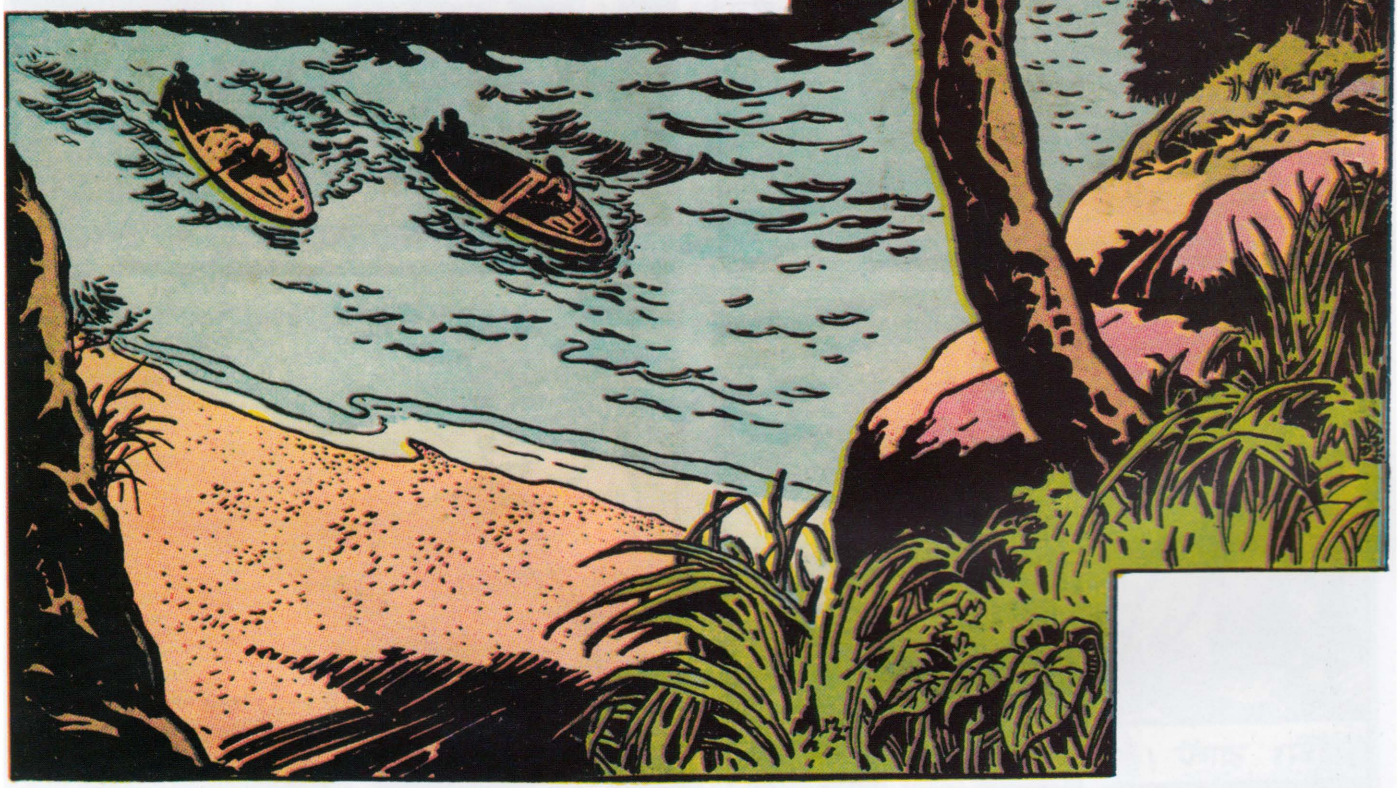

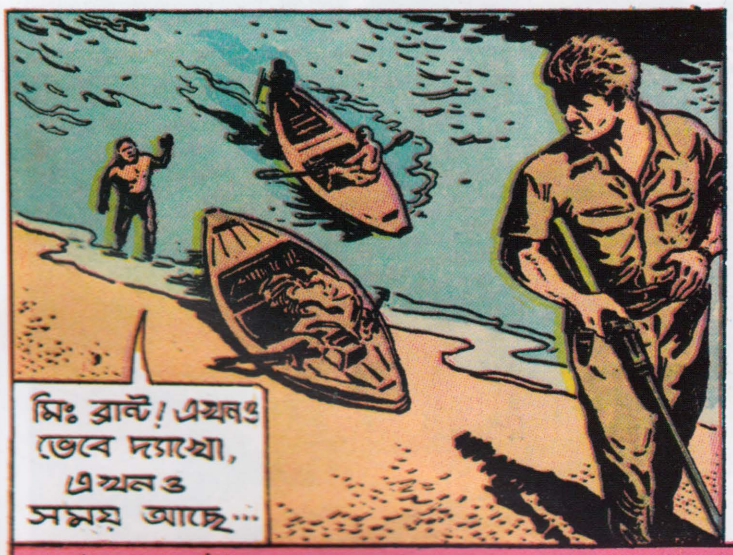

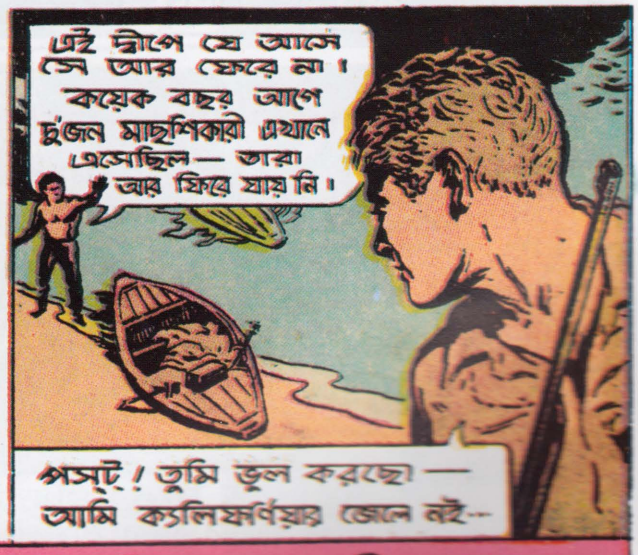

নৌকা দুটি তীরে ভিড়ল। একজন আরোহী রাইফল্ হাতে দ্বীপে নামল...

শয়তানের দ্বীপ

আমার নাম বিল ব্রান্ট! আমি টেক্সাসের পাকা শিকারী. ক্যালিফর্ণিয়ার জেলে নই! বুঝেছ?...

আমাকে চারদিন পরে এইখানে দেখতে পাবে।
তোমার খাবার আর তাঁবুর মালপত্র ঐ নৌকায় রইল....

মিঃ ব্রান্ট! চারদিন পরে আমরা তোমায় নিতে আসব...

পস্ট্ এবং তার সঙ্গীরা নৌকা নিয়ে চলে গেল...

ব্রান্ট দ্বীপের মধ্যে ঢুকল। হঠাৎ মাটির উপর কয়েকটা পায়ের চিহ্ন তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল...

পায়ের ছাপগুলি বেশ পরিষ্কার, কিন্তু জন্তুগুলো কোথায়?

শয়তানের দ্বীপ

কিন্তু ব্রান্ট ছাড়া দ্বীপে অন্য শিকারী আছে, পাখীর মাংসে তাদের অরুচি নেই। মস্ত পাথরটার নীচে অন্ধকারের ভিতর থেকে একটা দীর্ঘ চতুষ্পদ দেহ তীরবেগে ছুটে এল!...

শয়তানের দ্বীপ

ওঃ! ওটা শুয়র! নেকড়ে নয়! কিন্তু নেকড়ের মতই হাল্কা দেহ— আরও হিংস্র.. ভয়ঙ্কর!
স্তম্ভিত ব্রান্টএর চোখের সামনে সেই হিংস্র বরাহ তার রক্তাক্ত শিকারকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলল...

খট্! খট্! খট্!...
ওকি? কিসের শব্দ?
পিছনের জঙ্গল ভেদ করে ছুটে এল তিনটি বরাহ-মূর্তি ব্রান্টএর দিকে! শক্ত পাথুরে মাটিতে তাদের খুরগুলো বেজে উঠছে — খট্, খট্...

কড়াক্!
ব্রান্টএর পায়ের থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে একজোড়া দাঁতালো চোয়াল সশব্দে বন্ধ হল — ব্রান্ট বুঝল গাছে উঠতে দেরী হলে আর রক্ষা ছিল না - একটুর জন্য সে বেঁচে গেছে..

শয়তানের দ্বীপ

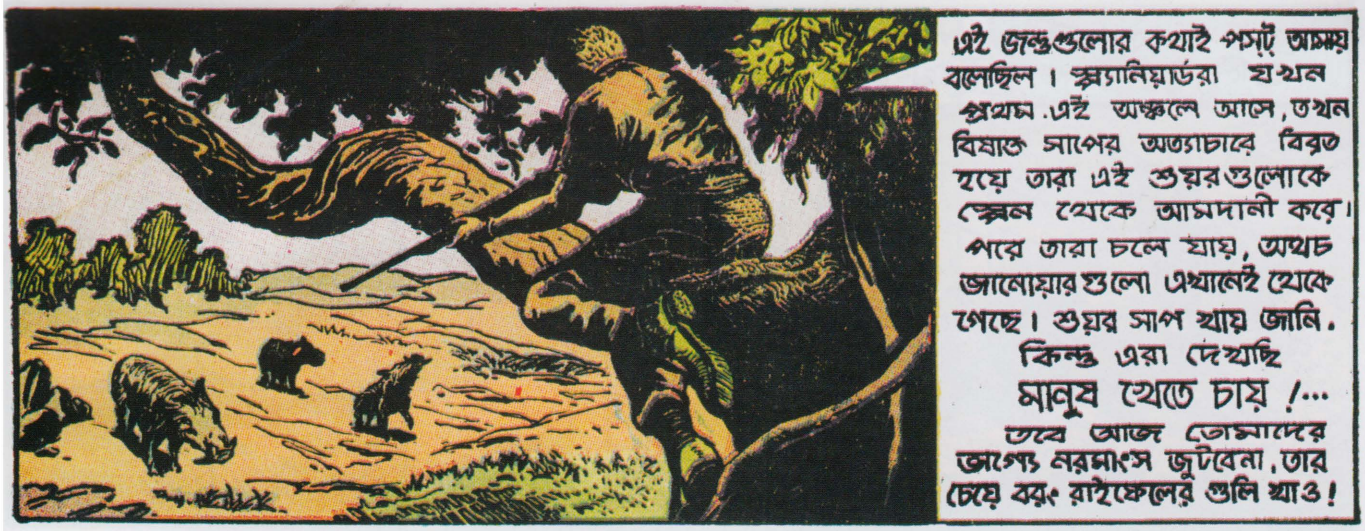
এই জন্তুগুলোর কথাই পসট্ অমায় বলেছিল। স্প্যানিয়ার্ডরা যখন প্রথম এই অঞ্চলে আসে, তখন বিষাক্ত সাপের অত্যাচারে বিব্রত হয়ে তারা এই শুয়রগুলোকে স্পেন থেকে আমদানী করে। পরে তারা চলে যায়, অথচ জানোয়ারগুলো এখানেই থেকে গেছে। শুয়র সাপ খায় জানি. কিন্তু এরা দেখছি মানুষ খেতে চায়!... তবে আজ তোমাদের জন্যে নরমাংস জুটবেনা, তার চেয়ে বরং রাইফেলের গুলি খাও!

ব্লান্টএর হাতের রাইফল্ সশব্দে অগ্নি-বর্ষণ করলে। একটা শুয়র গুলি খেয়ে আর্তনাদ করে উঠল...

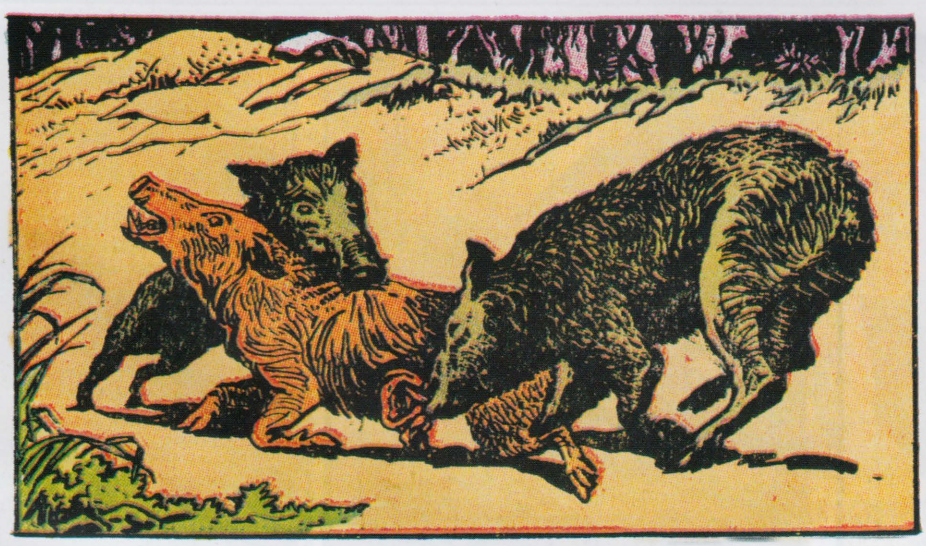

কি ভীষণ হিংস্র জানোয়ার! আহত সঙ্গীকে হত্যা করে মাংস খেতে চায়!...

শয়তানের দ্বীপ

ব্রান্ট লক্ষ্য স্থির করে আবার গুলি ছুঁড়ল -- অব্যর্থ সন্ধান!
দনন! দনন!!
এই দ্বীপে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। নৌকার দিকে ফিরে যাওয়াই ভাল..
দূর থেকে নৌকার দিকে দৃষ্টিপাত করেই ব্রান্ট চমকে উঠল, তার নৌকার উপরে হানা দিয়েছে পাঁচটা শুয়র!..
কি সর্বনাশ! আমার জিনিস পত্র সব ভেঙে তচনচ করে দিয়েছে! দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি...

শয়তানের দ্বীপ

দুনিয়া থেকে চারটে পাপ বিদায় হল.. কিন্তু আমি এখন কি করি? এই দ্বীপেই কি রাত্রিবাস করতে হবে?
বিঁসের শব্দ! মোটর বোট!
ঘট্ - ঘট্ - ঘট্ - ঘট্
দূর সমুদ্রের বুকে হঠাৎ দেখা দিল একটা মোটর বোট...
এদিকে! এই! এদিকে দ্যাখো! .. মোটরবোট থামল, ওরা আমায় দেখতে পেয়েছে..
পিছন থেকে
হুঙ্কার
রাইফলটা কোথায় ছিটকে পড়েছে... আরে! শুয়রটা নীচে নেমে আসছে...
শূকরের দাঁতের আঘাতে একটা পা জখম হয়েছে, উপর থেকে গড়িয়ে পড়ে জামা ছিন্নভিন্ন, দেহ ক্ষতবিক্ষত, — কিন্তু চিন্তার সময় নেই, মৃত্যু তাকে অনুসরণ করছে, ব্রান্ট উঠে বসল...
রাইফলে খোঁজার সময় নেই - আজ ছোরা নিয়ে ওই হিংস্র পশুর সঙ্গে লড়তে হবে।
কোমর থেকে ছোরা খুলে ব্রান্ট প্রস্তুত হল...

শয়তানের দ্বীপ

শূন্যে বিদ্যুৎ খেলিয়ে ছুটে এল শিকারীর হাতের ছোরা...
অব্যর্থ সন্ধান !

আহত বরাহ মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। ব্রান্ট সেই দৃশ্য দেখার জন্য অপেক্ষা করল না — তার কানে মোটর-বোটের শব্দ এসেছে...

ঘট · ঘট · ঘট · ঘট !....
লোকটা অজ্ঞান হয়ে গেছে। পল ! তুমি বোট নিয়ে অপেক্ষা করো - লোকটাকে আমি তুলে আনছি।
মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ব্রান্ট নিজের আঘাতের যন্ত্রণা ভুলে গিয়েছিল. কিন্তু আর সে সহ্য করতে পারল না— তার ক্ষতবিক্ষত অবসন্ন দেহ সমুদ্রের তীরে লুটিয়ে পড়ল...

কিছুক্ষণ পরে ব্রান্ট-এর জ্ঞান হল..
আমি কোথায় আছি ? তুমি কে ?
আমার নাম পল সান্ডার্স। তুমি এখন মোটর -বোটের ভিতরে...

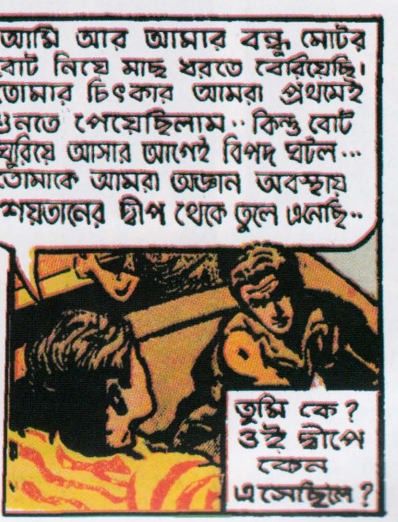
আমি আর আমার বন্ধু মোটর বোট নিয়ে মাছ ধরতে বেরিয়েছি। তোমার চিৎকার আমরা প্রথমেই শুনতে পেয়েছিলাম.. কিন্তু বোট ঘুরিয়ে আসার আগেই বিপদ ঘটল... তোমাকে আমরা অজ্ঞান অবস্থায় শয়তানের দ্বীপ থেকে তুলে এনেছি..
তুমি কে ? ওই দ্বীপে কেন এসেছিলে ?

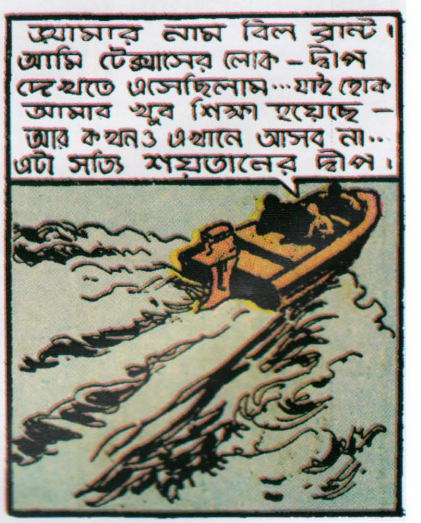
আমার নাম বিল ব্রান্ট। আমি টেক্সাসের লোক – দ্বীপ দেখতে এসেছিলাম...যাই হোক আমার খুব শিক্ষা হয়েছে — আর কখনও এখানে আসব না.. এটা সত্যি শয়তানের দ্বীপ।

রক্তাক্ত মানচিত্র

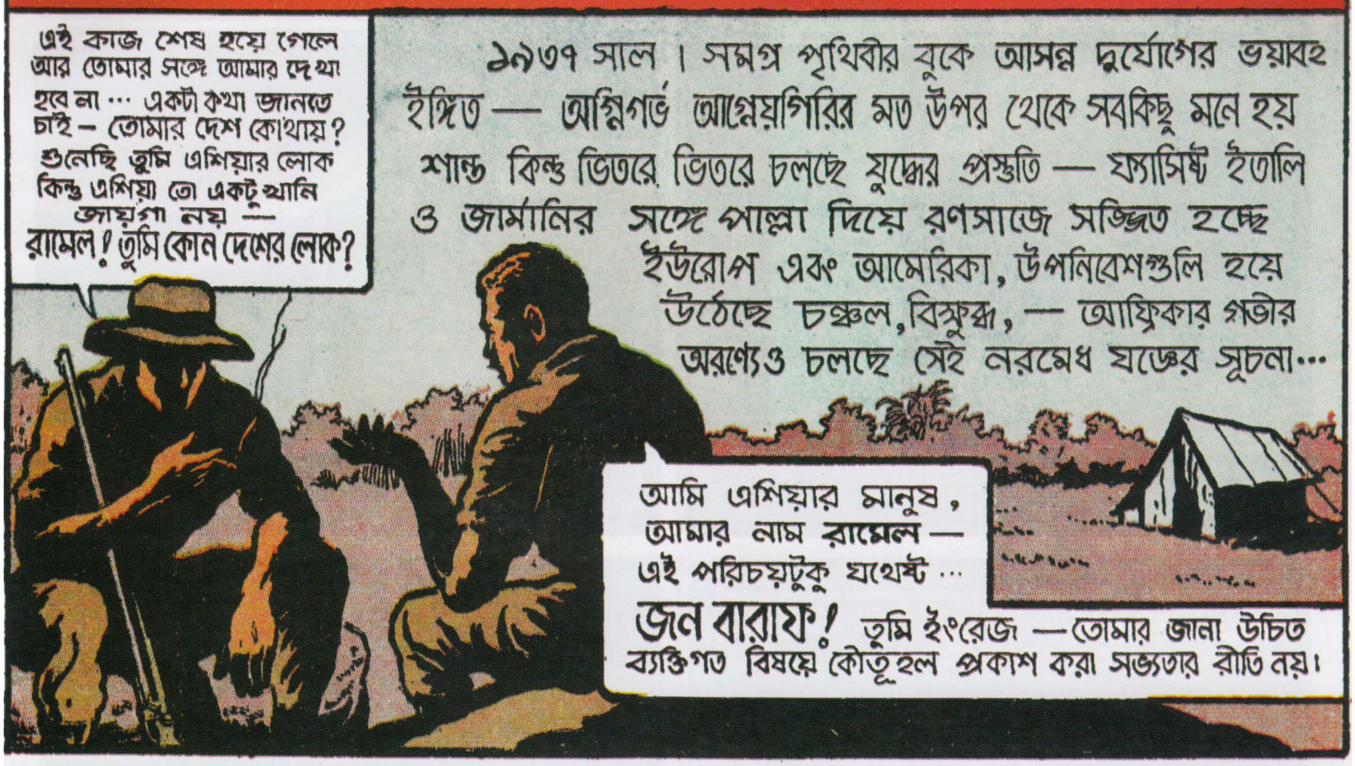
এই কাজ শেষ হয়ে গেলে আর তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না ... একটা কথা জানতে চাই – তোমার দেশ কোথায়? শুনেছি তুমি এশিয়ার লোক কিন্তু এশিয়া তো একটুখানি জায়গা নয় — রামেল! তুমি কোন দেশের লোক?
১৯৩৭ সাল। সমগ্র পৃথিবীর বুকে আসন্ন দুর্যোগের ভয়াবহ ইঙ্গিত — অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরির মত উপর থেকে সবকিছু মনে হয় শান্ত কিন্তু ভিতরে ভিতরে চলছে যুদ্ধের প্রস্তুতি — ফ্যাসিষ্ট ইতালি ও জার্মানির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রণসাজে সজ্জিত হচ্ছে ইউরোপ এবং আমেরিকা, উপনিবেশগুলি হয়ে উঠেছে চঞ্চল, বিক্ষুব্ধ, — আফ্রিকার গভীর অরণ্যেও চলছে সেই নরমেধ যজ্ঞের সূচনা...
আমি এশিয়ার মানুষ, আমার নাম রামেল — এই পরিচয়টুকু যথেষ্ট ...
জন বারাফ! তুমি ইংরেজ — তোমার জানা উচিত ব্যক্তিগত বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করা সভ্যতার রীতি নয়।

জঙ্গলের চতুষ্পদ বাসিন্দারা রাজনীতির খবর রাখে না, — তাই
ইতালিয়ান সোমালিল্যান্ডের সীমানায় বৃটিশ-অধিষ্ঠিত অঞ্চলে যে মস্তবড় সিংহটা ঘাড়ের উপর কেশর দুলিয়ে ঘুরে বেড়ায় সে জানতেও পারলনা যে একটু দূরেই খাঁচার ভিতর বন্দী হয়ে যে ছাগলটা আর্তস্বরে চিৎকার করে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সেই হচ্ছে পশুরাজের ভবিতব্য, তারই উপর নির্ভর করছে দু'টি রণ-উন্মুখ জাতির ভাগ্য — ক্ষুধার্ত সিংহ এগিয়ে এল .....
ব্যা-ব্যা-ব্যা-ব্যা!.....

রক্তাক্ত মানচিত্র

রাগ - রাগ - রাগ - রাগ - রাগ...
সিংহ এগিয়ে এল— কাছে, কাছে আরও কাছে..

ওকি! সিংহের গর্জন!
হুঁ, ফাঁদে সিংহ পড়েছে! চলো!
হ.ল.ল.ল!...
ক্ষুধার্ত সিংহ খাঁচার ভিতর ঢুকে ছাগলটাকে আক্রমণ করলে— সঙ্গে সঙ্গে খাঁচার দরজা বন্ধ হয়ে গেল...

সর্বনাশ! সিংহটা খাঁচার কাঠ ভেঙ্গে ফেলেছে! বারাফ! ও এখনই বেরিয়ে পড়বে!
হুন্‌ন্‌!

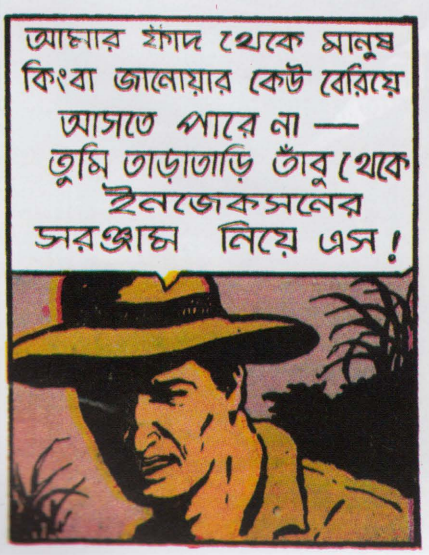
আমার ফাঁদ থেকে মানুষ কিংবা জানোয়ার কেউ বেরিয়ে আসতে পারে না — তুমি তাড়াতাড়ি তাঁবু থেকে ইনজেকসনের সরঞ্জাম নিয়ে এস!

রাইফেল এবং টুপি মাটিতে রেখে বারাফ হঠাৎ সিংহের একটা থাবা চেপে ধরলে!
রামেল! তাড়াতাড়ি যাও— আমি জন্তুটাকে ধরে রাখছি...

রক্তাক্ত মানচিত্র

কী অমানুষিক
ক্রূরতা !

ইনজেকসন এনেছি !
তাড়াতাড়ি করো, রামেল !—
আমি আর রাখতে পারছি না !

রামেল সিংহের থাবায় মরফিয়া
ইনজেকসন করলে...

প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে..
ঘুমিয়ে পড়েছে !
হ্যাঁ। এইবার আসল কাজ...

কোমর থেকে বেল্ট খুলে
বারাফ খাঁচার মধ্যে প্রবেশ
করলে...

ছাগলটাকে ঘাড় ভেঙে মেরেছে !
এখন যদি সিংহের জ্ঞান ফিরে
আসে তাহলে আমার অবস্থাও
ছাগলের মতই হবে...
বারাফ তাড়াতাড়ি
সিংহের গলায়
বেল্ট আটকে দিল...

রক্তাক্ত মানচিত্র

কত সহজে কাজ হয়ে গেল, বলো তো ? এই বেল্টটাকে আমি এই কাজের জন্যই তৈরী করেছিলাম — এটা বেল্টও বটে আবার বগলসও বটে…
সিংহের গলায় বগলস আটকে দিয়ে বারাফ, খাঁচার বাইরে এসে দরজা বন্ধ করলে। তারপর দু'জন তাঁবুর দিকে চলল…

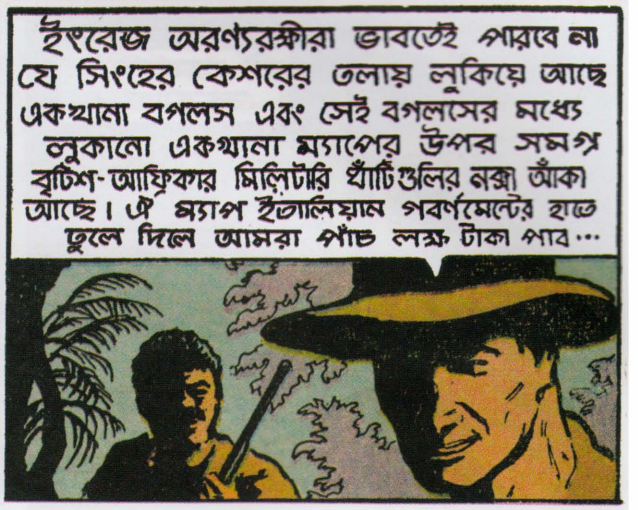
ইংরেজ অরণ্যরক্ষীরা ভাবতেই পারবে না যে সিংহের কেশরের তলায় লুকিয়ে আছে একখানা বগলস এবং সেই বগলসের মধ্যে লুকানো একখানা ম্যাপের উপর সমগ্র বৃটিশ-আফ্রিকার মিলিটারি ঘাঁটিগুলির নক্সা আঁকা আছে। ঐ ম্যাপ ইতালিয়ান গবর্ণমেন্টের হাতে তুলে দিলে আমরা পাঁচ লক্ষ টাকা পাব…

কি হে রামেল ! চুপ করে রইলে কেন ? কাজ তো অনেকটা এগিয়ে গেল। কাল সকালে গ্রাম থেকে কিছু লোক জোগাড় করে খাঁচা-সমেত পশুরাজকে সীমানার বাইরে নিয়ে যাব। সেটা এমন কিছু কঠিন কাজ নয় — তুমি এত ভাবছ কেন?
এসব তো জানি, আমি ভাবছি অন্য কথা

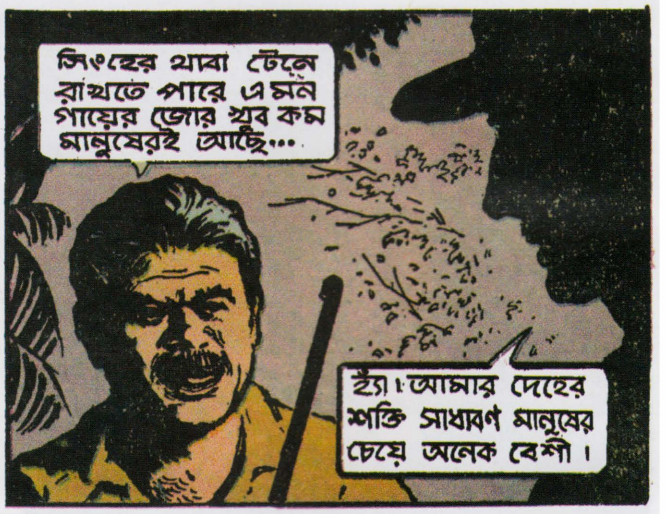
সিংহের থাবা টেনে রাখতে পারে এমন গায়ের জোর খুব কম মানুষেরই আছে…
হ্যাঁ। আমার দেহের শক্তি সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশী।

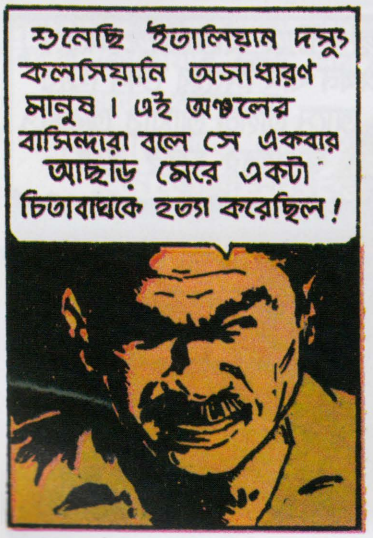
শুনেছি ইতালিয়ান দস্যু কলসিয়ানি অসাধারণ মানুষ। এই অঞ্চলের বাসিন্দারা বলে সে একবার আছাড় মেরে একটা চিতাবাঘকে হত্যা করেছিল!

রামেল, তুমি কি বলতে চাও ? হঠাৎ তোমার কলসিয়ানির কথা মনে হল কেন ?

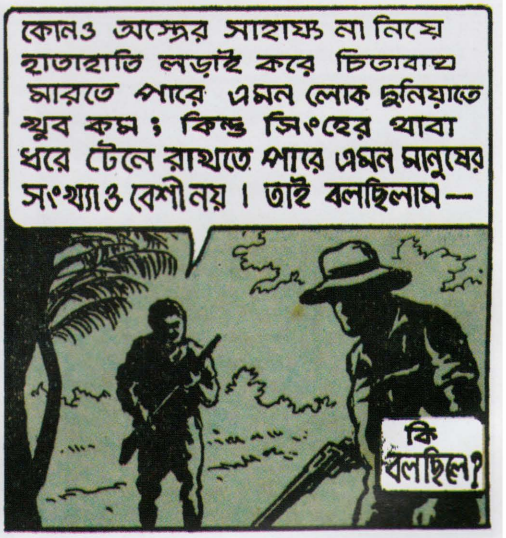
কোনও অস্ত্রের সাহায্য না নিয়ে হাতাহাতি লড়াই করে চিতাবাঘ মারতে পারে এমন লোক দুনিয়াতে খুব কম ; কিন্তু সিংহের থাবা ধরে টেনে রাখতে পারে এমন মানুষের সংখ্যাও বেশী নয়। তাই বলছিলাম —
কি বলছিল?

রক্তাক্ত মানচিত্র

বলছিলাম, দস্যু কলসিয়ানিকে- আমি চিনি না – কিন্তু আমার ইংরেজ বন্ধু জন বারাফ একজন শক্তিশালী মানুষ!
তুমি বলতে চাও আমার নাম জন বারাফ নয়! রামেল!— তুমি বলতে চাও আমি কলসিয়ানি?

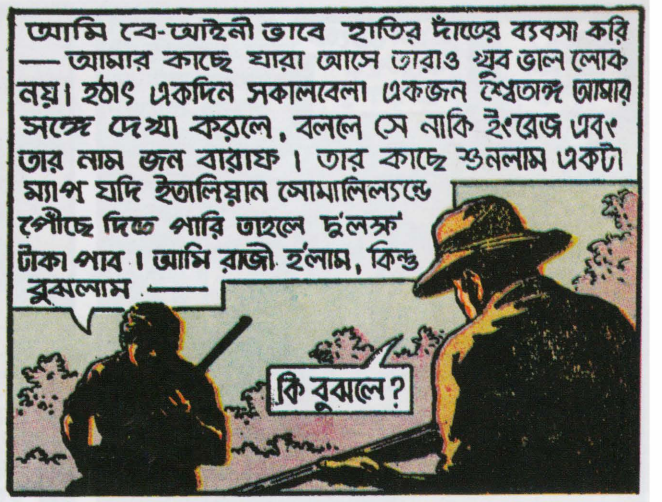
আমি বে-আইনী ভাবে হাতির দাঁতের ব্যবসা করি — আমার কাছে যারা আসে তারাও খুব ভাল লোক নয়। হঠাৎ একদিন সকালবেলা একজন শ্বেতাঙ্গ আমার সঙ্গে দেখা করলে, বললে সে নাকি ইংরেজ এবং তার নাম জন বারাফ। তার কাছে শুনলাম একটা ম্যাপ যদি ইতালিয়ান সোমালিল্যান্ডে পৌঁছে দিতে পারি তাহলে দু'লক্ষ টাকা পাব। আমি রাজী হলাম, কিন্তু বুঝলাম —
কি বুঝলে?

যে লোক বুনো জন্তুর দেহের সঙ্গে ম্যাপ লুকিয়ে রাখার ফন্দী আঁটতে পারে সে আমার চেয়েও ধড়িবাজ লোক। তার উপর তোমার শারীরিক শক্তির যা পরিচয় পেলাম তাতে বুঝলাম দেহে এবং মনে এমন সাক্ষাৎ শয়তান কখনও জন বারাফ নামধারী ইংরেজ হতে পারে না, সে নিশ্চয় ইতালিয়ান দস্যু কল—

বারাফ!
রামেল!

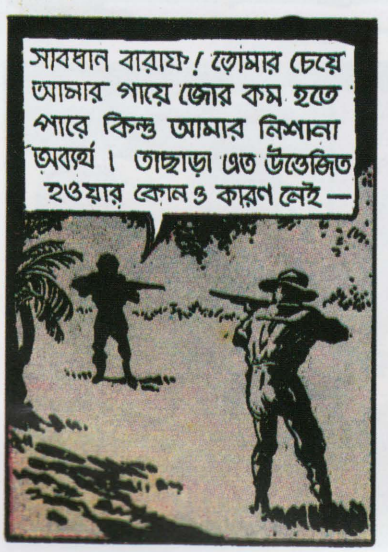
সাবধান বারাফ! তোমার চেয়ে আমার গায়ে জোর কম হতে পারে কিন্তু আমার নিশানা অব্যর্থ। তাছাড়া এত উত্তেজিত হওয়ার কোনও কারণ নেই —

তোমাকে বুঝিয়ে দিলাম যে দুনিয়াতে কলসিয়ানি একমাত্র বুদ্ধিমান লোক নয়... তোমার নাম বারাফ না হয়ে যদি কলসিয়ানি হয় তাতে আমার কি? আমি টাকা পেলেই খুশী।

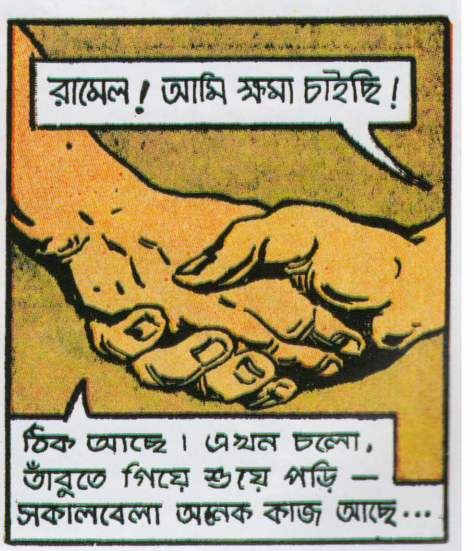
রামেল! আমি ক্ষমা চাইছি!
ঠিক আছে। এখন চলো, তাঁবুতে গিয়ে শুয়ে পড়ি — সকালবেলা অনেক কাজ আছে...

রক্তাক্ত মানচিত্র

আরে! একি কান্ড!
খাঁচা ভেঙ্গে পালিয়ে গেল!
পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই দুই স্যাঙ্গাৎ ছুটে এল খাঁচার কাছে..

যে পরিমাণ মরফিয়া ওকে ইনজেকসন দিয়েছিলাম তাতে আরও পাঁচ ঘন্টা জন্তুটার অজ্ঞান হয়ে থাকা উচিত...

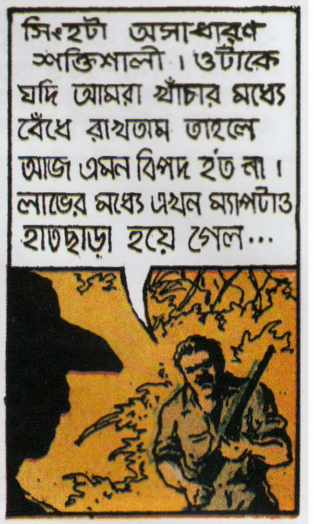
সিংহটা অসাধারণ শক্তিশালী। ওটাকে যদি আমরা খাঁচার মধ্যে বেঁধে রাখতাম তাহলে আজ এমন বিপদ হ'ত না। লাভের মধ্যে এখন ম্যাপটাও হাতছাড়া হয়ে গেল...

ভৌ-ভৌ! ভৌ-ক-ক...
ডাইডো...
বারাফ হঠাৎ চিৎকার করে উঠল..

বারাফের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দূর তাঁবুর ভিতর থেকে ভেসে এল একটা কুকুরের তীব্র কণ্ঠস্বর...

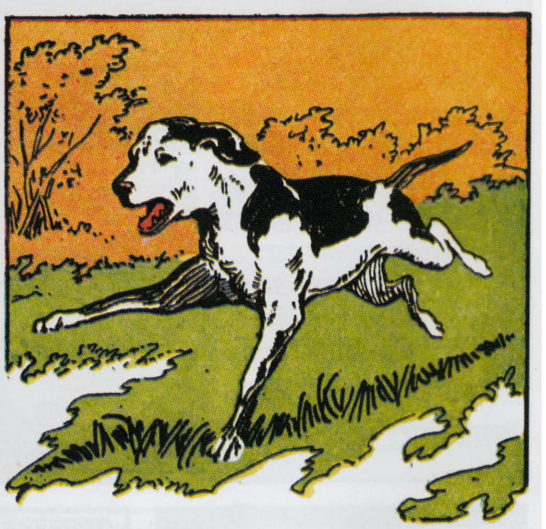

ডাইডো শিক্ষিত হাউন্ড — খাঁচার কাছে এসেই সে সিংহের গন্ধ পেল। মাটিতে নাক রেখে ডাইডো বারংবার ঘ্রাণ গ্রহণ করলে, তারপর বেগে অগ্রসর হ'ল ঘন জঙ্গলের দিকে..

রক্তাক্ত মানচিত্র

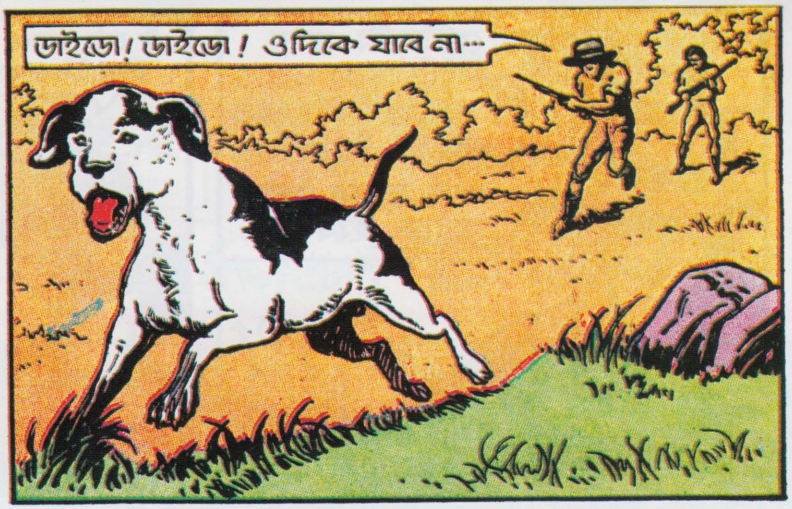
ডাইডো! ডাইডো! ওদিকে যাবে না...

ঝোপের আড়াল থেকে সিংহ আত্মপ্রকাশ করলে...

ধারাল নখের আঘাতে ডাইডোর প্রাণহীন দেহ মাটির উপর গড়িয়ে পড়ল, পরক্ষণেই গর্জে উঠল বারাফের রাইফেল...

আহত সিংহ মাটিতে পড়ে স্থির হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল মাটিতে ফেলে রামেল ছুটে এসে সিংহের কেশরের তলায় লুকানো বগলসটা খুলে ফেলল...

এই তো ম্যাপ!

আবার অগ্নিবৃষ্টি করলে বারাফের রাইফেল!
উঃ!

রক্তাক্ত মানচিত্র

রামেল বুঝেছিল যে আমি দস্যু কলসিয়ানি — তাই তাকে মরতে হ'ল। আমার দলের লোক ছাড়া কেউ যদি আমায় চিনতে পারে তাহলে তাকে মরতে হবে...

এই তো ম্যাপ। এবার অন্য কায়দায় ম্যাপটাকে ইতালিয়ান সীমানায় পাচার করতে হবে। কলসিয়ানি যে পথে একবার ঠোক্কর খায় সে পথে দ্বিতীয়বার হাঁটে না — পাঁচ লক্ষ টাকা আমি একা ভোগ করব, কাউকে ভাগ দেব না...

অকস্মাৎ কলসিয়ানির শ্রবণেন্দ্রিয়ে আঘাত করলে এক রুদ্ধ গর্জনধ্বনি — সে সচমকে দেখল পশুরাজ ধরাশয্যা ত্যাগ করে উঠে বসেছে — সে বুঝল সিংহ ভীষণভাবে আহত হয়ে জ্ঞান হারিয়েছিল, কিন্তু মরে নি...

কলসিয়ানি গুলি ছোড়ার সময় পেল না — সিংহ বিদ্যুৎবেগে আক্রমণ করলে!

একহাতে রাইফেল ধরে কলসিয়ানি গুলি ছুড়ল...

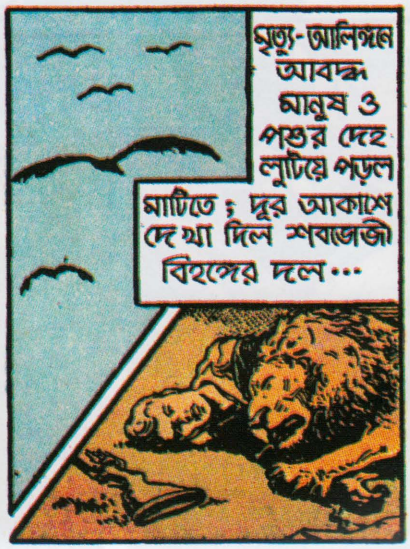
মৃত্যু-আলিঙ্গনে আবদ্ধ মানুষ ও পশুর দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে; দূর আকাশে দেখা দিল শবভোজী বিহঙ্গের দল...

মানুষের লোভের সাক্ষী হয়ে রক্তমাখা অবস্থায় পড়ে রইল সেই মহামূল্য মানচিত্র — মাটির বুকে চঞ্চল ছায়া মেলে উড়ে এল ক্ষুধার্ত গৃধিনী...

বেতালের শেষ

আফ্রিকার জঙ্গল।
নান্দী শিকারী ম'ভু শিকারে বেরিয়েছে। হঠাৎ সে চমকে উঠল — জঙ্গলের মধ্যে ও কিসের শব্দ?.....

ওর মা কোথায় গেল? বাচ্চাটা আবার হায়নার মুখে পড়লে কে বাঁচাবে ? ....না কি ওকে সঙ্গে নিয়ে যাব? একা ছেড়ে দিলে মারা পড়বে....
সর্বনাশ!
ম'ভু যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল
পর্‌র্‌র্‌র্‌...
বাঘিনী বুঝেছে আমি ওর বাচ্চাকে বাঁচিয়েছি!...
হায়নার মাংস তো খাওয়া যাবে না, অন্য কোনও শিকার দেখতে হবে...
ম'ভু জানতে পারে না, সাক্ষাৎ মৃত্যু তার জন্য অপেক্ষা করছে....
হিস্‌স্‌

শাসস্ ফোঁঃ!...
অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে ম'ভুর হাতের বর্শা ছিট্‌কে পড়ল, কোমরের ছুরি কোমরেই রইল— শুরু হল 'নান্দী' ও 'পাইথনের' লড়াই!
বনের বাতাস যুদ্ধের খবর এনে দিল বাঘিনীর কানে ...
শব্দ লক্ষ্য করে ছুটল সে..
হুর্-হুর্
হিসস্!
মনহাঃ!
পাইথন ম'ভুকে ছেড়ে এবার বাঘিনীকে আক্রমণ করল। সাপের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে ম'ভু একটু দূরে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়ল....
আরে... বাচ্চাটা আমার পা চাটছে -ও কী...
ম'ভু বিস্মিত চক্ষে দেখল রক্তধারার মধ্যে নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃতদেহ....
আমাকে বাঁচাতে গিয়ে বাঘিনী মারা গেল...
ওকে এই জঙ্গলে ছেড়ে দিলে হায়নায় খাবে। চল্ বাচ্চা, তুই আমার সঙ্গেই চল্...

শেষ

ফাঁদ

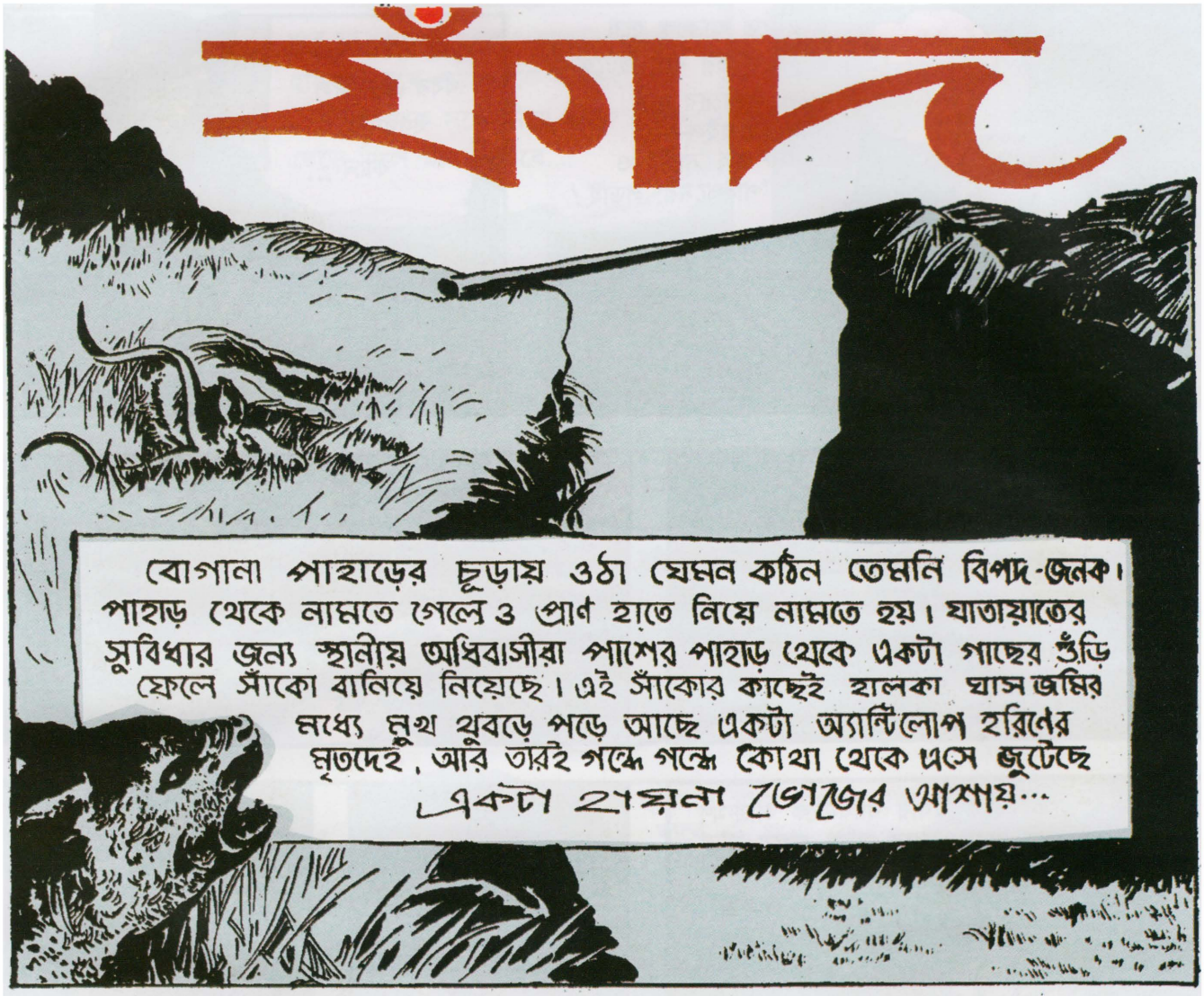
বোগানা পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা যেমন কঠিন তেমনি বিপদ-জনক। পাহাড় থেকে নামতে গেলেও প্রাণ হাতে নিয়ে নামতে হয়। যাতায়াতের সুবিধার জন্য স্থানীয় অধিবাসীরা পাশের পাহাড় থেকে একটা গাছের গুঁড়ি ফেলে সাঁকো বানিয়ে নিয়েছে। এই সাঁকোর কাছেই হালকা ঘাস জমির মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একটা অ্যান্টিলোপ হরিণের মৃতদেহ, আর তারই গন্ধে গন্ধে কোথা থেকে এসে জুটেছে একটা হায়না ভোজের আশায়...

হঠাৎ চমকে উঠল হায়না!

অক্ক!
তার নাকে এসে ধাক্কা মেরেছে একটা পরিচিত গন্ধ...

ফাঁদ

দূরের কালো পাথরটার আড়াল থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে একটা মস্ত চিতাবাঘ!
হরিণ-মাংসের চেয়ে প্রাণের দাম অনেক বেশী — হায়না তীরবেগে ছুটল!...
জ্বলন্ত চোখ মেলে চিতাবাঘ চারদিক দেখেল তারপর এসে দাঁড়াল মরা হরিণটার কাছে...
হরিণের দেহে দাঁত বসিয়ে দিল ক্ষুধার্ত চিতা...
হঠাৎ ভীষণ গর্জন করে উঠল চিতা!
অ-র-র-র!
তার সামনের একটা থাবা মাটির সঙ্গে আটকে গেছে!
বাওয়ানা! মস্ত বড় চিতাবাঘ!
আমি জানতাম ওকে ধরা পড়তেই হবে। কাল ওর পায়ের ছাপ দেখে বুঝলাম জন্তুটা এই পথে রোজ যাতায়াত করে। তাই হরিণটাকে মেরে ওর পথে ফেলে রাখলাম — জানি চিতা আসবেই। মাঝখানে হায়নাটাই গোলমালে বাধিয়েছিল। ফাঁদে হায়না পড়লে আর চিতাটাকে ধরা যেত না...
আমি স্যান্ডি হান্টার — এই অঞ্চলে আমায় কে না চেনে? আজ বিশ বছর হল জানোয়ার ধরে বিক্রী করছি, কিন্তু এতবড় চিতা কখনও চোখে পড়ে নি...তুমি কি বল লোতাংগা?
বাওয়ানা স্যান্ডি! আমিও এত বড় চিতা কখনও দেখি নি।
সাঁকোর ওপারে এসে দাঁড়িয়েছে দুটি মানুষ!

ময়ূখ চৌধুরী

ফাঁদ

বাওয়ানা! দেখো! দেখো! ফাঁদটাকে প্রায় তুলে ফেলেছে!
নাতাংগা! তাড়াতাড়ি ওপারে চলো...
ঝ-ঝ-ঝ-ঝ!
ওরকম টানাটানি করলে ফাঁদ ভাঙবে না, তবে ওর ঠ্যাং ভাঙতে পারে – ফোঁড়া জন্তুর দাম অনেক কম। নাতাংগা! তাড়াতাড়ি চলো – ওটাকে বাঁধতে হবে...
বাওয়ানা — ওর মুখ না বাঁধলে সাপলের থাবা বাঁধতে পারবে না...
ফাঁদে বন্দী চিতা নড়তে পারল না — স্যান্ডি জন্তুটার মুখ চামড়ার ফিতে দিয়ে বেঁধে ফেলল...
এইবার ঠ্যাংগুলো বাঁধতে পারলেই হয়!...
বাওয়ানা!
বাওয়ানা! দেখো! বুনো কুকুরের দলে!...
স্যান্ডি
বন্দুক হাতে প্রস্তুত হল...

ফাঁদ

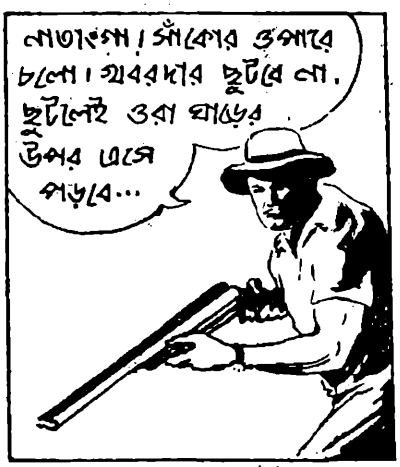

একটা কুকুর মুখ তুলে চিৎকার করে উঠল. সঙ্গে সঙ্গে কর্কশ কণ্ঠে সাড়া এল পাহাড়ের তলা থেকে, — নাতাংগার অনুমান মিথ্যা নয়!

ফাঁদ

কুকুরের দলে এবার চিতার দিকে এগিয়ে আসে...

গাছের গুঁড়িটাকে খাদের ভিতর ফেলে দাও নাতাংগা!
বাওয়ানা! আমি বলছি ওরা এদিকে আসবে না। সাঁকোটা ফেলে দিলে পাহাড় থেকে নামতে ভীষণ কষ্ট হবে।

ওর কোরো না — গুঁড়িটাকে খাদের ভিতর ফেলে দাও...

গুঁড়িটা ভীষণ ভারী... ওকি করছ বাওয়ানা? দুটো কুকুর মরলেও ওরা শিকার ছেড়ে পালাবে না।
চুপ করো। ওকে বাঁচাতে পারব না, কিন্তু লড়ে মরবার সুযোগটা করে দেব।

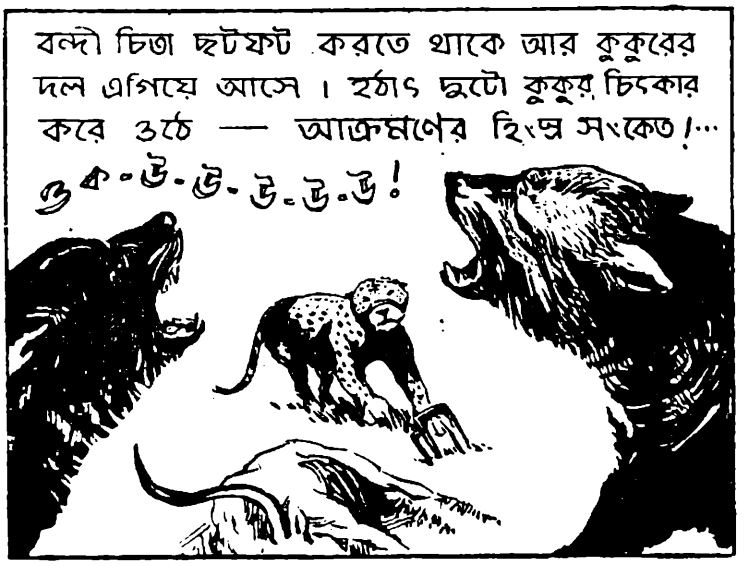
বন্দী চিতা ছটফট করতে থাকে আর কুকুরের দল এগিয়ে আসে। হঠাৎ দুটো কুকুর চিৎকার করে ওঠে — আক্রমণের হিংস্র সংকেত!...
উ-উ-উ-উ-উ-উ!

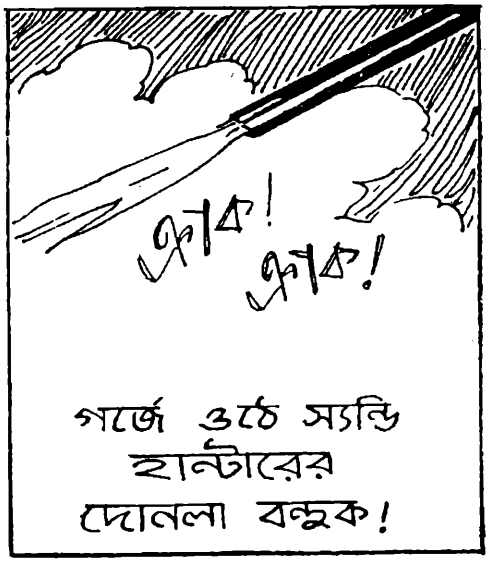
ক্লাক! ক্লাক!
গর্জে ওঠে স্যান্ডি হান্টারের দোনলা বন্দুক!

ফাঁদ

থাবার উপর ফাঁদের লোহার পাতটা সশব্দে ভেঙে যায় — স্যান্ডি হান্টারের লক্ষ্য কখনও ব্যর্থ হয় না…
এক ঝটকায় দুটো কুকুর দুদিকে ছিটকে পড়ে!
ভয়ার্ত চিতা সাঁকো লক্ষ্য করে ছোটে তার পিছনে তাড়া করে রক্তলোলুপ কুকুরের দল…
শাবাশ নাতাংগা!
নাতাংগার হাতের আকর্ষণে গাছের গুঁড়িটা ছিটকে পড়ে অতল গহ্বরে। খাদের মুখে এসে দাঁড়ায় চিতা — পালাবার পথ নেই!

ময়ূখ চৌধুরী

ফাঁদ

কুকুরের দল ঝাঁপিয়ে পড়ে ... থাবার আঘাতে কয়েকটা কুকুর আহত হয়, কিন্তু চিতার আসল অস্ত্রই অকেজো — চামড়ার ফাঁসে আটকানো ধারালো দাঁতগুলি কোনো কাজে লাগে না...

একটা কুকুর হঠাৎ চিতার গলায় দাঁত বসিয়ে দিল...

থাবার এক আঘাতে কুকুরটাকে শুইয়ে দেয় চিতা...
ঘ্যাপ!

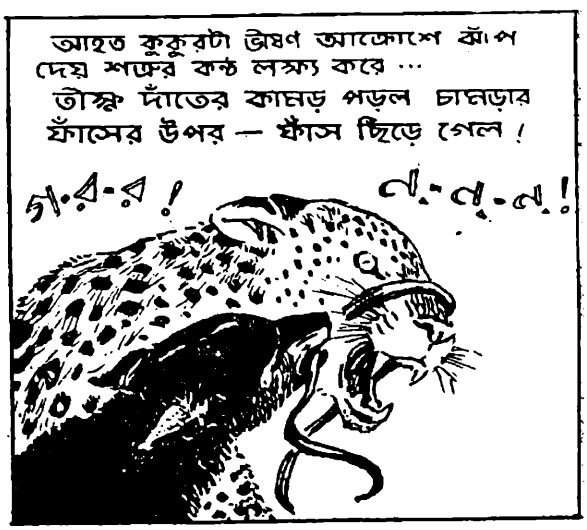
আহত কুকুরটা ভীষণ আক্রোশে ঝাঁপ দেয় শত্রুর কণ্ঠ লক্ষ্য করে ...
তীক্ষ্ণ দাঁতের কামড় পড়ল চামড়ার ফাঁসের উপর — ফাঁস ছিঁড়ে গেল!
গ-র-র!
ঘ-ঘ-ঘ!

রুদ্ধ স্বরে আর্তনাদ করেই থেমে গেল কুকুরটা — চিতার ধারালো দাঁতের এক কামড়েই তার ঘাড় ভেঙে গেছে!

রক্তরাঙা মুখের ভিতর থেকে দেখা দিল দুপাটি নিষ্ঠুর দাঁতের সারি!

ফাঁদ

কুকুরের দল সভয়ে দেখল শত্রু আর অসহায় নয়। থাবার ধারালো নখের সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করেছে দুপাটি নিষ্ঠুর দাঁতের সারি — এ শত্রু ভয়ে পালায় না, হিংস্র আক্রোশে আঘাত করতে চায়!...
দেখো বাওয়ানা! ওরা পালিয়ে যাচ্ছে!
হ্যাঁ নাতাংগা! ধারালো দাঁত আর নখের আদর কুকুরের দল সহ্য করতে পারল না!
রক্তাক্ত দেহে একটা হাঁকানি দিয়ে চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল চিতা_আর সঙ্গে সঙ্গে সাঁকোর ওপারে মানুষ দুটির উপর তার চোখ পড়ল...
হ-ম-ম-ন্-ন্
একটা গর্জন করে ফিরে দাঁড়াল চিতাবাঘ, তারপর বিদ্যুৎবেগে পাহাড়ের বাঁক ঘুরে নীচের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল...
বাওয়ানা! ও আর এই পথে আসবে না।
না আসুক! আমি ওকে ধরতে চাই না। যে জানোয়ার এমন ভাবে লড়াই করতে জানে তার স্বাধীনতার অধিকার আছে। চলো নাতাংগা — তাঁবুর দিকে ফেরা যাক।

মরোগো

ময়ূখ চৌধুরী

অরণ্য; আফ্রিকা।
ঝোপ-জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে ঘাসে-ঢাকা বিশাল প্রান্তরভূমি। সেই প্রান্তরের বুকে ঘাস খেতে খেতে ঘুরে বেড়ায় জেব্রার দল। বনের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে এগিয়ে আসে মাংসলোলুপ লেপার্ড...
ঘন ঝোপের অস্তিত্ব জেব্রাদের দলপতি পেক্কার চোখে ধরা পড়ে না; বিপরীত-মুখী বাতাস শত্রুর সংবাদ পৌঁছে দিতে পারে না তার নাসিকায়। তবু ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে সতর্ক করে দেয়। উৎকর্ণ হয়ে মুখ তুলে দাঁড়ায় পেক্কা...

মবোগো

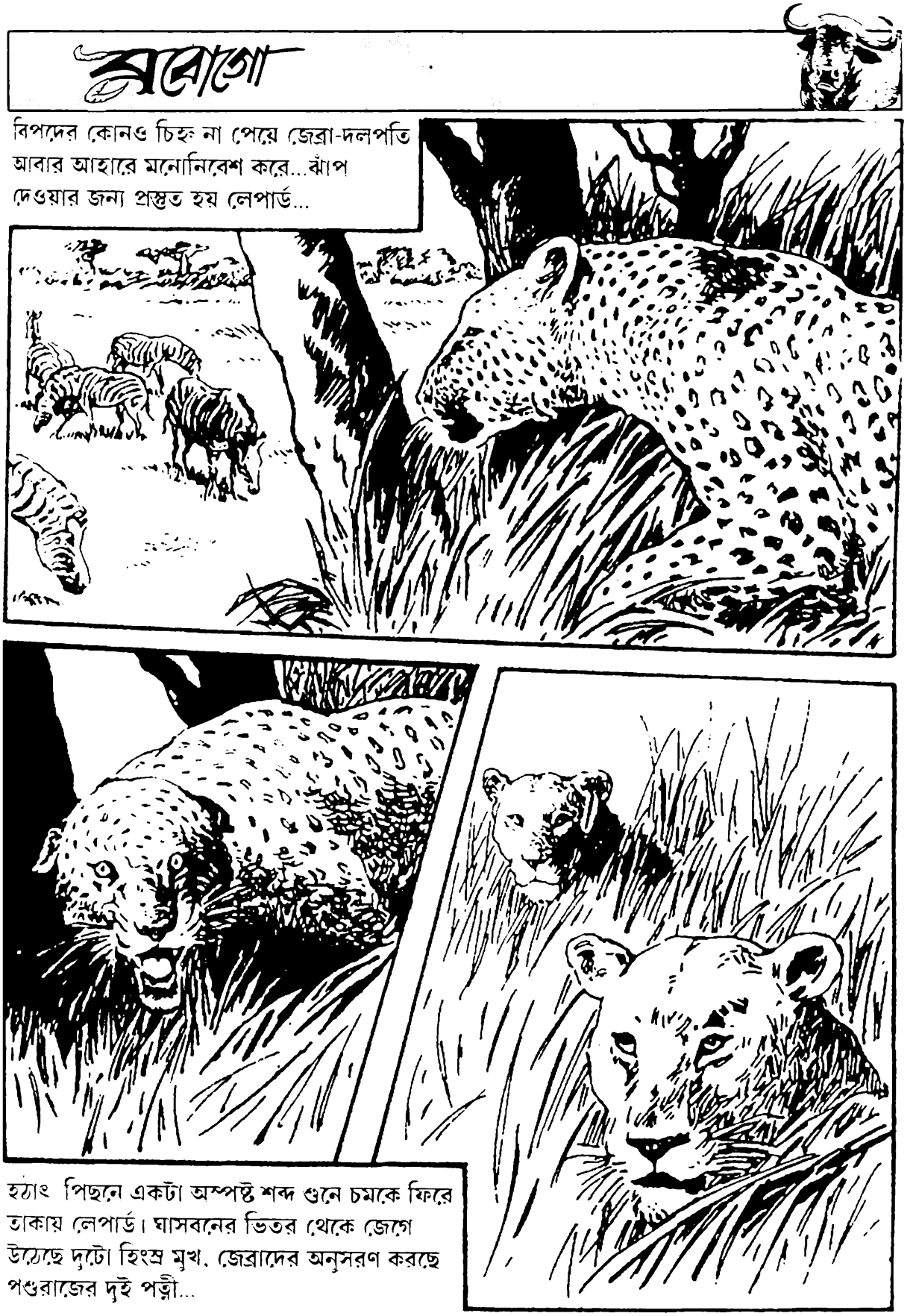
বিপদের কোনও চিহ্ন না পেয়ে জেব্রা-দলপতি আবার আহারে মনোনিবেশ করে...ঝাঁপ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয় লেপার্ড...
হঠাৎ পিছনে একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনে চমকে ফিরে তাকায় লেপার্ড। ঘাসবনের ভিতর থেকে জেগে উঠেছে দুটো হিংস্র মুখ, জেব্রাদের অনুসরণ করছে পশুরাজের দুই পত্নী...

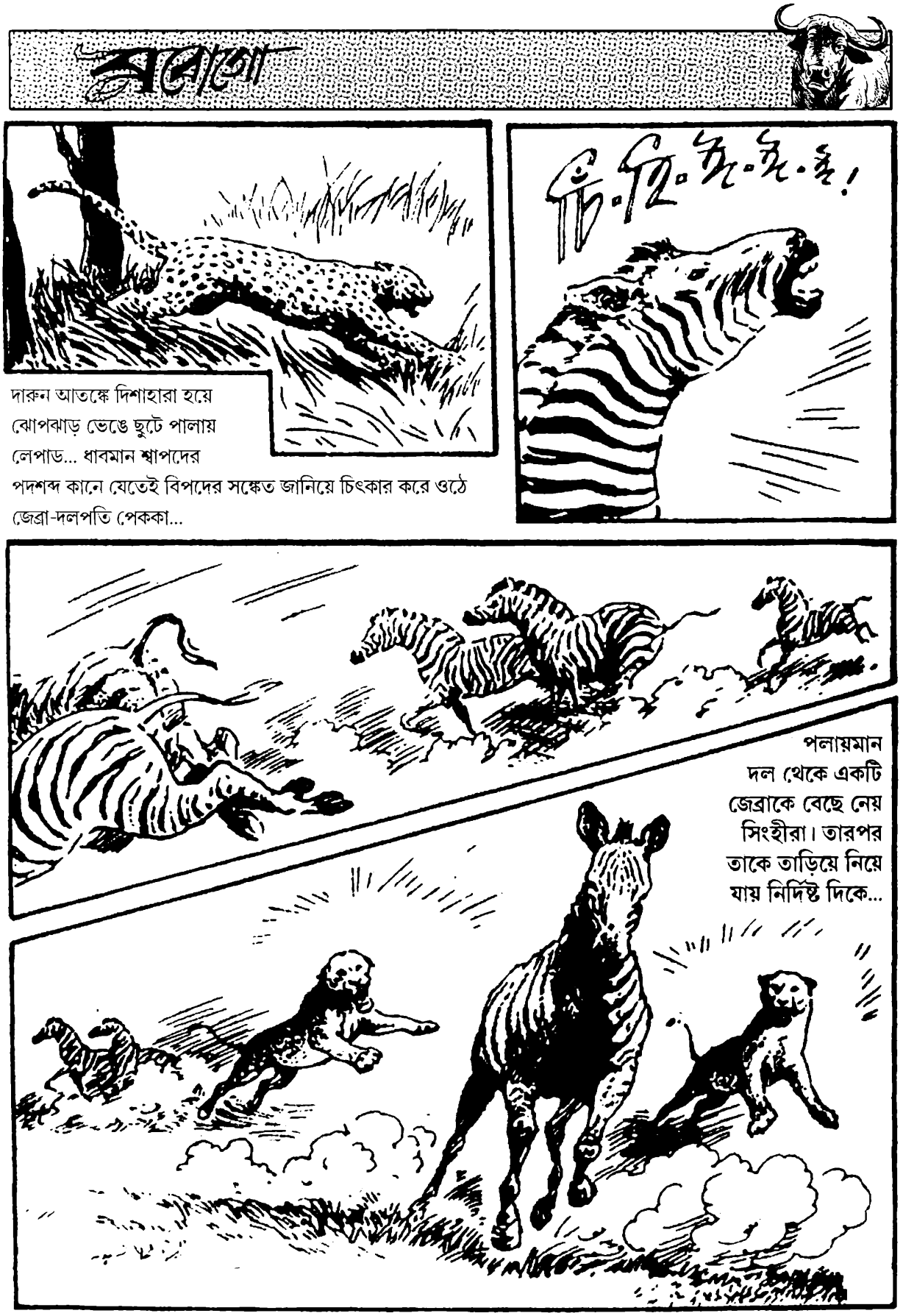
বরোগো
দারুন আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে পালায় লেপাড... ধাবমান শ্বাপদের পদশব্দ কানে যেতেই বিপদের সঙ্কেত জানিয়ে চিৎকার করে ওঠে জেব্রা-দলপতি পেককা...
পলায়মান দল থেকে একটি জেব্রাকে বেছে নেয় সিংহীরা। তারপর তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় নির্দিষ্ট দিকে...

মবোগো

দুদিক থেকে তাড়া পেয়ে ছুটে আসে জেব্রাটা অদূরবর্তী ঝোপের দিকে। সেখানে অপেক্ষা করছে মূর্তিমান মৃত্যু—পশুরাজ সিম্বা!

আহ্-উননন্!
অকস্মাৎ বজ্রপাত!...
হিঁ হিঁ হিঁ!

শিকারির গর্জন আর শিকারের আর্তনাদ ভেসে যায় দূর হতে দূরান্তরে...ঘাসঝোপের ভিতর থেকে মাথা তুলে দাঁড়ায় এক বিশাল দানব—
মবোগো!...

মবোগো

ব্য-অ-অ-অ-অ!...
আহ্-উ-ন্-ন্-ন্!...
তিনদিন আগেকার কথা...দল নিয়ে মাঠে চরে বেড়াচ্ছে দলপতি মবোগো। হঠাৎ দূর থেকে ভেসে এল মহিষের আর্তনাদ ও সিংহের গর্জন...!

অন্যমনস্ক হয়ে দল থেকে দূরে এসে পড়েছিল একটি মহিষ, সুযোগ বুঝে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে সিংহ-পরিবার...

আফ্রিকার 'কেফ বাফেলো' সিংহদের ভয় পায় না, ঝড়ের বেগে ছুটে এল মহিষযূথ! সর্বাগ্রে মবোগো...

মবোগো

সিংহদের পিছনে কিছুদূর তাড়া করে থমকে দাঁড়াল মহিষের দল। কিন্তু দলপতি মবোগো ক্ষান্ত হল না। বাতাসে শ্বাপদের গায়ের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে সে অনুসরণ করল...বাতাসে যখন গন্ধ হারিয়ে যায়, মবোগোর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি খুঁজে বার করে পলাতকদের পদচিহ্ন...। হত্যাকারীদের শাস্তি না দিয়ে ক্ষান্ত হবে না মবোগো...!

তিনদিন তিনরাত অনুসরণপর্বের পর একটা ঘাসঝোপের মধ্যে বিশ্রাম গ্রহণ করছিল মবোগো। আচম্বিতে তার কানে এল জেব্রার আর্তস্বর এবং সিংহের গর্জনধ্বনি...

মবোগো

মুক্ত প্রান্তরের উপর দিয়ে সিংহদের সম্মুখীন হওয়া সম্ভব নয়। অতর্কিতে আক্রমণ না করলে একক মহিষের পক্ষে তিনটি পরাক্রান্ত শত্রুকে বিধ্বস্ত করা কঠিন—অতএব অনেক ঘুরে পিছনদিকের ঝোপ ভেদ করে নিঃশব্দে অগ্রসর হয় দলপতি মবোগো...

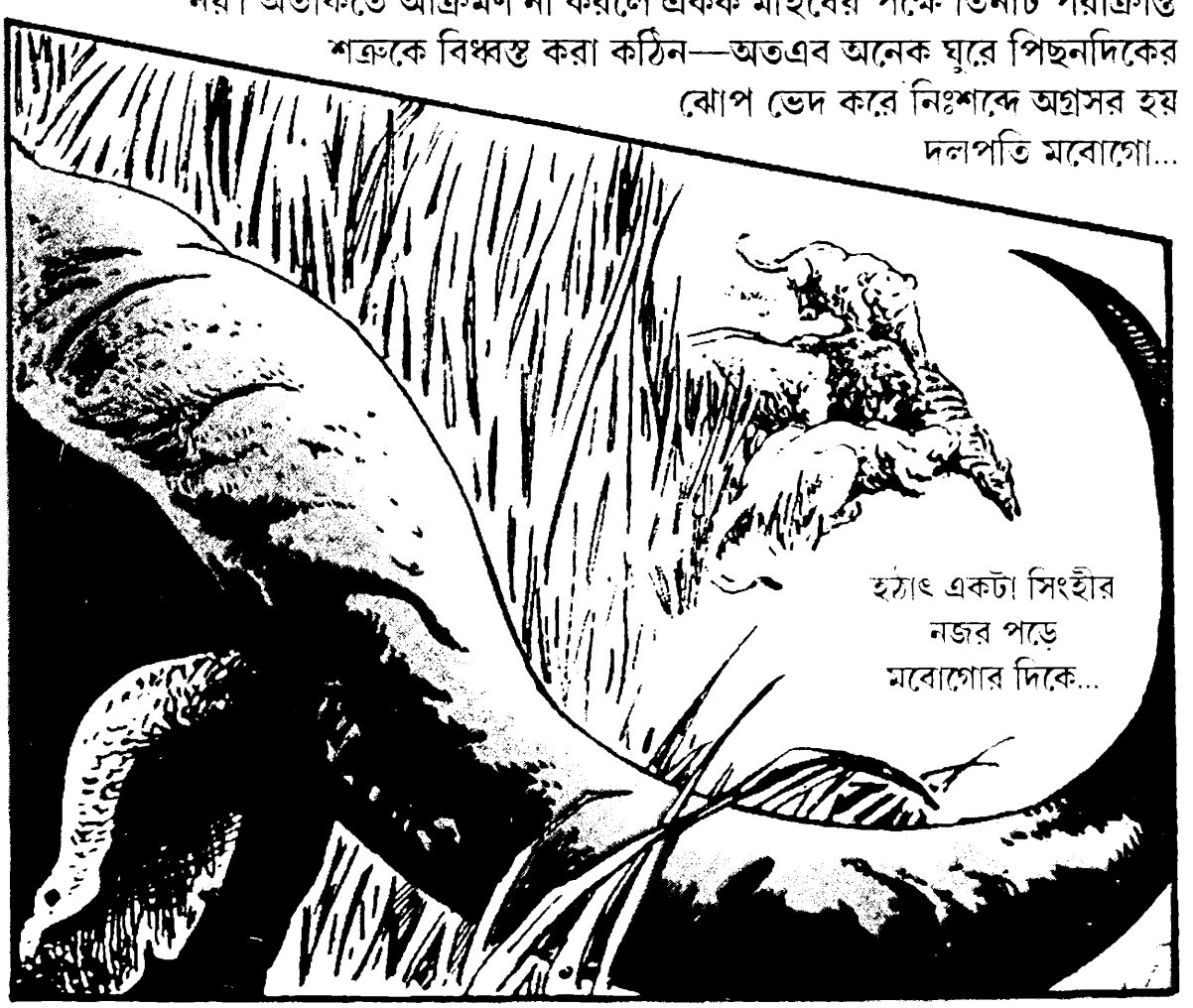

মবোগো

'মবোগো' চিত্র কাহিনিটি গল্প হলেও গল্প নয়! সত্য এখানে আসে নি তথ্যের রূপ ধরে, এসেছে গল্পের ছদ্মবেশে।

জেব্রা

আফ্রিকার একপ্রান্তে বিস্তীর্ণ তৃণ-আচ্ছাদিত প্রান্তরে ছুটোছুটি করে ঘুরে বেড়ায় একদল জেব্রা — ঘন জঙ্গল ও অগভীর ঘাসঝোপের মধ্যে গাছের ছায়ায় তাদের ডোরাকাটা দেহগুলি চমকে ওঠে — আর সেদিকে তাকিয়ে গাছের উপর অপেক্ষারত লেপার্ডের চোখ জ্বলতে থাকে ক্ষুধিত হিংসায়, পশুরাজ সিংহের জিভ থেকে লালা গড়িয়ে পড়ে — কিন্তু জেব্রাদের দলপতি পেক্কা বড় সাবধানী জানোয়ার; — ঘাসঝোপে একটা খস খস শব্দ, বনের বাতাসে ভেসে আসে একটা কটু গন্ধ — ব্যস! চেঁচিয়ে ওঠে পেক্কা আর গোটা দলটা ঝড়ের বেগে ছুটে পালায় শত্রুর নাগালের বাইরে। পিছনের ঝোপ থেকে ভেসে আসে ক্রুদ্ধ গর্জন, কিন্তু জেব্রাদের আর পায় কে!

তবু মাঝে মাঝে বিপদ ঘনিয়ে আসে...

অনেকক্ষণ ধরে দুটো সিংহী জেব্রাদের পিছু নিয়েছে; ওরা বড় বেশি কাছে এসে পড়েছে...

নাঃ, এবার সাবধান না হলে বিপদ ঘটতে পারে — পেক্কা হাঁক দেয়...

পেককা

সংকেত-ধ্বনি শোনার সঙ্গে সঙ্গে ছুট দেয় জেব্রার দল। সিংহী দুটো একবার থমকে দাঁড়ায়, তারপরই বিদ্যুদ্বেগে তাড়া করে ধেয়ে আসে শিকারের পিছনে...

হু-ন-ন-ন!
রর-আফ্ফ!

হুঁ-ঈ-ঈ-ঈ!

হু-ন-ন-ন!...
পিছন থেকে হিংস্র গর্জন ভেসে আসে। পেক্কা জানে সামনের ঘাসঝোপটা পার হলেই তারা নিরাপদ ...

কিন্তু ঝোপের মধ্যে...

বেপরুকা

লুকিয়ে আছে সাক্ষাৎ মৃত্যু
শিকারের অপেক্ষায়...

ররর হুম্‌ম্‌ম্‌ম্‌

হুম্‌ম্‌!
অম্‌ম্‌ম্‌!

পিছন দিকে তাকায় না জেব্রার দল।
'চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা' এই হল
অরণ্যের আইন!

পেক্কা

কিন্তু এত সহজে মরতে রাজী নয় পেক্কা...

এক প্রচণ্ড ঝটকায় ছিটকে পড়ে পশুরাজ!...

দু'দিক থেকে তাড়া করেছে সিংহের দল, পেক্কা ছুট দেয় দূরের ছোট ঝোপটার দিকে...

ঝোপের সামনে গাছটা হঠাৎ ভেঙে পড়ে...
কটাং!

ভাঙা গাছটার পিছন থেকে আত্মপ্রকাশ করে একটা মারমুখো ক্ষ্যাপা গণ্ডার!

ময়ূখ চৌধুরী

পেক্কা

পিছন থেকে লড়াইয়ের শব্দ ভেসে আসে — চোখে না দেখলেও ব্যাপারটা বুঝতে পেক্কার অসুবিধা হয় না।

দলের উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়ে পেক্কা — উত্তর আসে দূর থেকে...

শেষ

প্রান্তরে মৃত্যুর হানা

আমেরিকার অরণ্যময় পার্বত্য অঞ্চলে নেকড়ে আর বুনো ঘোড়ার লড়াইএর দৃশ্য নিতান্ত বিরল নয় — কিন্তু যে ঘোড়াটি এখানে তিনটি নেকড়ের সঙ্গে মৃত্যুপণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে তার সাজসজ্জা দেখলেই বোঝা যায় সে নিতান্তই গৃহপালিত জীব, অরণ্যের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই ...

অরণ্যবেষ্টিত মুক্ত প্রান্তরের বুকে গৃহপালিত অশ্বের আবির্ভাবের কারণ জানতে হলে কয়েকঘন্টা আগে সংঘটিত দুর্ঘটনার বিবরণ জানতে হবে ...

প্রান্তরে মৃত্যুর হানা

প্রান্তরে মৃত্যুর হানা

ময়ূখ চৌধুরী

প্রান্তরে মৃত্যুর হানা

প্রান্তরে মৃত্যুর হানা

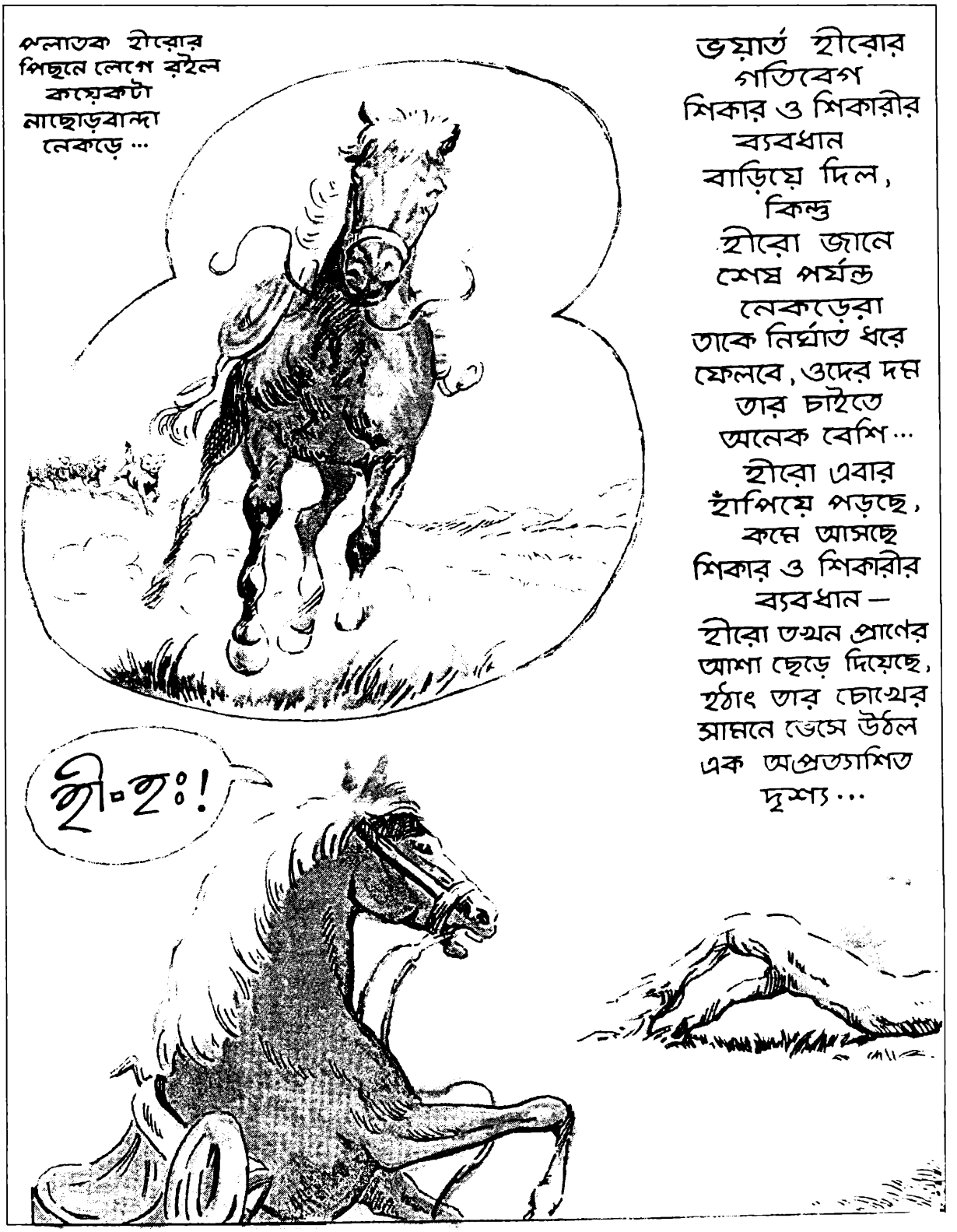

ময়ূখ চৌধুরী

প্রান্তর মৃত্যুর হানা

প্রান্তরে মৃত্যুর হানা
হীরো অবাক হয়ে দেখল তার সঙ্গী আক্রান্ত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করল না, তীরবেগে এগিয়ে গিয়ে সে নিজেই আক্রমণকারীর ভূমিকা গ্রহণ করল...
হিঁ-হি-হি!
হীরো এইবার এগিয়ে এসে যুদ্ধে যোগ দিল — কিছুক্ষণের মধ্যেই লড়াই শেষ...

প্রান্তরে মৃত্যুর হানা

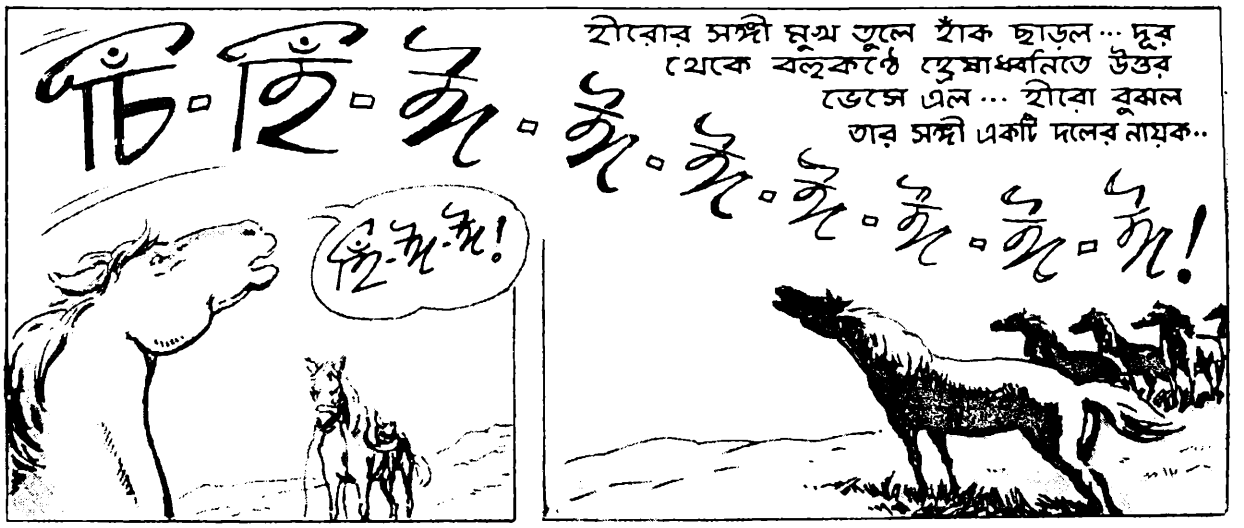

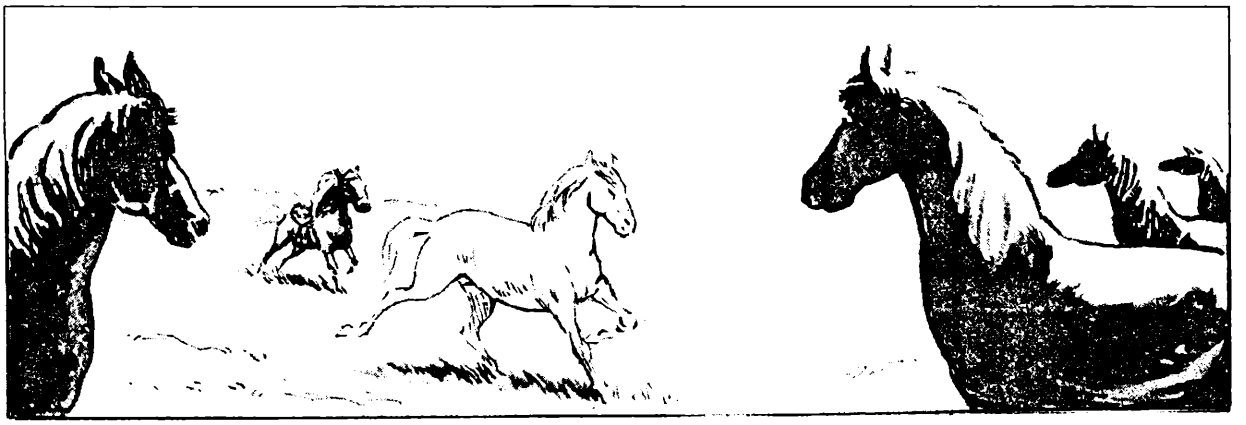

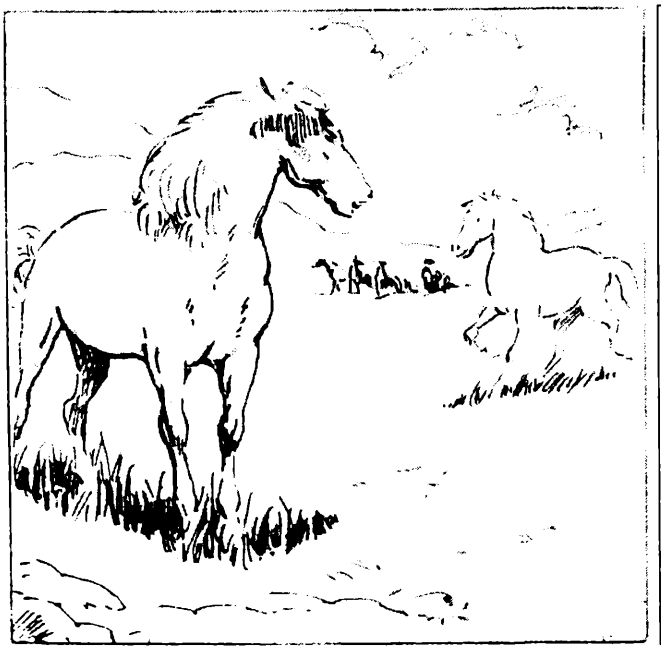

দলপতি চিনুকের সঙ্গে বুনো ঘোড়ার দলে মিশে গেল হীরো... কেটে গেল চার-চারটি বৎসর, খসে পড়ল হীরোর দেহ থেকে মানুষের গড়া সাজ-সজ্জা, বন্য প্রকৃতির স্পর্শে তার দেহে সাড়া দিল পূর্বপুরুষের বন্য রক্ত – হীরো এখন আর মানুষের দাস নয়, সে আজ মুক্ত প্রকৃতির স্বাধীন সন্তান...

হীরো এখন দলপতি চিনুকের বন্ধু নয়, প্রতিদ্বন্দ্বী। এসব ক্ষেত্রে 'জোর যার, দল তার', এই নীতি অনুসরণ করা হয়, অর্থাৎ দ্বন্দ্বযুদ্ধের ফলাফল থেকেই নির্বাচিত হয় দলপতি। তবে লড়াইটা এতদিন হতে হতেও হয় নি, কিন্তু সেদিন যখন হীরো দলপতির নির্দেশ অমান্য করল, তখনই চিনুকের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল, 'রণং দেহি' মূর্তিতে সে ছুটে এল বিদ্রোহীকে দণ্ড দিতে...

প্রান্তরে মৃত্যুর হানা

শুরু হল লড়াই। কিন্তু শেষ নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই বিপদের সংকেত জানাল দলের প্রহরী...

হুঁ·ঈ·ঈ·ঈ!

ছুটে আসছে নেকড়ের দল...

নেকড়েগুলোর পথ আটকে রুখে দাঁড়াল চিনুক — দলের সকলে সেই অবসরে ছুটে পালাল...

প্রান্তরে মৃত্যুর হানা

চিনুকের মৃত্যু হল। ঘোড়ার দলে দলপতির স্থান অধিকার করল হীরো। আমাদের কাহিনী এখানেই শেষ। সত্য এখানে আসেনি তথ্যের রূপ ধরে— এসেছে, রঙ্গীন গল্পের ছদ্মবেশে।

বনবাসী বন্ধু

আজকের কথা নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে বৃটিশ-আফ্রিকার একটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল আমাদের কাহিনীর পটভূমি। সংরক্ষিত অঞ্চলে জীবজন্তু শিকার নিষিদ্ধ হলেও একদল লোভী মানুষ বে-আইনীভাবে ঐসব এলাকায় শিকার করে। কারণ, হাতির দাঁত গণ্ডারের খড়্গ, লেপার্ড ও সিংহের চামড়া বিক্রি করে মোটা অঙ্কের টাকা পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত চোরা-শিকারী-দের বলা হয় 'পোচার'। সরকারের বেতনভোগী বনরক্ষক সর্বদাই ঐ 'পোচার' নামক দুর্বৃত্তদের কবল থেকে রক্ষিত অঞ্চলের বন্য পশুদের রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট থাকেন। জন মাইকেল ছিলেন বৃটিশ-আফ্রিকার একটি সংরক্ষিত অরণ্যের 'গেম ওয়ার্ডেন' বা বনরক্ষক।

কিছুদিন ধরে বনের ভিতর বন্দুকের গুলি এবং বর্শায় আহত বিভিন্ন জন্তুর মৃতদেহ পাওয়া যাচ্ছিল। অর্থাৎ, একদল 'পোচার' জন্তুগুলোকে হত্যা করছে। ঐ 'পোচারদের' ধরার জন্য বিশ্বস্ত অনুচর ওরিয়াঙ্গাকে নিয়ে জঙ্গলে টহল দিচ্ছিলেন বন-রক্ষক জন মাইকেল ...

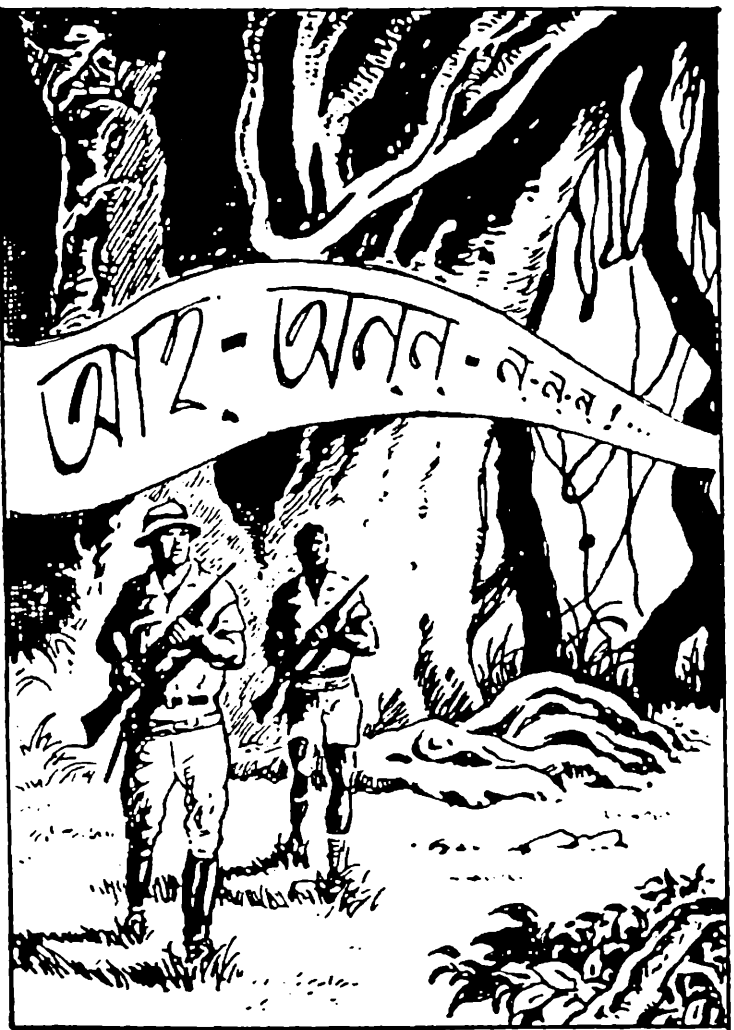

আচম্বিতে নিকটবর্তী অরণ্য থেকে ভেসে এল শ্বাপদকণ্ঠের ভয়াবহ গর্জনধ্বনি ...

গর্জনের শব্দ অনুসরণ করে এগিয়ে গেলেন মিঃ মাইকেল ... হঠাৎ পিছন থেকে ওরিয়াঙ্গার আর্তস্বর শুনে ফিরে তাকিয়ে চমকে উঠলেন তিনি ...

ময়ূখ চৌধুরী

বনবাসী বন্ধু
বাও য়ানা! আমি হঠাৎ পড়ে গেলাম, উঠতে পারছি না..
ঘাসের মধ্যে মাটিতে ফাটল ছিল, দেখতে পাই নি – সেটার ভিতর আমার পা ঢুকে গেছে।
ওরিয়াঙ্গার পা ভীষণ মচকে গিয়েছিল, তার পক্ষে বনপথে দ্রুত চলাচল অসম্ভব বিবেচনা করে একাই এগিয়ে চললেন মাইকেল..
ওরিয়াঙ্গা! তুমি এখানে অপেক্ষা করো- আমি ব্যাপারটা দেখে আসি।
সিংহের চলার পথে গর্ত খুঁড়ে পোচাররা ঘাস-পাতা চাপা দিয়েছে...
তারপর সেই আলগা ছাউনির উপর গরুর ঠ্যাং রেখে টোপ ফেলেছে। মাংসের লোভে ওখানে এগিয়ে গেছে সিংহ, আর তার দেহের ভারে আলগা ঘাস-পাতা সরে গেছে – বেচারা সিংহ হুড়মুড় করে পড়েছে গর্তের মধ্যে।
গর্জনের শব্দ অনুসরণ করে কিছুদূর যেতেই সিংহটাকে দেখতে পেলেন মাইকেল–
কোমর থেকে ম্যাচেট খুলে নিয়ে গাছ কাটতে শুরু করলেন মাইকেল...
পোচাররা এসে পড়ার আগেই জন্তুটাকে উদ্ধার করতে হবে।
ধারাল ম্যাচেটের আঘাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি গাছ ছিটকে পড়ল গর্তের ভিতর-
উফ!

বনবাসী বন্ধু
হ·ম·ম!
আশা করি জন্তুটা আমাকে আক্রমণ করবে না, তবু প্রস্তুত থাকা উচিত...
সিংহ বুদ্ধিমান জন্তু, বোধহয় বুঝতে পেরেছে আমি ওকে উদ্ধার করেছি... ও চলে যাচ্ছে...
অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি ওরিয়াঙ্গাকে নিয়ে আস্তানায় না ফিরতে পারলে বিপদের সম্ভাবনা আছে।
এইবার ওরিয়াঙ্গার কাছে ফিরে যাই। এতক্ষণে নিশ্চয়ই ওর পায়ের যন্ত্রণা একটু কমেছে...
আঃ!
হুঁঃ!

বনবাসী বন্ধু
চোখ মেলে তাকিয়েছে!
!?
এই যে মিঃ মাইকেল! এতক্ষণে তোমার জ্ঞান হ'ল! আমায় চিনতে পারছ?
কয়েকঘন্টা পরে চেতনা ফিরে পেলেন মাইকেল...
মিঃ মাইকেল! তুমি আমায় চিনতে পারছ না?
চার্লি বার্জার! আমি আগেই ভেবে ছিলাম এই চোরা-শিকারের পিছনে তুমি আছ...
এইবার প্রমাণ হয়ে গেল আমার সন্দেহ সত্য।
দুঃখের বিষয়, এই প্রমাণ যথাস্থানে পেশ করার সুযোগ বোধহয় তোমার হবে না।
চার্লি! তুমি আমাকে খুন করতে চাও?
ছি! ছি!

বনবাসী বন্ধু
ছি! ছি! আমার সম্পর্কে তোমার ধারণা দেখছি খুব খারাপ। আমি তোমায় খুন করব কেন? এই পথে বুনো জন্তুরা নদীতে জলপান করতে যায়…
তোমায় দেখে তারা নিশ্চয়ই খুশি হবে। তোমার চাইতে বড় বন্ধু তাদের আর কে আছে মিঃ মাইকেল? অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে — তোমার চতুষ্পদ বন্ধুরা এখনই এই পথে যাতায়াত শুরু করবে। সুতরাং আমরা বিদায়-গ্রহণ করছি, তুমি বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করো।
মৃত্যু নিশ্চিত… আজ রাতে বুনো জন্তুরা আমাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খাবে।
রাত্রি গভীর হল…

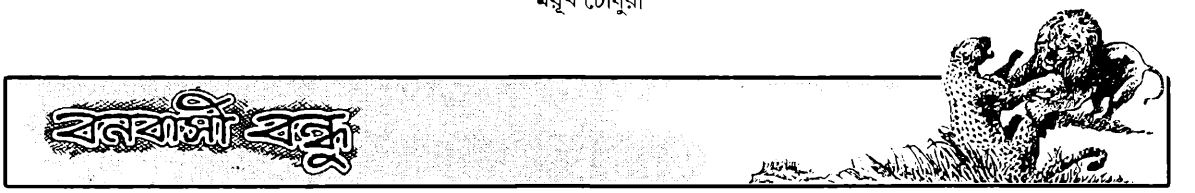
বনবাসী বন্ধু

রাত্রিকে অভিনন্দন জানিয়ে বীভৎস অট্টহাস্যে মুখর হয়ে ওঠে হায়নার দল··· আঁধার অরণ্যপথ ধরে নিঃশব্দে বিচরণ করে শিকার-সন্ধানী শ্বাপদ···
হা-হা-হা!

লেপার্ড!

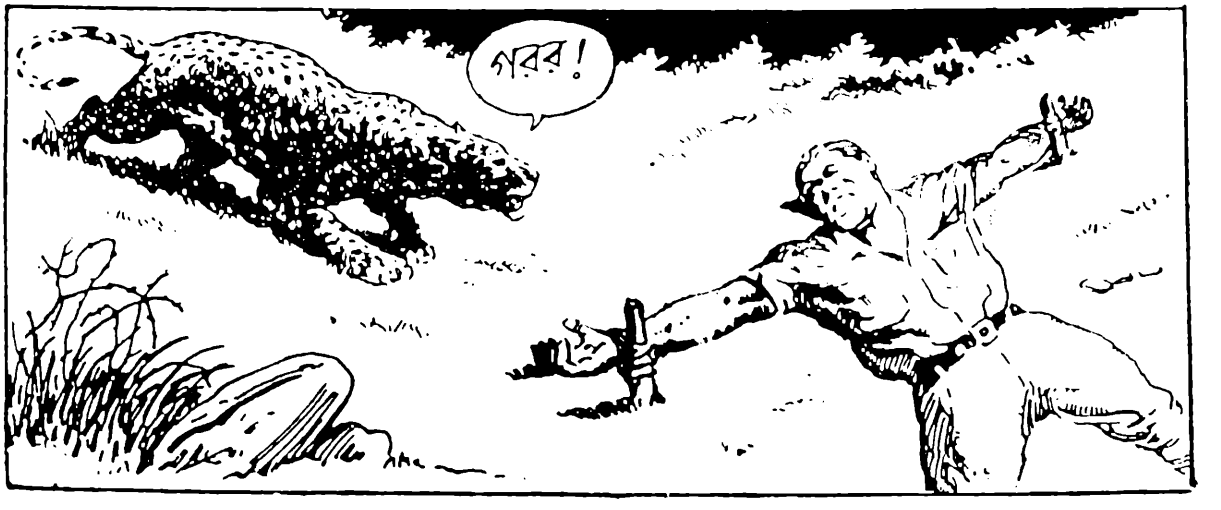
গরর!

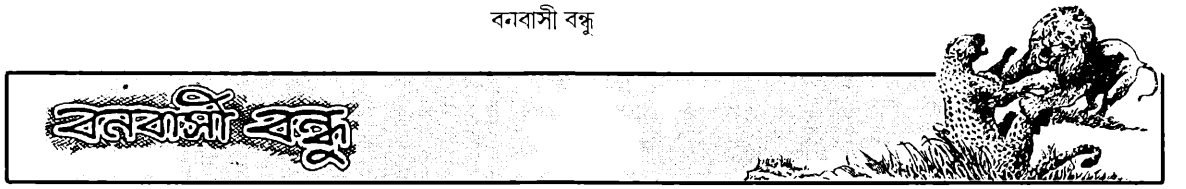
বনবাসী বন্ধু

বাঁচাও! বাঁচাও!
গরর!
আহঃ উনন্!
মাইকেলের আর্ত আহ্বান কোনও মানুষের কানে পৌঁছাল না; কিন্তু বনের ভিতর থেকে উত্তর এল প্রচণ্ড বজ্রনাদে

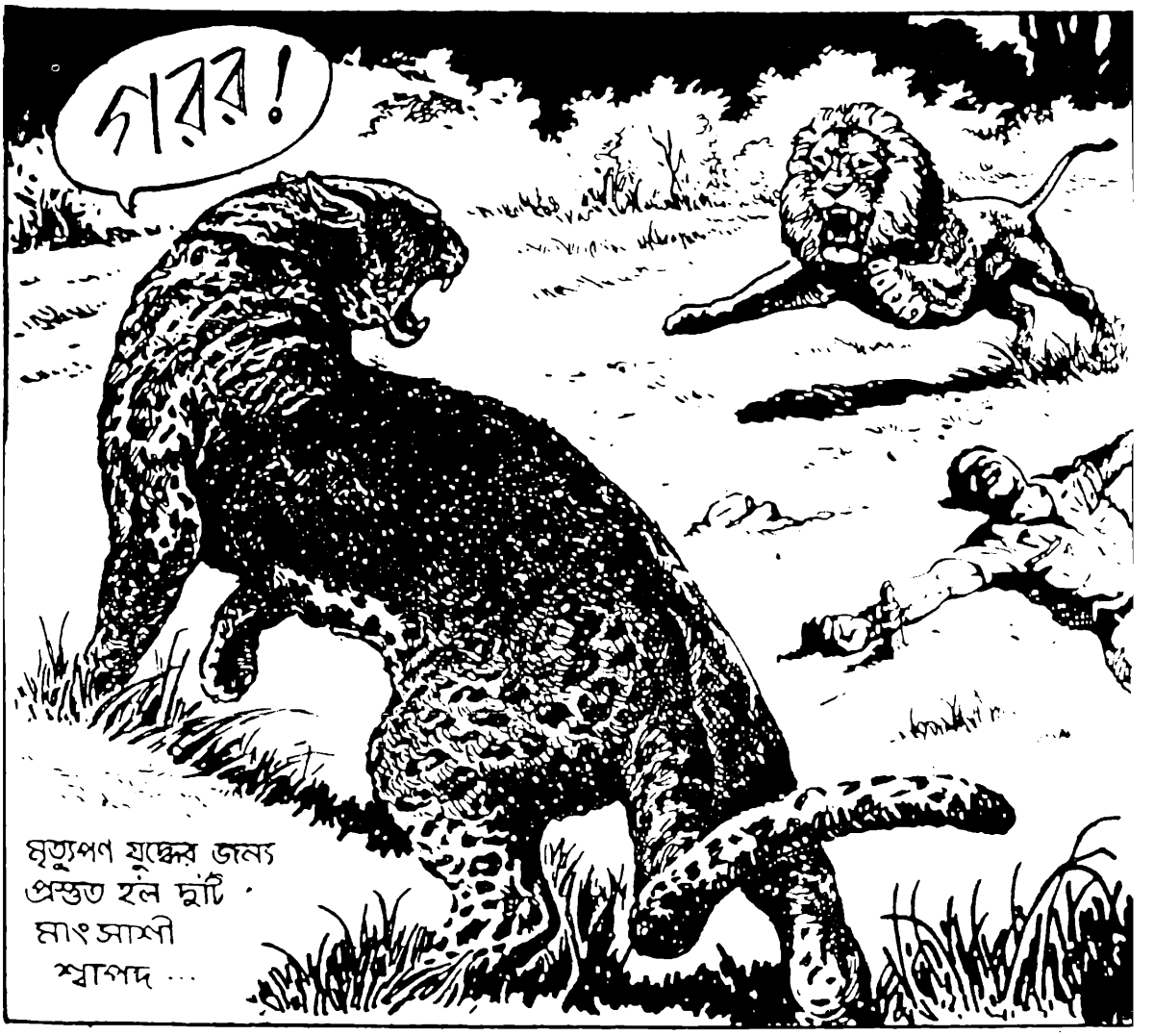
গরর!
মৃত্যুপণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল দুটি মাংসাশী শ্বাপদ ...

বনবাসী বন্ধু
লড়াইএর পরিণাম যাই হোক, আমার মৃত্যু নিশ্চিত – যে-জন্তুটা জিতবে, সেই আমার দেহটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে।
রযাঁয়!
এবার বোধহয় আমার পালা!

বনবাসী বন্ধু

এই সিংহটাকেই তো ফাঁদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম !... কিন্তু সিংহ ঐ দিকে কী-যেন দেখছে !
সিংহের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল একজোড়া হায়না। জন্তু দুটো কাছে এগিয়ে আসছিল, সিংহের ক্রুদ্ধ আস্ফালন দেখে তারা বুদ্ধিমানের মতো চটপট স্থানত্যাগ করে সরে পড়ল...
ভোক্! ভোঃ!...
আমার কুকুর টম! সঙ্গে রয়েছে ওরিয়াঙ্গা আর মডু!... এই! তোমরা গুলি চালিও না!
রাত্রি প্রভাত হল...
সিংহের মুখে বাওয়ানা!
বাওয়ানা!
ভোক্! ভোঃ!
মাইকেলের কুকুর টম, গন্ধ শুঁকে শুঁকে প্রভুকে আবিষ্কার করেছে...

ওরিয়াঙ্গা জানাল পায়ের ব্যথা কমতেই সে আস্তানায় ফিরেছিল... সমস্ত রাত ধরে বাওয়ানার জন্য অপেক্ষা করতে করতে সে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু অন্ধকারে খোঁজাখুঁজি করা সম্ভব নয় বলে চুপচাপ বসেছিল...
সকাল হতেই টমকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে বাওয়ানার সন্ধানে...
সিংহ কি বুঝল কে জানে – সে মন্থরচরণে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে অদৃশ্য হয়ে গেল...
বন্ধনমুক্ত হয়ে বিগত রাত্রির আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা বললেন মাইকেল...
বাওয়ানা! আমার মনে হয় সিংহটা আপনাকে শিকার হিসাবে বেছে নিয়েছিল, তাই অন্য জন্তুর মুখ থেকে তার শিকারকে সে বাঁচিয়েছে। খিদে পেলেই সে আপনাকে মেরে খেয়ে ফেলত — বুঝলেন?
হয়তো তোমার কথা সত্যি – কিন্তু আমার ধারণা অন্যরকম।

ময়ূখ চৌধুরী

সাক্ষী ছিল চাঁদ

সাক্ষী ছিল চাঁদ
ওঃ! বাঘিনী!... আচ্ছা কাঁধের বোঝা আমি এই মাটিতে নামিয়ে রাখলুম — এইবার এস! আমার নাম ডিম্বু সর্দার — সহজে ছাড়ছি না...
গর্র!
হাতে কুড়ুল থাকলে ডিম্বু বাঘ-ভালুকের পরোয়া করে না...
কি হল? বাঘিনী হঠাৎ পিছন ফিরে কি দেখছে? আমাকে রুখে দাঁড়াতে দেখে ভয় পেল নাকি? —
কুকুর! অনেকগুলো বুনো কুকুরের চিৎকার!
রুঘ্!
ও উ-উ-উ-ও-ও-ও-ও!...
ও-উ-ও-ও-ও!...
বাঘিনী হঠাৎ ছুটে এল, কিন্তু তার লক্ষ্যবস্তু ডিম্বু নয় — ডিম্বুর থলে! খুব সাবধানে ধীরে ধীরে ডিম্বু পিছিয়ে গেল। বাঘিনীকে সে ভয় করেনা, কিন্তু পিছনে ছুটে আসছে সাক্ষাৎ মৃত্যু — কুকুরের দল!
কুকুরের চিৎকার এগিয়ে আসছে!
2

সাক্ষী ছিল চাঁদ

কুকুর গুলো এখনই এসে পড়বে। তাড়াতাড়ি গাছে উঠে প্রাণ বাঁচাই ... বাঘিনীকে ভয় করি না, কিন্তু কুকুরের দলের সামনে পড়লে রক্ষা নেই!
বাঘিনীর ধারাল দাঁতের পেষণে ছিঁড়ে গেল থলে — ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা বাঘের বাচ্চা, থাবা আর মুখ দড়ি দিয়ে বাঁধা!
উ-উ-উ-উ-উ-উ...
উ-উ-উ-উ-উ-উ-উ-উ!
বনের আড়াল থেকে খোলা মাঠের উপর আত্মপ্রকাশ করল একদল হিংস্র কুকুর!
গাছের উপর থেকে লড়াই দেখছে ভিখু —
বাঘিনী মরিয়া হয়ে লড়ছে ... দুটো কুকুর মারা পড়ল ... কিন্তু এতগুলি কুকুরের সঙ্গে একা বাঘিনী সামাল দিতে পারবে না ..
৩

সাক্ষী ছিল চাঁদ

অনেকগুলো শত্রু নিপাত করে বাঘিনী মৃত্যুবরণ করল। অবশিষ্ট তিনটে কুকুরের মধ্যে হঠাৎ একটি পশুর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল অসহায় বাচ্চাটির দিকে...

তিথু গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ল...

একটি বুদ্ধিমান কুকুর বুঝল বাঘিনীর থাবার চাইতে তিথুর কুড়ুল কিছুমাত্র কম মারাত্মক নয়!

নির্জন বনভূমির বুকে শ্বাপদ ও দ্বিপদের মৃত্যুপণ লড়াই উপভোগ করার জন্য কোনও দর্শক সেখানে উপস্থিত ছিল না – রাতের আকাশে সেই ভয়ংকর ঘটনার একমাত্র সাক্ষী ছিল চাঁদ!

মহারাজ রুদ্রদমনের ঘটনাবহুল জীবনের
প্রথম কাহিনী —

মহাকালের মন্দিরে

মহাকালের শাস্তিদণ্ড

মহারাজ রুদ্রদমনের রাজত্বে প্রজারা সুখেশান্তিতে বাস করত বটে, কিন্তু প্রবাদবাক্য অনুসারে বাঘে-বলদে একঘাটে জলপান করত না। কারণ বাঘের মতো মানুষগুলো সুযোগ পেলেই বলদ-সদৃশ মানুষের ঘাড় ভেঙে স্বার্থসিদ্ধি করার চেষ্টা করত এবং তার ফলে রাজ্যের স্থানে স্থানে শান্তিভঙ্গের ঘটনা খুব বিরল ছিল একথা বলা যায় না। তবে প্রজাদের শুভ-অশুভের প্রতি সর্বদাই নিবদ্ধ থাকত মহারাজের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। অপ্রীতিকর অবস্থার উদ্ভব হলে অনেকসময় তিনি প্রতিকার করতেন

স্বহস্তে। বেতনভোগী কর্মচারীর উপর দায়িত্ব অর্পণ করে নিশ্চিন্ত থাকতেন না শ্রাবস্তীর অধিপতি মহারাজ রুদ্রদমন।

সেইজন্যই রাজ্যের একপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে দস্যু কর্কর যখন হানা দিল তখন গ্রামের মানুষ সন্ত্রস্ত হলেও গ্রাসে বিহ্বল হয় নি, তারা জানত রুদ্রদমনের রাজত্বে কুকর্মকারী দুর্বৃত্তের রক্ষা নেই। বারংবার শান্তিভঙ্গের সুযোগ পাবে না দস্যু কর্কর। কিন্তু গ্রামের নিকটবর্তী অরণ্য ভেদ করে যে-পথিক আত্মপ্রকাশ করল, সে বোধহয় পরিস্থিতি ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন ছিল না...

মহাকালের মন্দিরে

একটিমাত্র লোকের বিরুদ্ধে সমগ্র গ্রামবাসীর সতর্কতা
মন্দ লোকের কাছে ভীরুতার নিদর্শন বলেও গণ্য হতে পারে।
আমরা বিচলিত হব না। অপরিচিত অস্ত্রধারী মানুষ সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।
ঘটনার বিশদ বিবরণী না জানলে গ্রামবাসীর প্রশ্ন সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে।
তবে শোনো বলছি..
নগর কোতোয়াল আমাদের জানিয়েছিল যে, দস্যু কর্কর তার পূর্বতন আশ্রয় ত্যাগ করে এই গ্রামের পার্শ্ববর্তী অরণ্যে ঘাঁটি নিয়েছে; —অতএব গ্রামরক্ষীগণ যেন প্রস্তুত থাকে। আমরা প্রস্তুত ছিলাম।
তাই বিগত রাত্রে যখন শ্রেষ্ঠী গণপতির গৃহে দল নিয়ে কর্কর হানা দেয়
তখন আমরা তাকে বাধা দিতে সমর্থ হয়েছি। পরাজিত কর্কর দল নিয়ে পলায়ন করেছে। কিন্তু কর্করের ন্যায় দস্যু এত সহজে পরাজয় স্বীকার করে না, সে আবার আক্রমণ করবে...
তাই আমরা অপরিচিত কোন ব্যক্তিকে গ্রামে স্থান দিতে রাজী নই।
এখন সব শুনে বুঝলাম সতর্কতার প্রয়োজন আছে। কিন্তু রাত্রি আগত...
শ্বাপদ-অধ্যুষিত ঐ অরণ্যে রাত্রি-যাপন করলে বিপদ ঘটতে পারে— আচ্ছা.
আচ্ছা! অদূরে দৃশ্যমান ঐ মন্দির গ্রামের বাইরে রয়েছে। ঐখানেই আমি রাত্রিযাপন করব।
সর্বনাশ!
না!
না!
দেবালয়ে আশ্রয় চাইলে আমাকে তোমরা বাধা দেবে কোন অধিকারে? বিশেষতঃ মন্দিরটি যখন অবস্থান করছে গ্রামের বাইরে?
পথিক! তুমি জানোনা— ঐ মন্দির হচ্ছে অভিশপ্ত মৃত্যুপুরী!
৩

মহাকালের মন্দিরে

অভিশপ্ত মৃত্যুপুরী!.. তোমার কথা বুঝলাম না।
তোমাকে তাহলে সব কথা খুলে বলতে হয় ...
বহুকাল পূর্বে ঐ মন্দিরের দেবতা মহাকালের পূজারীর সঙ্গে গ্রামপ্রধানের বিরোধ হয়...
গ্রামপ্রধান তখন ঐ পূজারীকে তাড়িয়ে দেবসেবার জন্য অন্য পুরোহিত নিযুক্ত করেন। বিতাড়িত পূজারী গ্রামত্যাগ করার পূর্বে অভিশাপ দিয়ে বলে ঐ মন্দিরে যে প্রবেশ করবে মহাকালের কোপে তার মৃত্যু নিশ্চিত। পূজারীর অভিশাপে কেউ ভীত হয় নি। কিন্তু হঠাৎ একদিন নবনিযুক্ত পুরোহিত অদৃশ্য হলেন। গ্রামবাসী একটু বিচলিত হল, তবু দেবসেবার জন্য আবার নিযুক্ত হলেন আরও একজন পুরোহিত..
কয়েকমাস পরে তিনিও হলেন অদৃশ্য। পূর্ববর্তী পূজারী নগ্নপদ ছিলেন, কিন্তু পরবর্তী পূজারীর পরিত্যক্ত পাদুকা মন্দিরের দ্বারে দেখে গ্রামবাসী বুঝল ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হওয়ার পূর্বে দেবালয়ে প্রবেশ করেছিলেন। এইবার সকলেই ভীত হয়ে পড়ল। নিয়ম অনুসারে প্রতি রাত্রে মধ্যযামে মহাকালের মন্দিরে পূজানিবেদন করা হতো। কিন্তু কোন ব্রাহ্মণ আর ওই দেবালয়ে প্রবেশ করতে সাহসী হলেন না। মহাকালের মন্দির বনজ উদ্ভিদ ও লতাগুল্মে পরিবৃত হয়ে অবস্থান করতে লাগল ভয়ংকর অভিশাপের নীরব সাক্ষী হয়ে..
কিন্তু গ্রামের একটি গোয়ালে যে-চিতাবাঘটা একরাতে হানা দিতে এল, সে অভিশাপের খবর রাখত না...
মানুষের তাড়া পেয়ে জন্তুটা মন্দিরের মধ্যে ঢুকে গেল...
গভীর রাতে কেউ মন্দিরে ঢুকতে সাহস করল না। সারারাত ধরে সশস্ত্র যুবকরা মন্দির পাহারা দিল। সকাল হতেই তারা ভিতরে প্রবেশ করেছিল কিন্তু মৃত বা জীবিত কোন চিতাবাঘ তাদের চোখে পড়ে নি।
আহা! চিত্রকের কী সৌভাগ্য! দেবতার ক্রোড়ে বিলীন হয়ে তার পশুজন্ম সার্থক!..
তবে মহাকাল বোধহয় আমার মতো পাপীকে কৃপা করবেন না। কালপ্রভাতে নিশ্চয়ই তোমরা আমাকে জীবিত দেখতে পাবে। ভালো কথা — একটা মশাল দিতে পারো? অন্ধকারে অসুবিধা হতে পারে।
এখনই দিচ্ছি!
পথিক আমাদের কথা বিশ্বাস করল না। ঐযে ও মন্দিরে প্রবেশ করছে।
পথিক আর সূর্যোদয় দেখতে পাবে না। চলো, রাতের পাহারার সময় হয়েছে।
4

ময়ূখ চৌধুরী

মহাকালের মন্দিরে

মহাকালের মন্দিরে

হয়েছে, হয়েছে—
ও-ও:!
হয়েছে, হয়েছে, আর ভুঁড়ি দিয়ে হাই তুলতে হবে না। রাত শেষ, আমাদের আর পাহারা দেওয়ার দরকার নেই। দস্যু কর্কর এই গ্রামে হানা দিতে সাহস পাবে না। এবার চলো, শয্যাগ্রহণ করি।
তার আগে মহাকালের মন্দিরে গিয়ে পথিকের সন্ধান করা দরকার।
ঠিক বলেছ। তার কথা তো মনেই ছিল না—চলো।
চলো। অবশ্য তাকে যে পাওয়া যাবে না এবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ—তবু...
তবু লোকটি আমাদের অতিথি, তার সন্ধান করা আমাদের কর্তব্য।
নিশ্চয়!
এই তো মন্দিরে এসে পড়েছি—ওকি!
বিরাট অজগর! ঐ সর্পের আলিঙ্গনে প্রাণ হারিয়েছে পথিক! চলো সামনে গিয়ে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করি।
আরে! একি!

মহাকালের মন্দিরে

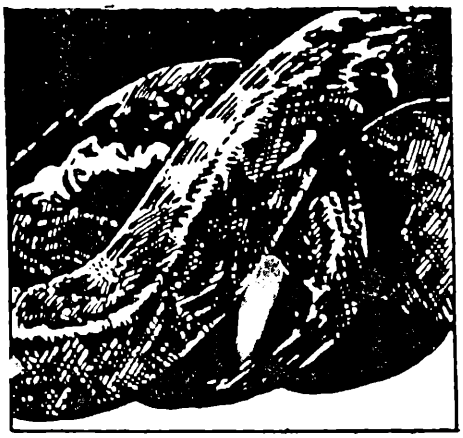

আরে! একি! এতো পথিক নয়! এযে দেখছি দস্যু কর্কর!
তাইতো! ... ওঃ, বুঝেছি — দস্যু এই মন্দিরের মধ্যে আত্মগোপন করেছিল ..

কাল রাতে অজগরের আলিঙ্গনে পিষ্ট হয়ে সে মৃত্যুবরণ করেছে। দুর্দান্ত দস্যু মৃত্যুর পূর্বে অসির আঘাতে সর্পের মস্তকছেদন করে প্রতিশোধ নিয়েছে ... কিন্তু এই মহাসর্প এল কোথা থেকে?
তুমি নির্বোধ।

তুমি নির্বোধ। সর্পকে কর্কর হত্যা করে নি। পাশেই দস্যুর অসি পড়ে আছে, তাতে রক্তের চিহ্ন নেই। সর্পকে হত্যা করেছে পথিক। তার কাছে তরবারি ছিল ...

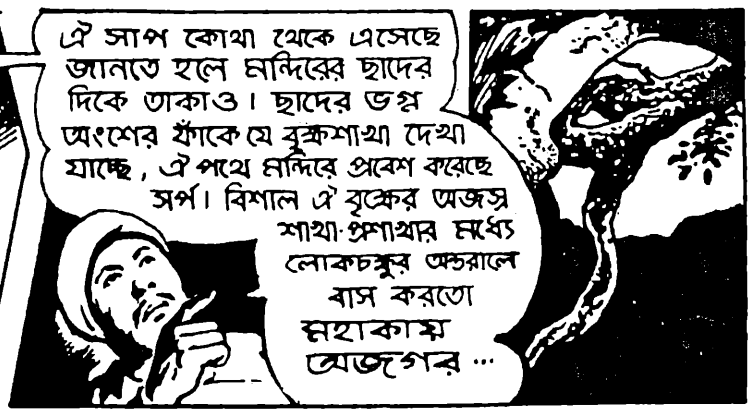
ঐ সাপ কোথা থেকে এসেছে জানতে হলে মন্দিরের ছাদের দিকে তাকাও। ছাদের ভগ্ন অংশের ফাঁকে যে বৃক্ষশাখা দেখা যাচ্ছে, ঐ পথে মন্দিরে প্রবেশ করেছে সর্প। বিশাল ঐ বৃক্ষের অজস্র শাখা-প্রশাখার মধ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে বাস করতো মহাকায় অজগর ...

এবং রাত্রিকালে সুযোগ পেলে মন্দিরে ঢুকে মানুষকে গ্রাস করে পুনরায় সে আত্মগোপন করতো বৃক্ষের উপর। হয়তো যাওয়ার সময় সে মন্দিরের দ্বারপথে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বৃক্ষে আরোহন করতো। যে চিতাবাঘটি গ্রামবাসীদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য গভীর রাত্রে মন্দিরে প্রবেশ করেছিল, সেই জন্তুটিও ঐ মহাসর্পের উদরের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছিল। ব্যাপারটা আদৌ অলৌকিক নয়, পূজারীর অভিশাপ আর সর্পের আবির্ভাব নিতান্তই কাকতালীয়, কিন্তু একটি বিষয় বোধগম্য হচ্ছে না — সর্পকে হত্যা করে পথিক স্থানত্যাগ করল কেন? কে এই পথিক?

গ্রামবাসী কোনদিন জানতে পারবে না যে, তাদের গ্রামে পথিকের ছদ্মবেশে এসেছিলেন স্বয়ং মহারাজ রুদ্রদমন!
7

রবিনহুড

দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে নর্ম্যান জাতি যখন ইংল্যাণ্ডের উপর আধিপত্য বিস্তার করল, সেইসময় একদল নিষ্ঠুর নর্ম্যান যোদ্ধা ঐ দেশেরই আদিবাসী অ্যাংলো-স্যাক্সন গোষ্ঠীর ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করে ধনী হয়ে উঠল। পূর্বোক্ত অত্যাচারী নর্ম্যানদের মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত ছিল "কালো সাপ" নামক নর্ম্যান "নাইট" (বর্মাবৃত যোদ্ধা)। নিপীড়িত অ্যাংলো-স্যাক্সনদের ভিতর থেকে সেইসময় আবির্ভূত হ'ল এক দুর্ধর্ষ যোদ্ধা —নাম তার রবিনহুড!

শেরউড বন ছিল উক্ত রবিনহুড ও তার অনুচরদের আস্তানা। দুর্গম বনের মধ্যে সেই গোপন আস্তানায় নর্ম্যানরা কখনও হানা দিতে সাহস করত না। নটিংহ্যাম অঞ্চলে যখন কালো সাপ হানা দিতে শুরু করল, তখন তাকে শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর হ'ল রবিনহুড। কালো সাপের বাসস্থান ও প্রকৃত পরিচয় ছিল সকলের অজানা — তবু তার সন্ধানে নটিংহ্যামের অরণ্য-সঙ্কুল অঞ্চলে হানা দিয়ে ঘুরতে লাগল রবিনহুড ... হঠাৎ একদিন শেরউড বনের মধ্যে ঘোড়ার খুরের খট্ খট্ শব্দ শুনে সে চমকে উঠল ...

রবিনহুড

এবার তোমার নিস্তার নেই কালো সাপ!
তোমাকে আমি জানি। তুমি রবিনহুড!
নারীর কণ্ঠস্বর!... আমি অসি কোষবদ্ধ করছি। কিন্তু কালো সাপের ছদ্মবেশে কে তুমি?
কালো সাপ? সে আবার কে?
আমি হার্টফিল্ডের দুর্গাধিপ স্যার উইলিয়ামের কন্যা — রোয়েনা। পথে দস্যু তস্করের উপদ্রব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য এই পুরুষোচিত ছদ্মবেশ ধারণ করেছি। দুর্গের ভিতর অস্ত্রাগারের মধ্যে এই বর্ম পেয়েছি।
সুন্দরি! বর্মের তলায় আত্মগোপন করে কোথায় চলেছ তুমি ঘোড়ায় চড়ে?
চলেছি আমার নিরুদ্দেশ পিতার সন্ধানে। দশদিন হ'ল আমার পিতা নিরুদ্দেশ। পিতৃব্য রবার্ট আমাদের সঙ্গে থাকেন। যথাসাধ্য চেষ্টা করেও তিনি পিতার সন্ধান পেলেন না। তাই আমি চলেছি নিরুদ্দেশ পিতার সন্ধানে।
তোমার পিতা স্যার উইলিয়াম আমার বিশেষ পরিচিত...
রোয়েনা! দুর্গে ফিরে যাও। আমি গোপন বনপথ ধরে তোমার আগেই দুর্গে পৌঁছাব...
আর সেই জায়গা থেকেই শুরু হবে আমাদের অনুসন্ধান পর্ব। আশা করি তোমার পিতার সন্ধান আমি পাব।
ধন্যবাদ রবিন!

রবিনহুড
কিছুক্ষণ পথচলার পর একটি নির্জন স্থানে উপস্থিত হল রবিনহুড ... হঠাৎ তার কানে এল মনুষ্যকণ্ঠের আর্তস্বর!...
কে যেন ক্ষীণস্বরে সাহায্য চাইছে!...
শব্দ অনুসরণ করে এগিয়ে গেল রবিনহুড ...
কী আশ্চর্য! এই বনের মধ্যে এমন একটি ভাঙাচোরা প্রাসাদ আছে জানতাম না তো! ঐ প্রাসাদের ভিতর থেকেই কে যেন ক্ষীণকণ্ঠে সাহায্য প্রার্থনা করছে!
মাটির উপর থেকে একটা ভাঙা গাছের গুঁড়ি তুলে নিয়ে সবলে আঘাত হানল রবিনহুড ...
একটা তুচ্ছ দরজা আমায় বাধা দিতে পারবে না।
রবিন ... রবিনহুড! আমার কণ্ঠস্বর কারও কানে যাবে ভাবতেই পারি নি। প্রাণের আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলাম।
সগার উইলিয়াম!

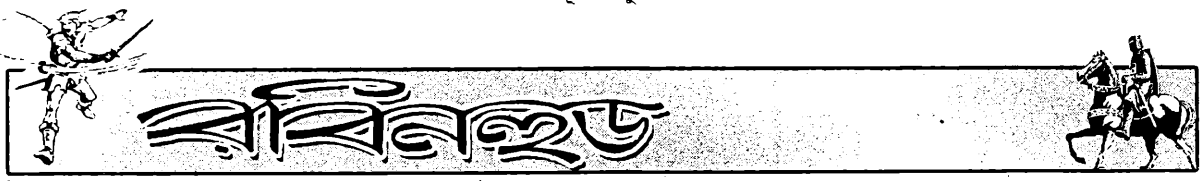
রবিনহুড

দশ দিন আগে যখন আমি হরিণ-শিকার করতে এখানে এসেছিলাম, সেইসময় আমার সঙ্গে কালো সাপের দেখা হয়। আমাকে বন্দী করে সে এই নির্জন ভগ্ন প্রাসাদে নিয়ে আসে। তারপর আমার দুর্গ ও ভূসম্পত্তি তার নামে দানপত্র করে লিখে দিতে বলে। আমি রাজী হই নি, কারণ, জানতাম — দানপত্রে সই করার পরেই সে আমাকে হত্যা করবে ... রবিন! আমার মাথা ঘুরছে, আমি —
উইলিয়াম দেখছি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন! কয়েক দিন অনাহারে থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছেন!...

স্যার উইলিয়ামের পক্ষে দুর্গ পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া অসম্ভব। আমি দুর্গ থেকে লোকজন এনে ওঁকে নিয়ে যাব। এখন উনি এখানেই থাকুন। বনের মধ্যে এই জায়গাটা নিরাপদ।

নির্জন বনপথ ধরে চলতে চলতে দুর্গে এসে পৌঁছাল রবিনহুড। দুর্গের সিংহদ্বার দিয়ে প্রবেশ করার সময়ে সে দেখতে পেল এক পরিচিত মূর্তি! আপাদমস্তক কালো বর্মে ঢাকা এক যোদ্ধা! নিশ্চয় রোয়েনা!...
রোয়েনা! এর মধ্যে পৌঁছে গেছে! ওর পিতার সংবাদ পেলে মেয়েটা ভারি খুশি হবে।

রবিনহুড

সুসংবাদ! রোয়েনা! সুসংবাদ!... তোমার পিতা স্যার উইলিয়ামের সন্ধান পেয়েছি। শয়তান কালো সাপ তোমার পিতাকে বনের ভিতর এক ভগ্ন প্রাসাদের মধ্যে বন্দী করে রেখেছিল। সেখান থেকে আমি তাঁকে উদ্ধার করেছি...
কিন্তু রোয়েনা— কালো সাপকে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

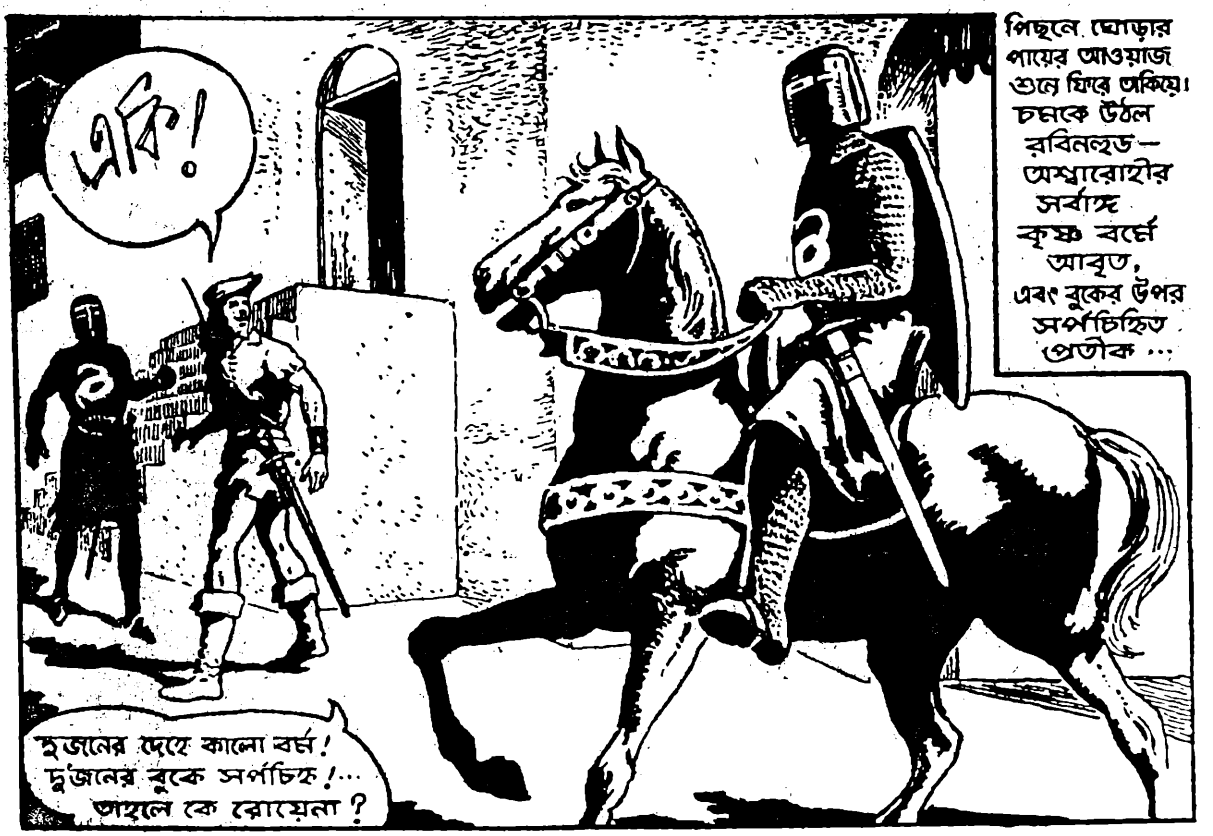
পিছনে ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনে ফিরে তাকিয়ে। চমকে উঠল রবিনহুড— অশ্বারোহীর সর্বাঙ্গ কৃষ্ণ বর্মে আবৃত, এবং বুকের উপর সর্পচিহ্নিত প্রতীক...
একি!
দুজনের দেহে কালো বর্ম! দুজনের বুকে সর্পচিহ্ন!... তাহলে কে রোয়েনা?

রবিনহুড

দুজনের মধ্যে কে যে প্রকৃতপক্ষে রোয়েনা তা নিয়ে বেশীক্ষণ রবিনহুডকে মাথা ঘামাতে হ'ল না — অশ্বারোহীর কণ্ঠ থেকে নির্গত হ'ল বামাকণ্ঠের আর্তস্বর — রোয়েনা!
রবিন! তোমার পিছনে তাকাও!

ওরে স্যাক্সন-কুকুর! আজ তোর মৃত্যু নিশ্চিত!
সত্যিকার কালো সাপ!

রবিনহুড

দুই সপ্তাহ ধরে তোমার সন্ধানে ঘুরছি। কালো সাপ! আজ তোমাকে পেয়েছি।
স্যাক্সন কুকুর! এখনই তোকে জাহান্নমে পাঠাব!

ভীষণ উত্তেজনায় শিরস্ত্রাণ খুলে ফেলল রোয়েনা...
রবিনের দেহে বর্ম নেই। যুদ্ধের ফল কি হবে?

ঝন্-ঝনাৎ!
নিদারুণ সংঘাতে ঝনৎকার-ধ্বনি তুলে মিলিত হল দুটি রক্তলোলুপ তরবারি!...

রবিনহুড

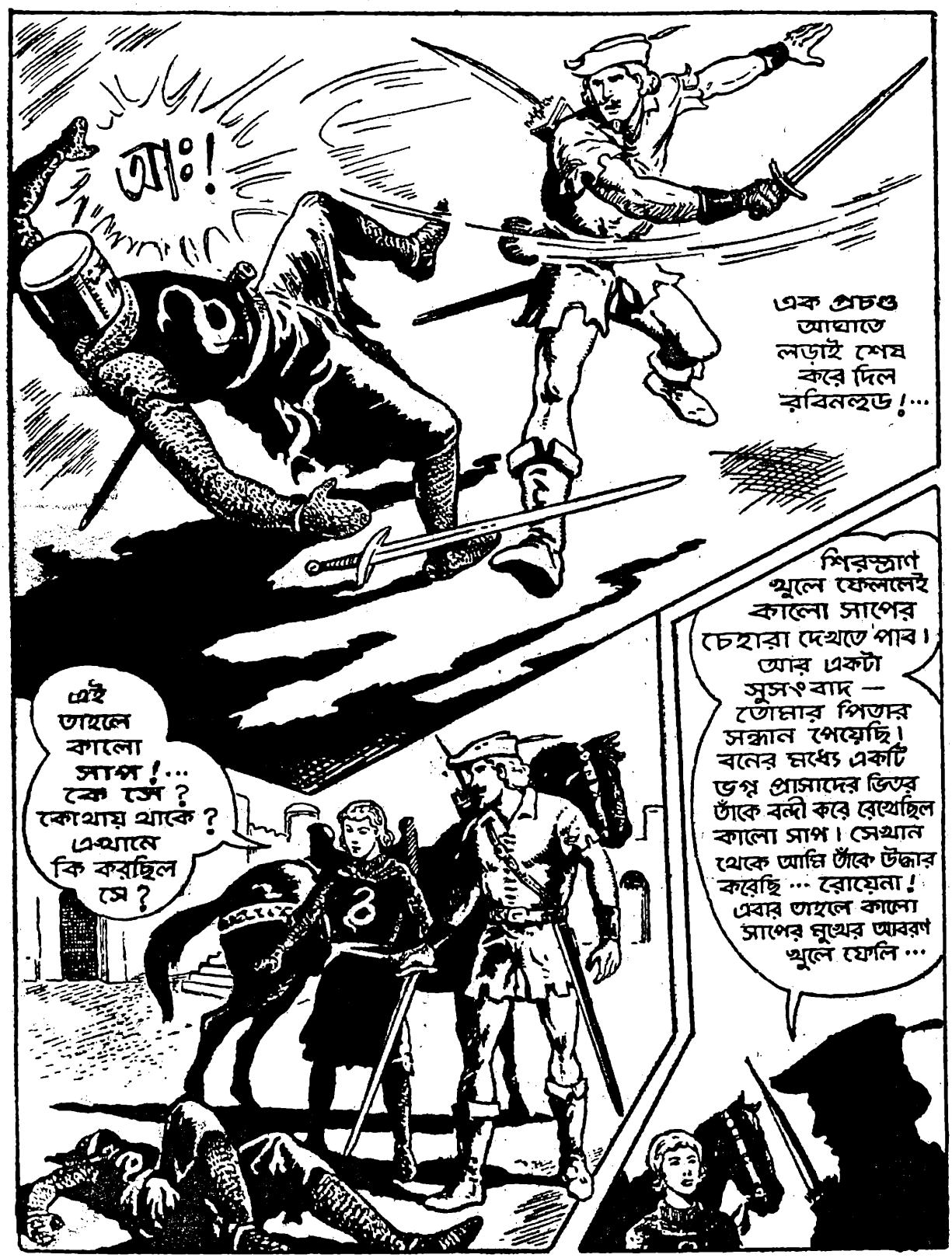
আঃ!
এক প্রচণ্ড আঘাতে লড়াই শেষ করে দিল রবিনহুড!...
এই তাহলে কালো সাপ!... কে সে? কোথায় থাকে? এখানে কি করছিল সে?
শিরস্ত্রাণ খুলে ফেললেই কালো সাপের চেহারা দেখতে পাব। আর একটা সুসংবাদ — তোমার পিতার সন্ধান পেয়েছি। বনের মধ্যে একটি ভগ্ন প্রাসাদের ভিতর তাঁকে বন্দী করে রেখেছিল কালো সাপ। সেখান থেকে আমি তাঁকে উদ্ধার করেছি ... রোয়েনা! এবার তাহলে কালো সাপের মুখের আবরণ খুলে ফেলি ...

রবিনহুড

কী আশ্চর্য ব্যাপার! এযে দেখছি আমার পিতৃব্য রবার্ট ফিজারবার্ট!
তোমার পিতৃব্য রবার্টই তাহলে ছদ্মবেশী কালো সাপ!
রোয়েনা! অস্ত্রাগার থেকে যে বর্মটি নিয়ে তুমি পরিধান করেছ, সেটি তোমার পিতৃব্যের সম্পত্তি। শয়তান একটি বর্ম দুর্গের অস্ত্রাগারে রেখেছিল — ঐরকম আর একটি সর্পচিহ্নিত বর্ম সে রেখে দিয়েছিল বনের ভিতর ভগ্ন প্রাসাদের মধ্যে।

কয়েকঘণ্টা পরে...
ফিজারবার্ট ফন্দিটা ভালই করেছিল। ভগ্ন প্রাসাদের মধ্যে কে আর কালো সাপের সন্ধান করছে? কিন্তু রবিন — তোমার জন্যই সে ধরা পড়ে গেল।
অন্যায়ের সঙ্গে আমার আপোষ নেই — স্যাক্সনই হোক, আর নর্ম্যানই হোক, দুষ্কর্মকারীকে রবিনহুড কখনও ক্ষমা করেনা...
রোয়েনা! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, কালো সাপ আর ইংল্যাণ্ডের মানুষকে দংশন করবে না।

রঙমাখা চাঁদ

তরাই বনের একপ্রান্তে মস্ত বড় ঘাস জমিটার উত্তর দিকে যে পথটা ঘন জঙ্গল ভেদ করে সোজা চৌঘরা গ্রামের দিকে চলে গেছে সে পথ দিয়ে রাত্রিবেলা তো দূরের কথা — দিনের বেলাও মানুষ চলাচল করতে সাহস করে না। মাঠের দক্ষিণ দিকে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথটা আবার শুরু হয়েছে, তারপর ছোটবড় গাছ আর লতাপাতার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে ...

এপথে চলাচল করে তৃণভোজী হরিণের দল আর এখানকার ঘন জঙ্গল ও অগভীর ঘাস জমিতে গাছের ছায়ায় ছায়ায় লুকিয়ে হানা দিয়ে ফেরে ক্ষুধিত শ্বাপদ মৃগ মাংসের লোভে — এপথে মানুষ হাঁটে না। তাই মাঠের মাঝখানে ঘাস খেতে খেতে হঠাৎ চমকে মুখ তুলে দাঁড়ায় হরিণ দম্পতি — বনের রাস্তায় শুকনো পাতা মাড়িয়ে কে আসে? বাঘ? হায়না? চিতা?... কিন্তু শিকারী জানোয়ার তো এমন শব্দ করে শিকারকে সাবধান করে দেয় না — তবে?

তবে ওকে? কে আসে? কে? কে? কে আসে?...

রক্তমাখা চাঁদ
বিদ্যুৎবেগে পিছন ফিরে ছুট দেয় হরিণ-দম্পতি...
হরিণ! আমায় দেখে ভয় পেয়েছে!
মানুষই আমায় দেখে পালিয়ে যায় — বনের পশু তো ভয় পাবেই!
জঙ্গল ভেদ করে ফাঁকা মাঠের উপর এসে দাঁড়িয়েছে একটি মানুষ!
কিন্তু বনে কেবল হরিণ থাকে না...
ফাঁকা মাঠের মাঝখানে ঘন ঘাসের ভিতর থেকে একজোড়া হিংস্র চোখ তাকিয়ে থাকে পথিকের দিকে...
গররররর!
পথিক এগিয়ে চলে... হঠাৎ ভয় করে ভেসে আসে একটা অস্ফুট গর্জন ধ্বনি।

রক্তমাখা চাঁদ
এই আপদ আবার কোথা থেকে জুটল!...
ঘন ঘাসের ভিতর থেকে উঠে দাঁড়ায় একটা চিতাবাঘ — মৃগমাংসের পরিবর্তে নরমাংসেও বোধহয় তার অরুচি নেই!
গ্রররর!
গ·র·র·র·র!
খায় ব্যাটা! দেখি তোর দাঁতের ধার বেশী না আমার ছোরায় ধার বেশী!
বড় অসময়ে এলে হে স্যাঙাৎ! তা এস — তোমার দুঃখটা বা রাখি কেন?
গ·র·র·র!
বাঘ কিন্তু এগিয়ে আসে না -- বন্যপশুর তীব্র অনুভূতি দিয়ে সে বুঝে নিয়েছে এ শিকার খুব নিরীহ শিকার নয়। রাত বাড়তে থাকে - মানুষ ও বাঘ দুজনেই নিশ্চল, কেউ নড়ে না।

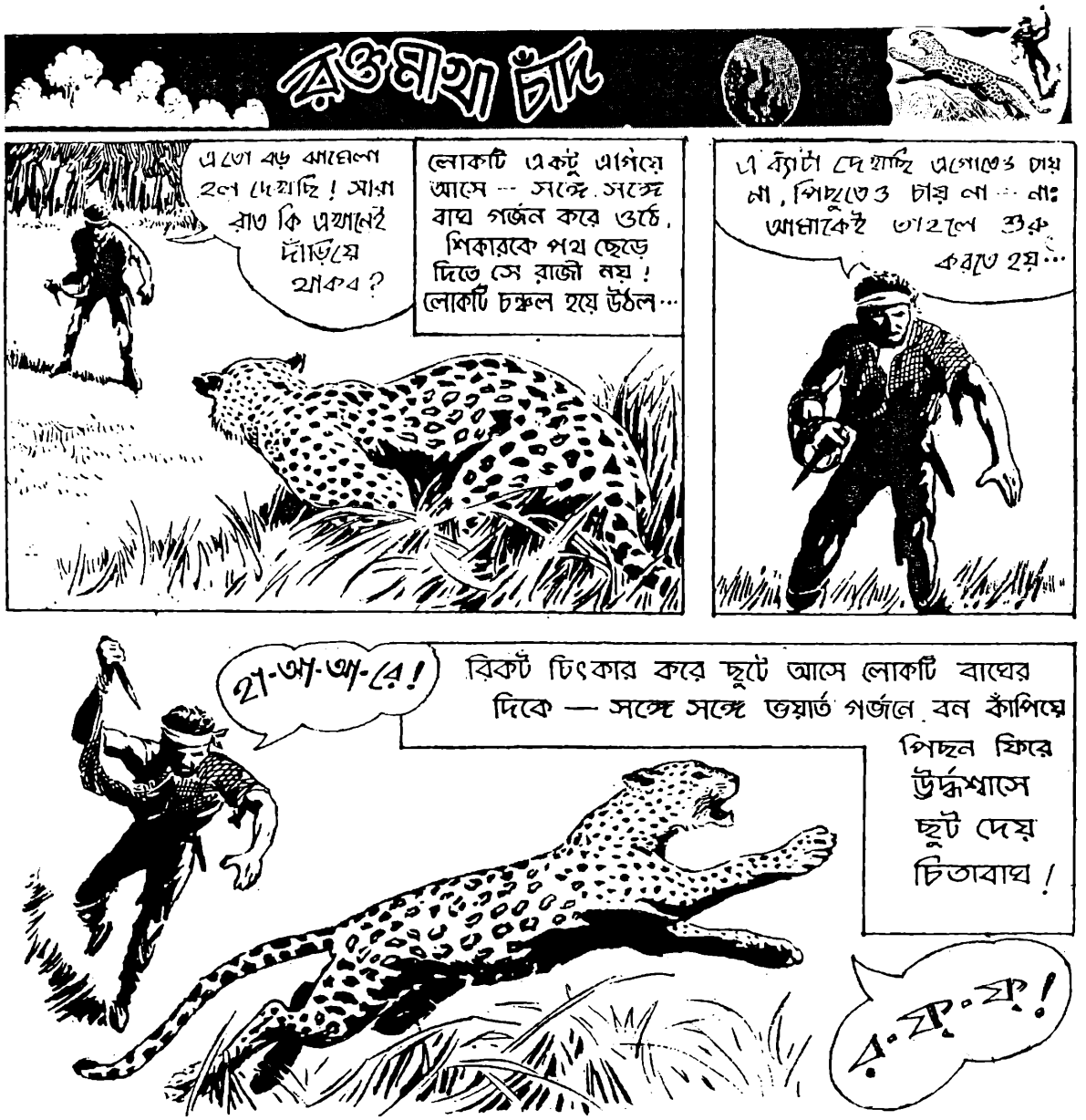
রক্তমাখা চাঁদ
এতো বড় ঝামেলা হল দেখছি! সারা রাত কি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব?
লোকটি একটু এগিয়ে আসে — সঙ্গে সঙ্গে বাঘ গর্জন করে ওঠে. শিকারকে পথ ছেড়ে দিতে সে রাজী নয়! লোকটি চঞ্চল হয়ে উঠল…
এ ব্যাটা দেখছি এগোতেও চায় না, পিছুতেও চায় না — নাঃ আমাকেই তাহলে শুরু করতে হয়…
হা-আ-আ-রে!
বিকট চিৎকার করে ছুটে আসে লোকটি বাঘের দিকে — সঙ্গে সঙ্গে ভয়ার্ত গর্জনে বন কাঁপিয়ে পিছন ফিরে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট দেয় চিতাবাঘ!
র-র-র!
ব্যাটার খুব আক্কুর জোর আছে — পালিয়ে বেঁচেছে!
কিন্তু চাঁদ সিং তোমার পালাবার পথ নেই!…
কে?
জঙ্গলের ভিতর গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে একটা বন্দুকের নল!

রক্তমাখা চাঁদ

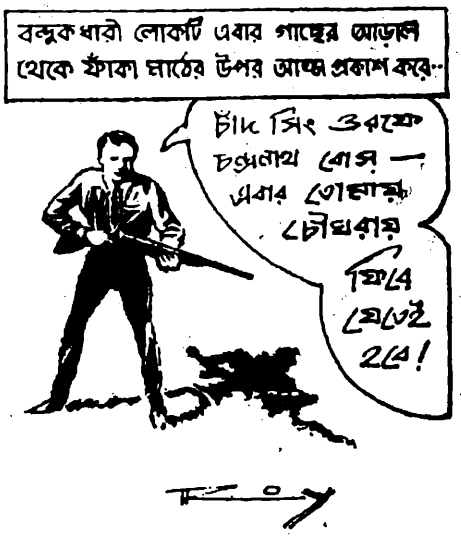
বন্দুকধারী লোকটি এবার গাছের আড়াল থেকে ফাঁকা মাঠের উপর আত্মপ্রকাশ করে...
চাঁদ সিং ওরফে চন্দ্রনাথ বোস — এবার তোমায় চৌঘরায় ফিরে যেতেই হবে!

ভূপতি মুখুয্যে! তুমি এই তরাই মুলুকেও এসে জুটেছ?

পুলিসে ঢুকে অবধি তোমার মত একটি হাড় জ্বালানো শয়তান দেখি নি। জালিয়াতি থেকে শুরু করে ডাকাতি পর্যন্ত কোন স্তরেই তোমার ঘাটতি নেই...

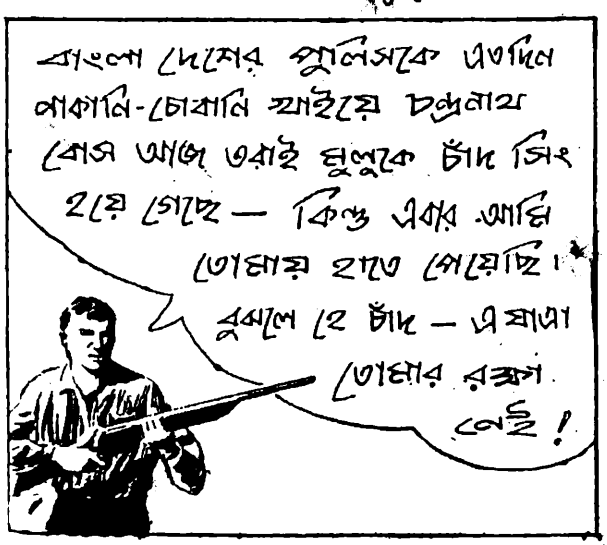
বাংলা দেশের পুলিসকে এতদিন নাকানি-চোবানি খাইয়ে চন্দ্রনাথ বোস আজ তরাই মুলুকে চাঁদ সিং হয়ে গেছে — কিন্তু এবার আমি তোমায় হাতে পেয়েছি। বুঝলে হে চাঁদ — এ যাত্রা তোমার রক্ষা নেই!

ওঃ! এখন বুঝছি চৌঘরার আস্তানায় তুমিই পুলিস নিয়ে আজ রাতে হানা দিয়েছিলে! তাই তো বলি এখানকার পুলিসের মাথায় এত বুদ্ধি কবে থেকে হল!... কিন্তু মুখুয্যে সাহেব, এই বনের মধ্যে তুমি এলে কোথা থেকে?

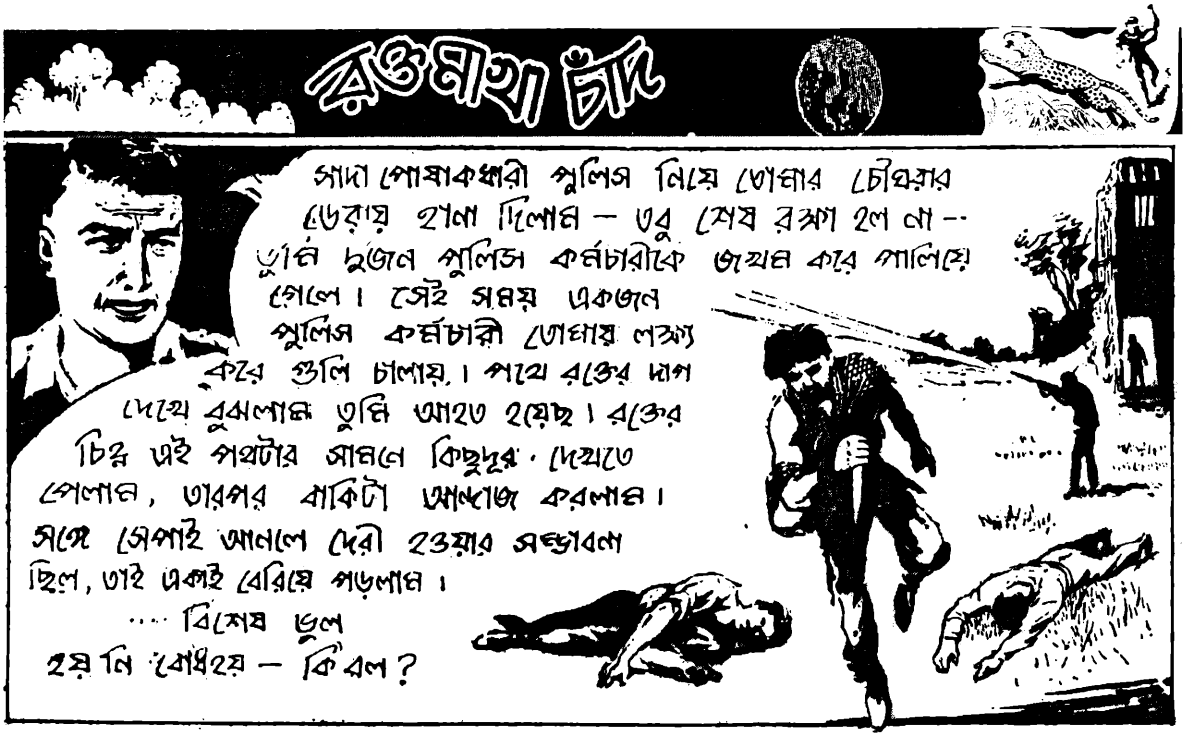
রক্তমাখা চাঁদ
সাদা পোষাকধারী পুলিস নিয়ে তোমার চৌহদ্দির ডেরায় হানা দিলাম — তবু শেষ রক্ষা হল না — তুমি দুজন পুলিস কর্মচারীকে জখম করে পালিয়ে গেলে। সেই সময় একজন পুলিস কর্মচারী তোমায় লক্ষ্য করে গুলি চালায়। পথে রক্তের দাগ দেখে বুঝলাম তুমি আহত হয়েছ। রক্তের চিহ্ন এই পথটার সামনে কিছুদূর দেখতে পেলাম, তারপর বাকিটা আন্দাজ করলাম। সঙ্গে সেপাই আনলে দেরী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তাই একাই বেরিয়ে পড়লাম।
.... বিশেষ ভুল হয় নি বোধহয় — কি বল?

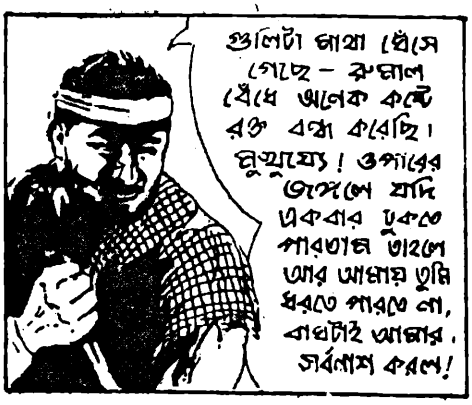
গুলিটা মাথা ঘেঁসে গেছে — রুমাল বেঁধে অনেক কষ্টে রক্ত বন্ধ করেছি। মুখুয্যে! ওপারের জঙ্গলে যদি একবার ঢুকতে পারতাম তাহলে আর আমায় তুমি ধরতে পারতে না, বাধাটাই আমার সর্বনাশ করল!

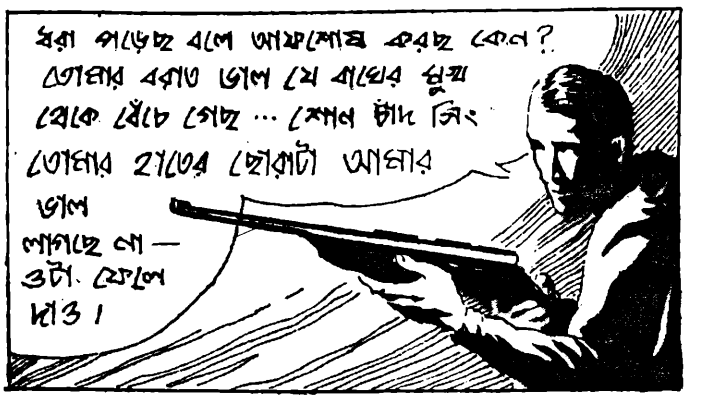
ধরা পড়েছ বলে আফসোস করছ কেন? তোমার বরাত ভাল যে বাঘের মুখ থেকে বেঁচে গেছ ... শোন চাঁদ সিং তোমার হাতের ছোরাটা আমার ভাল লাগছে না — ওটা ফেলে দাও!

এত ভয়! বেশ, ছোরা ফেলে দিলাম। আর বাঘের কথা বলছ? ওরকম দুচারটে গুলবাঘা আমি আছাড় মেরে শেষ করেছি। নেহাৎ তোমার হাতে বন্দুক, নাহলে...
তোমার গায়ের জোর আজ কোন কাজে লাগবে না চাঁদ সিং! এবার তোমার নিস্তার নেই!

মুখুয্যে! আমার কথা ভুলে যাও — নিজের প্রাণটা কি করে বাঁচাবে সেই কথা চিন্তা করো!

তার মানে? তুমি আমায় ভয় দেখাচ্ছ?
আমি ভয় দেখাচ্ছি না মুখুয্যে! সাক্ষাৎ মৃত্যু আজ আমাদের দিকে এগিয়ে এসেছে — তোমার পিছনদিকে চেয়ে দেখ!

রক্তমাখা চাঁদ

বুনো কুকুর!

বনের ভিতর থেকে মাঠের উপর এসে দাঁড়িয়েছে একদল বুনো কুকুর!

একমুহূর্তের জন্য চাঁদ সিংএর অস্তিত্ব ভুলে গেল গোয়েন্দা ভূপতি মুখুয্যে...
কী কিনা!

চাঁদ সিংএর বজ্রমুষ্টির আঘাতে অজ্ঞান হয়ে গেল ভূপতি আর সেই মুহূর্তে আক্রমণ করল বুনো কুকুরের দল!

ভূপতির বন্দুকটা তুলে নিয়ে প্রস্তুত হল চাঁদ সিং...

চাঁদ সিংএর লক্ষ্য অব্যর্থ!... কয়েকটা কুকুর রক্তাক্ত দেহ নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল...

ঙক! ঙক! হুয়াপ!

গুলি ফুরিয়ে গেল!... তা যাক — বন্দুকটা তো আছে। প্রথমে বাঘ, তারপর পুলিস, তারপর কুকুর!...

রক্তমাখা চাঁদ

চাঁদসিংএর হাতে বন্দুকটা ঘুঙুরের মত ঘুরতে লাগল। অল্প সময়ের মধ্যেই কুকুরের দল বুঝতে পারল এ বড় বিপদজনক শিকার — হতাহত সঙ্গীদের ফেলে তারা পিছন ফিরে ছুট দিল..

এবার বন্দুকটা দেবে?..

বন্দুকটা আর তোমার কাজে লাগবে না — এবার ওটা দেবে?
হুঁগ। ওটার কাজ হয়ে গেছে। কিন্তু মুখুয্যে, এতক্ষণে তোমার জ্ঞান হল?

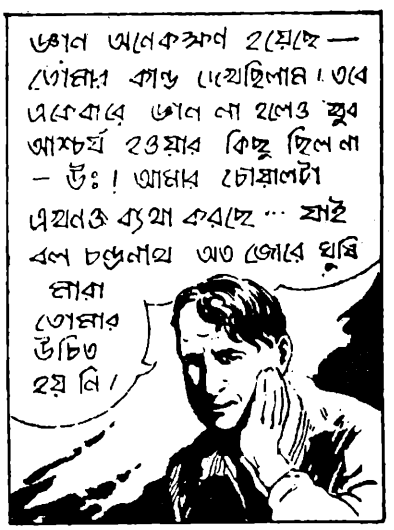
জ্ঞান অনেকক্ষণ হয়েছে — তোমার কাণ্ড দেখেছিলাম। তবে একেবারে জ্ঞান না হলেও খুব আশ্চর্য হওয়ার কিছু ছিল না — উঃ! আমার চোয়ালটা এখনও ব্যথা করছে... যাই বল চন্দ্রনাথ অত জোরে ঘুষি মারা তোমার উচিত হয় নি!

আমি সত্যি দুঃখিত। কিন্তু আর কোনও উপায় ছিল না... ওঃ! পূবের আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে, চাঁদ এখনই অস্ত যাবে। চলি মুখুয্যে! আবার দেখা হবে...

রক্তাক্ত দেহ নিয়ে বনের পথে অদৃশ্য হয়ে যায় চাঁদ সিং ওরফে চন্দ্রনাথ বোস..

তার গমনপথের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল গোয়েন্দা ভূপতি মুখুয্যে!
তারাই এর বলে আজ এক নতুন চাঁদ দেখলাম রক্তমাখা চাঁদ!

একনাম, অন্য মুখ

ম্যাকডোনাল্ড

জন ম্যাকডোনাল্ড ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে স্কটল্যান্ড থেকে ক্যানাডাতে এসে শিকারীর পেশা অবলম্বন করেছিল জন ম্যাকডোনাল্ড। নিহত পশুর চামড়া বিক্রী করে জীবিকা নির্বাহ করত। একদিন কয়েকটি জন্তু মেরে বস্তায় ঢাকা প্রান্তরের উপর দিয়ে জন যখন ফিরে আসছিল, সেই সময় হঠাৎ তার দিকে তেড়ে আসে তিনটি প্রমত্ত নেকড়ে। প্রথম নেকড়েকে গুলি করে, এবং দ্বিতীয়টাকে ছুরি চালিয়ে ঘায়েল করল জন। কিন্তু সঙ্গীদের শোচনীয় পরিনাম দেখেও যখন তৃতীয় নেকড়েটা নরমাংসের আশা ছেড়ে পালিয়ে যেতে রাজি হল না, তখন বন্দুকের বাঁটের সাহায্যেই শেষ শত্রুকে সাবাড় করল জন ম্যাকডোনাল্ড।

ডিক ম্যাকডোনাল্ড নিউ ইয়র্ক শহরের আকাশ-ছোঁয়া অট্টালিকার দেয়াল বেয়ে অনায়াসে উপরে উঠে যেতে পারত ডিক ম্যাকডোনাল্ড। একদিন সে একটি কুড়ি তলা বাড়ির দেয়াল বেয়ে ছাদে গিয়ে উপস্থিত হল। কিন্তু ঝকঝকে উরৈও তার 'উচ্চাভিলাষ' মিটল না। ছাদের উপর যে ত্রিশ ফুট লম্বা বাঁশটির মাথায় নিশান লাগান ছিল, সেই বাঁশ বেয়ে সে উপরে উঠতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল ওই বাঁশটির ডগায় নিজের মাথার টুপিটা ঝুলিয়ে দিয়েছে ডিক ম্যাকডোনাল্ড! সেই থেকে শহরের লোকে ডিকের নামকরন করল 'মানুষ-মাছি'।

এতিয়েন ম্যাকডোনাল্ড

১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে যেই সময় 'জ্যাকোবাইট বিদ্রোহ' নামক রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে, সেই সময় দেশত্যাগ করে ফ্রান্সে আশ্রয় নিয়েছিলেন এক ইংরেজ – নাম, ডাগলাস ম্যাকডোনাল্ড। এই ডাগলাসের ছেলে এতিয়েন ইংরেজ সন্তান হলেও ফ্রান্সকেই মাতৃভূমি বলে গ্রহণ করেছিল। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে এতিয়েন ফ্রান্সের সেনাদলে যোগ দেয়। ফরাসী বিপ্লবের পর সে নেপোলিয়নের বাহিনীতে ভর্তি হয়। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে 'মারেঙ্গো' রণাঙ্গনে সে ঘোড়ায় চ'ড়ে একদল অস্ট্রিয়ান সৈন্যের সম্মুখীন হয়, এবং সম্পূর্ণ একা তাদের বিধ্বস্ত করে শত্রুর পতাকা ছিনিয়ে নেয়। নেপোলিয়নের প্রত্যেকটি যুদ্ধেই তাঁর সঙ্গী ছিল এতিয়েন। এই বিশ্বস্ত কর্মচারীটিকে নেপোলিয়ন টারান্টোর ডিউক ও ফ্রান্সের মার্শাল-পদে নিযুক্ত করেছিলেন।

হেক্টর ম্যাকডোনাল্ড

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ ও আফগান যখন রক্তক্ষয় সংগ্রামে লিপ্ত, সেই সময় জনৈক ইংরেজ সার্জেন্ট নিঃসঙ্গ অবস্থায় একদল আফগান যোদ্ধা কর্তৃক আক্রান্ত হয়। সে যাচ্ছিল বৃটিশ কমান্ডার-ইন-চীফের কাছে দরকারী কাগজপত্র নিয়ে। হঠাৎ পথের মধ্যে আফগানদের হামলা! সার্জেন্ট [illegible] পেলনা। অদ্ভুত বীরত্বের সঙ্গে লড়াই [illegible] সে একাই সমস্ত দলটাকে [illegible] এই বীরপুরুষটি ছিল বৃটিশ [illegible] 'গর্ডন হাইল্যান্ডার' ডিভিজনের [illegible] নাম – হেক্টর ম্যাকডোনাল্ড।

দৈবরথ সমুদ্রবক্ষে

সাত সাগরের বুকে জাহাজ ভাসিয়ে যে-সব দস্যু অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসের পৃষ্ঠা রক্তাক্ত করে তুলেছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর হচ্ছে এডওয়ার্ড টিচ ওরফে ব্ল্যাক বিয়ার্ড। দুর্ধর্ষ জলদস্যুরাও ঐ ভয়ংকর মানুষটিকে যমের মতো ভয় করত। ক্রুদ্ধ হলে তার হাতে শত্রু-মিত্র কারও রক্ষা ছিল না। দানবের মতো শক্তিমান ঐ দস্যুনেতা দলকে পরিচালনা করত কঠোর হস্তে। দ্বন্দ্বযুদ্ধে সে ছিল দুর্জয় যোদ্ধা...

একদিন ব্ল্যাক বিয়ার্ডের বোম্বেটে-জাহাজকে আক্রমণ করল ইংল্যাণ্ডের রাজকীয় নৌবাহিনীর দুটি যুদ্ধজাহাজ...

কিছুক্ষণ গোলাবর্ষণের পর ব্ল্যাক বিয়ার্ড তার জাহাজ ভিড়িয়ে দিল শত্রুপক্ষের একটি জাহাজের গায় — শুরু হল ভয়ংকর হাতাহাতি লড়াই... অবশেষে মেনার্ডের তরবারির আঘাতে মৃত্যুবরণ করল দস্যুনেতা ব্ল্যাক বিয়ার্ড!

দ্বৈরথ অরণ্যগর্ভে

উনবিংশ শতকে ভারতে এসেছিলেন এক শ্বেতাঙ্গ শিকারী — **জেমস ইংলিস**। ভাগলপুর ও পূর্ণিয়ার মধ্যবর্তী অরণ্যে **ব্যাঘ্র** ও **বন্যবরাহের** দ্বন্দ্বযুদ্ধ স্বচক্ষে দেখেছিলেন তিনি। সেটা **খাদ্য-খাদকের** লড়াই ছিল না, সেটা ছিল **ইজ্জতের লড়াই**!

দূরে বাঘের গর্জন শুনে তীব্র চিৎকারে নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করে শ্বাপদকে '**চ্যালেঞ্জ**' জানিয়েছিল বরাহ।

সেই রণ-আহ্বান শুনে ছুটে এসেছিল বাঘ, ঝাঁপিয়ে পড়েছিল শুয়রের উপর। কিন্তু যুদ্ধের পরিণাম কারও পক্ষেই ভালো হয় নি — পরস্পরকে আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করতে করতে একসময়ে রক্তাক্ত শরীরে **মৃত্যুশয্যায়** লুটিয়ে পড়ল **দুই প্রতিদ্বন্দ্বী**।

ইতিহাসে

অস্ত্র

"ইংলিশ লংবো"

১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে আগস্ট মাসের ২৬ তারিখে ফরাসী সেনাবাহিনী ক্রেসির রণক্ষেত্রে ইংরেজ সেনার হাতে দারুণ মার খেয়ে পালিয়ে গেল। বর্মাবৃত ফরাসী অশ্বারোহী বাহিনী বার বার ধেয়ে এসেছে শত্রুর দিকে আর আকাশ অন্ধকার করে ইংরেজ সেনার অজস্র তীর উড়ন্ত মৃত্যুর মতো বার বার কামড় বসিয়েছে নির্ভুল নিশানায় — ফরাসী অশ্বারোহীদের লৌহবর্ম ইংরেজ ধানুকীর তীরকে প্রতিরোধ করতে পারে নি, বর্মভেদ করে নিক্ষিপ্ত তীর বর্মধারীদের মৃত্যুশয্যায় শুইয়ে দিয়েছে বারংবার!...

"নাইট" আখ্যায় ভূষিত বর্মধারী অশ্বারোহী বাহিনীর দর্পচূর্ণ করে যে-অস্ত্রটি বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল, সেই অস্ত্রের নাম "ইংলিশ লংবো"। তীরধনুক বহুযুগ ধরেই মানুষ ব্যবহার করে এসেছে, কিন্তু তীরন্দাজদের তীর পূর্বোক্ত নাইটদের বর্মভেদ করতে পারত না। তাই অশ্বারোহী বর্মাবৃত নাইটরা ছিল পদাতিক সৈন্যের কাছে মূর্তিমান মৃত্যুর মতো ভয়াবহ। কিন্তু ক্রেসির যুদ্ধে ইংরেজ সেনার "লংবো" ফরাসী নাইটদের চমকে দিল...

ইতিহাসে অস্ত্র

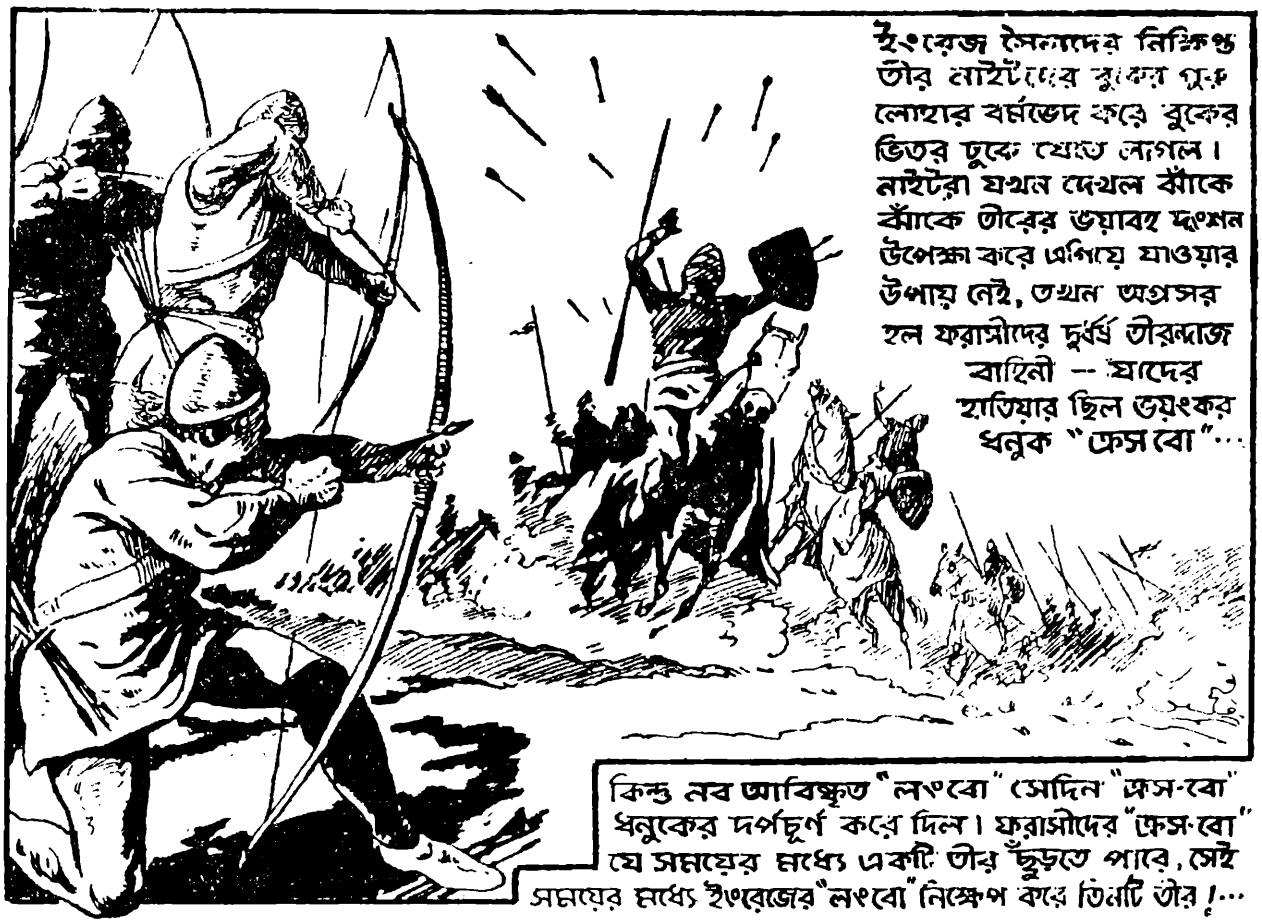

অতএব কিছুক্ষণের মধ্যেই পরাজিত হয়ে "ক্রস-বো" হাতে ফরাসী তীরন্দাজের দল ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে ফরাসী অশ্বারোহী বাহিনীর পিছনে আশ্রয়গ্রহণ করল। বিজয়লক্ষ্মীর বরমাল্য সেইদিন ছিনিয়ে আনল ইংরেজের আবিষ্কৃত আয়ুধ "লংবো"। সাধারণ ধনুকের দৈর্ঘ্য চার ফুটের বেশী ছিল না, কিন্তু ইংলিশ লংবো ছিল ছয় ফুট দীর্ঘ!...

লংবো ধনুকের জ্যা বা ছিলা খুব ভারি আর শক্ত। জোরে টান দিলে ৩০ ইঞ্চি পর্যন্ত বিস্তৃত হতো ঐ ধনুকের জ্যা। নিপুণ ধানুকীর হাত থেকে নিক্ষিপ্ত বাণ যে-ধাক্কা মেরে লক্ষ্যস্থলে বিদ্ধ হতো, সেই ধাক্কার ওজন ৫০ পাউণ্ড। পাকা তীরন্দাজ ২০০ গজ দূর থেকে মিনিটে ২০টি তীর ছুঁড়ে লক্ষ্যবস্তুকে বিদ্ধ করতে পারত।

ইতিহাসে বোমা

নেপোলিয়নের বেলুন-বাহিনী

কামান আবিষ্কৃত হওয়ার পর বহুদূর থেকে নির্ভুলভাবে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে গোলাবর্ষণ করার উপায় নিয়ে গবেষণা চলতে থাকে। অবশেষে ১৭৯৪ সালে জুন মাসের ২ তারিখে উপায়টি আবিষ্কৃত হয়। পূর্বোক্ত তারিখে অস্ট্রিয়ার সেনাদল যখন ফ্লাণ্ডার্সের 'মবো' রণাঙ্গনে ফরাসী বাহিনীকে লক্ষ্য করে অগ্রসর হচ্ছে, সেইসময় হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো তাদের উপর পড়তে লাগল অজস্র কামানের গোলা! অস্ট্রিয়ার সৈন্যদল চমকে গেল—শত্রু অদৃশ্য, কিন্তু গোলা পড়ছে নির্ভুল লক্ষ্যে...

ফরাসী বাহিনীর পিছনে শূন্যে ভাসমান বেলুনটি কয়েকজন অস্ট্রিয়ার সৈনিকের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করেছিল, কিন্তু ঐ বেলুনটি থেকেই যে গোলন্দাজদের গোলাবর্ষণের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে সেকথা কেউ বুঝতে পারে নি। হ্যাঁ, ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে জুন মাসের ২ তারিখে সর্ব-প্রথম আকাশচারী বেলুন থেকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে কামান দাগার নির্দেশ দেওয়া হয়

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ফ্রান্সের কামানধারী গোলন্দাজ বাহিনীর অফিসার হয়ে জীবন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং 'মবো' রণাঙ্গনে বেলুনের সাফল্য দেখে উৎসাহিত হয়ে দুটি পর্যবেক্ষক বেলুন-বাহিনী গঠন করেছিলেন। পরবর্তীকালে নেপোলিয়নের কামানধারী সৈন্যদল পর্যবেক্ষক বেলুনের নির্দেশ অনুসারে বহু রণক্ষেত্রে গোলাবর্ষণ করে। ঐ গোলাবর্ষণের ফল হয়েছিল অতিশয় সন্তোষজনক।

নেপোলিয়নের বেলুন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে জার্মানী ব্যাপকভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে বেলুন ব্যবহার শুরু করে...

ইতিহাসে যুদ্ধ
রণহস্তী
২১৮ খৃষ্টপূর্বাব্দে 'ক্যানে' রণক্ষেত্রে রোমান সৈনিকরা সভয়ে দেখল সচল পাহাড়ের মতো এক ধরনের জন্তুর পিঠে চড়ে কার্থেজের সেনাদল তাদের আক্রমণ করছে। হানিবলের নেতৃত্বে কার্থেজের সৈন্যদল রোমের বাহিনীকে আক্রমণ করেছিল। কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর রোমান সৈনিকদের মনোবল ভেঙে পড়ল, রণক্ষেত্র ত্যাগ করে তারা পলায়ন করল…
ইউরোপের বুকে রণহস্তীর ব্যবহার ঐ যুদ্ধেই শেষ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে ইউরোপের কোন যুদ্ধে আর হাতী ব্যবহার করা হয় নি। তবে ভারতবর্ষে বহুকাল পর্যন্ত রণহস্তীর ব্যবহার প্রচলিত ছিল। আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর হাতীর সাহায্যে গুরুভার কামান একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় টেনে নিয়ে যাওয়া হতো…

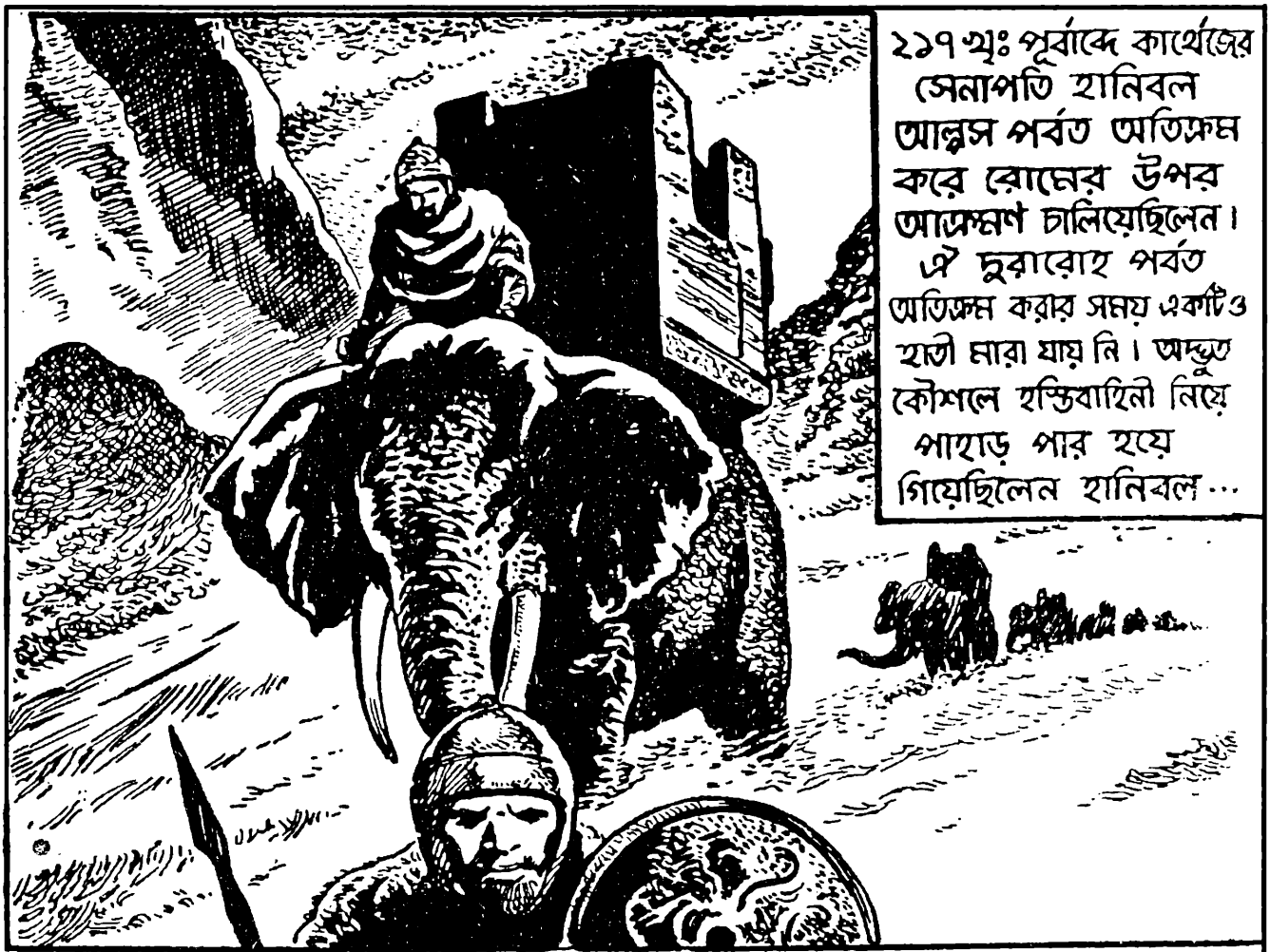

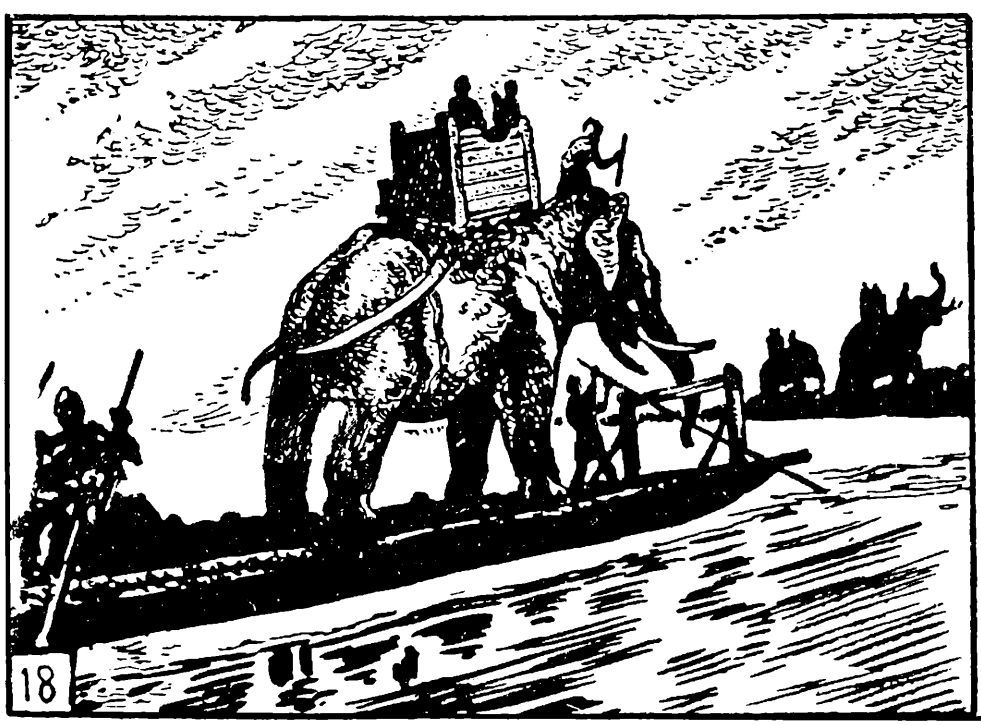

হানিবলের হাতীগুলি ছিল আফ্রিকার জানোয়ার। স্পেন থেকে স্থলপথে জন্তুগুলিকে নিয়ে আসা হয়েছিল। গভীর ও প্রশস্ত নদী পার হওয়ার সময় বিরাট বিরাট ভেলা তৈরী করে ঐসব ভেলার সাহায্যে হাতীগুলিকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।

ইতিহাসে অস্ত্র

প্রথম রকেট

মূর্তিমান মৃত্যুর মতো হানা দিল চেঙ্গিস খানের তাতারবাহিনী মহাচীনের বুকে – দিকে দিকে জ্বলে উঠল লেলিহান অগ্নি, নররক্তে সিক্ত হল ধরিত্রী – চীনাসৈনিকদের প্রতিরোধ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল দুর্জয় তাতারসেনার আক্রমণে। চীনাদের নিক্ষিপ্ত তীর তাতারসৈন্যের লৌহবর্মের স্থূল আবরণ ভেদ করতে পারল না, তাই বছরের পর বছর ধরে চীনের উপর চলতে লাগল চেঙ্গিসের সৈন্যদের ধ্বংসলীলা। কিন্তু ১২২০ খৃষ্টাব্দে মহাচীনের এক রণাঙ্গনে আক্রমণোদ্যত তাতারসেনার জয়োল্লাসকে ডুবিয়ে দিয়ে চীনাসৈনিকদের ভিতর থেকে জেগে উঠল পর পর কয়েকটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ – সঙ্গে সঙ্গে শূন্যপথে ঝাঁকে ঝাঁকে বল্লম ছুটে এল তাতারসেনার দিকে...

বল্লমে বিদ্ধ হয়ে বহু তাতারসৈনিক মৃত্যুবরণ করল। নিক্ষিপ্ত বল্লমগুলি অনায়াসেই বর্মভেদ করে মর্মস্থানে আঘাত করতে লাগল দুর্ধর্ষ তাতারবাহিনী আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে পলায়ন করল। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আবির্ভূত হল রকেট বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে বাঁশকে অদাহ্য পদার্থে রূপান্তরিত করে তার ফাঁপা কাণ্ডের ভিতর বারুদ রাখা হতো। বাঁশের এক প্রান্তে লাগিয়ে দেওয়া হতো ধারাল লোহার ফলা এবং আর এক প্রান্তে লাগানো হতো একটি কাগজের পলিতা। ঐ পলিতায় অগ্নিসংযোগ করলেই বারুদ ফেটে গিয়ে বল্লমকে নিক্ষেপ করত সামনের দিকে। সেই প্রকাণ্ড বল্লমের প্রচণ্ড গতিবেগ রোধ করতে পারে এমন কোন বর্ম সেই যুগে তৈরী হয়নি।

চীনদেশে সাফল্য অর্জন করার পর রকেট-বল্লম আবির্ভূত হল ইউরোপের বুকে। ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে ভেনিসের বাসিন্দারা জেনোয়া আক্রমণ করল এবং রকেট-বল্লমের সাহায্যে জেনোয়াবাসীর প্রতিরোধ চূর্ণ করে দিল।

জার্মানী ও ফ্রান্সের মধ্যে সংঘটিত ত্রিশ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধে উভয়পক্ষই এই সাংঘাতিক অস্ত্রটি ব্যবহার করেছিল। ঐ সময়ে অস্ত্রটির যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছিল। একটি চামড়ার নলের ভিতর বারুদ ভরে আগুন লাগিয়ে দিলে নলটি আধমাইল পর্যন্ত উড়ে গিয়ে শত্রুকে আঘাত করতে সমর্থ ছিল। নলের সম্মুখভাগে লৌহফলকের পরিবর্তে থাকত ১৬ পাউণ্ড ওজনের একটি বোমা। বোমার সম্মুখে অবস্থিত বিস্ফোরকটি কঠিন বস্তুতে আঘাত পেলেই সশব্দে ফেটে গিয়ে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করত। সব মিলিয়ে সম্পূর্ণ রকেটটির ওজন ছিল প্রায় ১২০ পাউণ্ড।

প্রথম যুদ্ধরথ
৫০০০ বৎসর আগেকার কথা।
ইতিহাসে অস্ত্র
মিশর-অধিপতি ফ্যারাওএর সেনাবাহিনী যখন মিশরের মরুভূমির বুকে হিটাইট জাতির বিপুল বাহিনী কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে মৃত্যুপণ যুদ্ধে ব্যাপৃত এবং কয়েকঘন্টা যুদ্ধের পর মিশরসেনা যখন বিপর্যয়ের সম্মুখীন — সেইসময় হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠল মাটি, ধূলির মেঘে ছেয়ে গেল আকাশ! সেই ধূলির রাশি সরে যেতেই দেখা গেল অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত একদল মিশরের সৈনিক এসে উপস্থিত হয়েছে রণস্থলে! নূতন দলটি এসে পড়ায় যুদ্ধের অবস্থা বদলে গেল, কিছুক্ষণের মধ্যেই পর্যুদস্ত হিটাইট-বাহিনী রণক্ষেত্র ত্যাগ করে পলায়ন করল তীরবেগে। যথা-সময়ে সাহায্য না পেলে সেইদিন ফ্যারাওএর মিশর-বাহিনীর পরাজয় ছিল অনিবার্য...

রথের চাকায় ধুলো উড়িয়ে আর ঘর্ঘর শব্দে মাটি কাঁপিয়ে নূতন সৈন্যদল এসে পৌঁছেছিল সঙ্গীন মুহূর্তে। রথারোহী ঐ সেনাদল যথাসময়ে এসে পড়ায় চরম বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেল মিশরাধিপ ফ্যারাওএর সেনাবাহিনী। প্রাচীন যুগে কবে কখন যে মানুষ রথের সাহায্য গ্রহণ করতে শিখেছিল, সে-কথা সঠিকভাবে বলা মুস্কিল। তবে মিশরই যে সর্বপ্রথম যুদ্ধক্ষেত্রে রথ ব্যবহার করেছিল এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তারা সাধারণতঃ সৈন্যদলের দ্রুত যাতায়াতের জন্যই রথ ব্যবহার করত। দীর্ঘপথ দ্রুতবেগে অতিক্রম করার পরেও রথারোহী সৈন্যদল একটুও পরিশ্রান্ত হতো না। যথাস্থানে উপস্থিত হয়েই রথ থেকে নেমে তারা শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ত মহোৎসাহে। তবে সর্বদাই যে যাতায়াতের জন্য রথের ব্যবহার হতো তা নয়, কখনও কখনও মিশরের সেনাদল রথের উপর থেকে ভল্ল ও ধনুর্বাণ নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতো। পরবর্তীকালে রোমানরাও রথের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করেছিল। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তারা খুব কম সময়েই রথ ব্যবহার করত। রথচালনা ছিল রোমানদের কাছে খেলাধুলার একটি প্রধান অঙ্গ। প্রাচীন রোমের নাগরিকদের কাছে রথের দৌড় প্রতিযোগিতা ছিল অতিশয় প্রিয়। অর্থাৎ রথকে রোমানরা যুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার চাইতে ক্রীড়ার উপকরণ-স্বরূপ ব্যবহার করতেই বেশী ভালবাসত।

সর্বকালে সর্বদেশে ব্যবহৃত যাবতীয় যুদ্ধরথের ভিতর সবচেয়ে ভয়ংকর ছিল বৃটিশ-রাণী বর্ডিসিয়ার রথ। ঐ রথ ব্যবহার করা হয়েছিল রোমান সৈন্যদের বিরুদ্ধে। চাকার দুঁধারে বসানো কাস্তের মতো ধারাল লৌহফলক শত্রুসেনার মধ্যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করত।

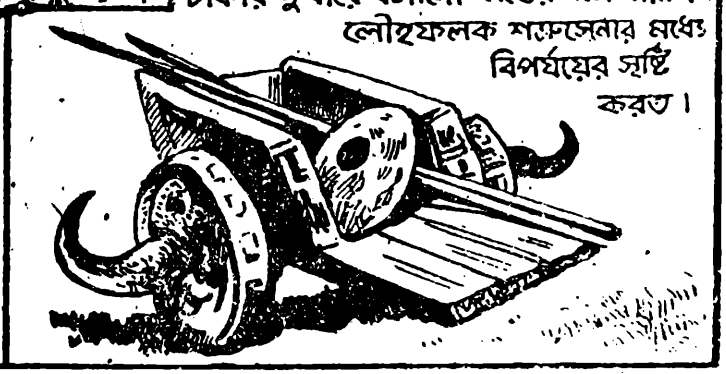

ইতিহাসে পলাতক

আমেরিকাতে যখন গৃহযুদ্ধ চলছিল, সেই সময়ে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর কর্নেল রোজ ও মেজর হ্যামিল্টন শত্রু-পক্ষের হাতে বন্দী হয়েছিলেন — 'লিবি' অঞ্চলে 'কনফেডারেট মিলিটারি প্রিজন' নামক বন্দীশালায় তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ..

যে ঘরে তাঁদের বন্দী করে রাখা হয়েছিল, সেই ঘরের পাশেই আর একটি শূন্য কারাকক্ষ ছিল ...

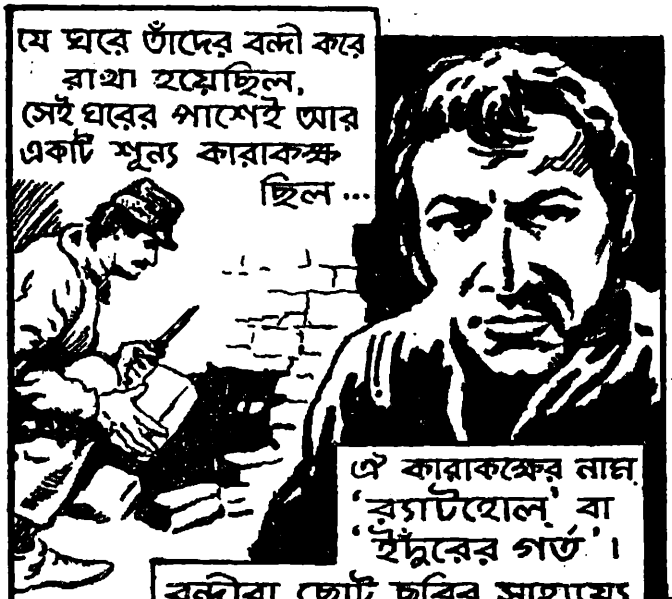

ঐ কারাকক্ষের নাম 'র‍্যাটহোল' বা 'ইঁদুরের গর্ত'।

বন্দীরা ছোট ছুরির সাহায্যে ইঁট সরিয়ে নিজেদের ঘর থেকে পার্শ্ববর্তী 'ইঁদুরের গর্তে' যাওয়ার পথ তৈরী করলেন ...

'ইঁদুরের গর্তে' ঢুকে মেঝে খুঁড়ে সুড়ঙ্গ তৈরী করে পলায়নের সঙ্কল্প করেছিলেন দুই বন্দী। পরিত্যক্ত ঘরটিতে একটি পুরানো কোদাল ছিল। ঐ কোদাল দিয়েই প্রবল উৎসাহে সুড়ঙ্গ খননের কাজ চলল।

ঐ ঘরে অবস্থিত পুরাতন 'প্যাকিং বাক্সের' মধ্যে লুকিয়ে রাখা হত খুঁড়ে-ফেলা-মাটি ...

দিনের বেলা যখন বন্দীদের নাম ডাকতে প্রহরী কারাকক্ষে আসত, সেইসময়ে একটি টেবিল সরিয়ে গর্তের মুখ ঢেকে রাখতেন দুই বন্দী। হঠাৎ এক দিন অসময়ে একদল প্রহরী কারাকক্ষ তল্লাশ করতে এল। 'ইঁদুরের গর্ত' থেকে নিজেদের ঘরে চাবি খোলার শব্দ পেয়ে দুই বন্দী চটপট স্বস্থানে ফিরে এলেন — একটুর জন্যে বেঁচে গেলেন তাঁরা ...

খননকার্য যখন চলত, সেইসময়ে গর্তের ভিতর জ্বলত একটি ছোট মোমবাতি। অসহ্য গরমে গায়ে জামা রাখা সম্ভব ছিল না, তাই খননকারীর দেহের ঊর্ধ্বাংশ থাকত অনাবৃত…
ছয় সপ্তাহ ধরে খনন-কার্য চালিয়ে যাওয়ার পর একরাতে সুড়ঙ্গের মুখ ভেঙে পড়ল। গর্তের ফাঁকে খননকারী মেজর হ্যামিল্টন দেখলেন রাতের আকাশে জ্বলছে ভাসমান চন্দ্র…
জামাকাপড় পরে পালাতে গিয়ে তাঁরা দেখলেন বন্দীশালার বাইরে সুড়ঙ্গের মুখ তৈরী হয় নি, বহির্গমনের পথ তৈরী হয়েছে কারাগারের ভিতর দিকে এবং পলায়নের পথ রুদ্ধ করে পায়চারি করছে জনৈক সশস্ত্র প্রহরী…
হঠাৎ পিছন থেকে প্রহরীর মাথায় কোদালের বাড়ি মেরে তাকে অজ্ঞান করে ফেললেন কর্নেল রোজ…
তারপর অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে বেড়া ডিঙিয়ে পালাতে আর কতক্ষণ?

ইতিহাসে পলাতক

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ফ্রান্সের বিপ্লবীদল কর্তৃক সংগঠিত বিচার-সভায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ৭২জন বন্দীকে ভূগর্ভে অবস্থিত 'লিয়ন' নামক কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। পরের দিন খুব সকালে 'গিলোটিন' যন্ত্রে তাদের মস্তকচ্ছেদন হওয়ার কথা...

অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে এগিয়ে গেল জিরাঁদ… অতর্কিতে শাণিত ছুরিকার আঘাতে লুটিয়ে পড়ল প্রহরী…
সঙ্কীর্ণ বারান্দার শেষপ্রান্তে অবস্থিত একটি দরজা ভেঙ্গে কারাগারের প্রাঙ্গনে এসে পড়ল পলাতকের দল। সকাল হলেই প্রহরীরা দরজা খুলবে– পলাতকরা স্থির করল সেই সময়ে যাতায়াতকারী জনতার ভিড়ে আত্ম-গোপন করে তারা সরে পড়বে…
কারাগারের প্রধান দরজা খুলতেই অফিসার এবং ব্যবসায়ীর দল যাতায়াত শুরু করল। দুজন তিনজন করে একদল বন্দী ভিড়ের মধ্যে মিশে কারাগার থেকে পালিয়ে গেল…
দরজার সামনে এসে পোরেল দেখল একটি প্রহরী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে জনতার গতিবিধি লক্ষ্য করছে – পোরেল এগিয়ে এসে সহজভাবে প্রহরীর সঙ্গে কথা বলতে লাগল…
বেশ কয়েকমিনিট ধরে সন্দিহান প্রহরীর সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে গেল পোরেল, সেই সুযোগে পলায়ন করল আরও একদল বন্দী। ঘন্টাখানেকের মধ্যে ৭২ জন বন্দীর প্রত্যেকেই বন্দীশালা থেকে পলায়ন করল। ব্যাপারটা জানাজানি হতেই এক বিরাট প্রহরীদল নিয়ে অনু-সন্ধান শুরু হল। কিন্তু হায়! হায়! অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পলাতক বন্দীদের সন্ধান পাওয়া গেল না…
জিরাঁদ, বার্থো আর পোরেল পলায়ন করেছিল নারীর ছদ্মবেশে!

ইতিহাসে পলাতক
ফ্রেডরিক অব প্রুশিয়ার অন্যতম দেহরক্ষী ফ্রীডরিখ ব্যারন ফন ডার ট্রেংক একটি অপরাধের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে সে কারারক্ষককে ঘুষ দিয়ে পালিয়ে গিয়ে অস্ট্রিয়ার সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে সে আবার দেশে ফিরে আসে – সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেপ্তার করে মাগডেবুর্গ দুর্গে নিয়ে যাওয়া হয়…
মাগডেবুর্গ দুর্গের ভিতর থামের সঙ্গে তাকে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল। কিন্তু ফ্রীডরিখ তবু মুক্তিলাভের আশা ত্যাগ করল না…
শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে পাতালঘরের উপরদিকে সুরঙ্গ খুঁড়ে দুর্গসীমানার বাইরে পলায়নের সঙ্কল্প করল ফ্রীডরিখ। জলপান করার জন্য তাকে যে লোহার বাটি দেওয়া হয়েছিল সেই বাটি, আর দরজা থেকে খুলে নেওয়া একটি পেরেকের সাহায্যে সে সুড়ঙ্গ খুঁড়তে সচেষ্ট হল…
সে উন্মাদের মতো আচরণ শুরু করল। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর তার পাগলামির অভিনয় দেখে দুর্গাধিপ ভাবলেন লোকটা সত্যিই পাগল হয়ে গেছে – তাঁর আদেশে ফ্রীডরিখকে শৃঙ্খল মুক্ত করা হল…

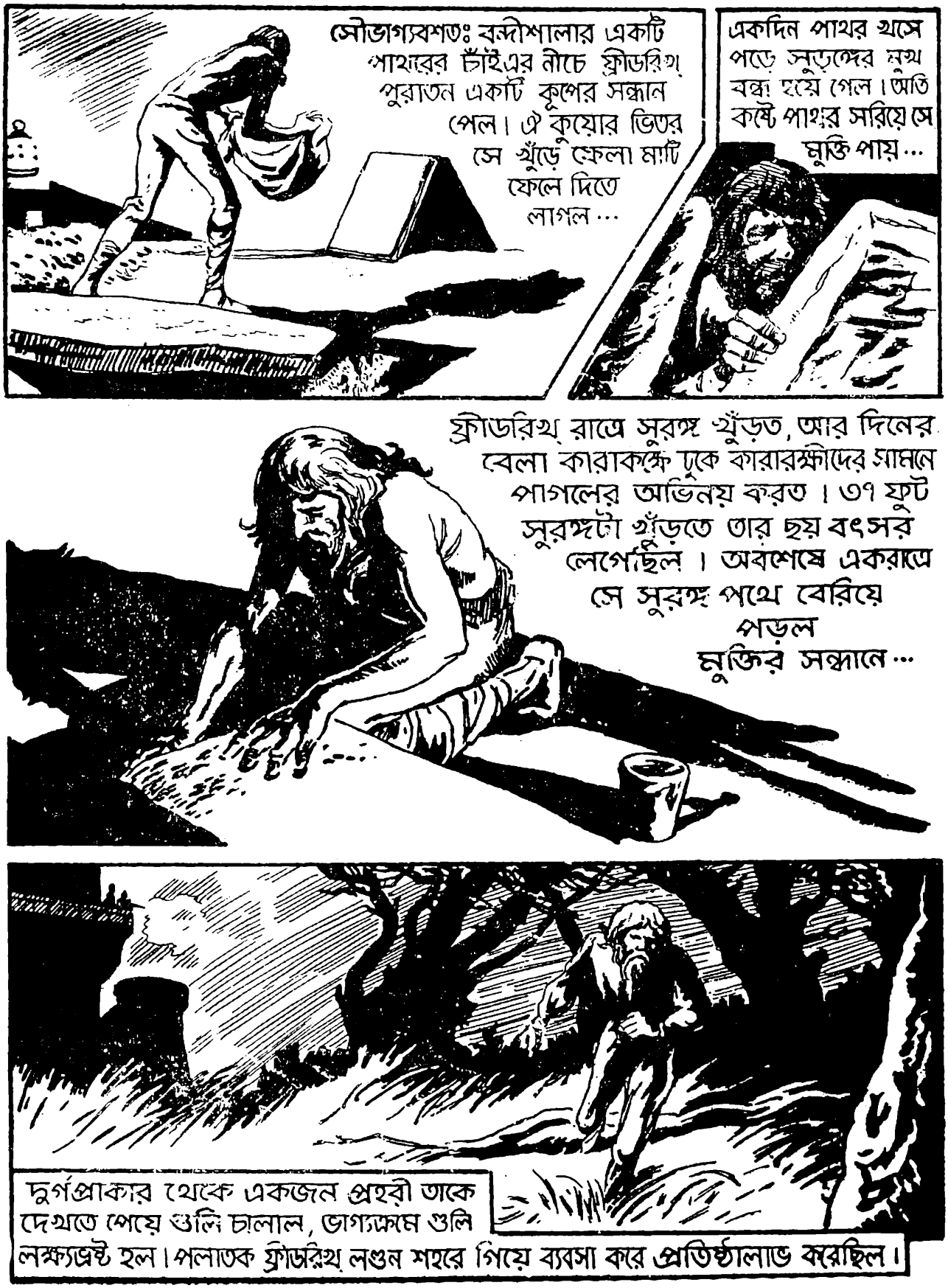
সৌভাগ্যবশতঃ বন্দীশালার একটি পাথরের চাঁইএর নীচে ফ্রীডরিখ্ পুরাতন একটি কূপের সন্ধান পেল। ঐ কুয়োর ভিতর সে খুঁড়ে ফেলা মাটি ফেলে দিতে লাগল…
একদিন পাথর খসে পড়ে সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ হয়ে গেল। অতি কষ্টে পাথর সরিয়ে সে মুক্তি পায়…
ফ্রীডরিখ্ রাত্রে সুরঙ্গ খুঁড়ত, আর দিনের বেলা কারাকক্ষে ঢুকে কারারক্ষীদের সামনে পাগলের অভিনয় করত। ৩৭ ফুট সুরঙ্গটা খুঁড়তে তার ছয় বৎসর লেগেছিল। অবশেষে একরাত্রে সে সুরঙ্গ পথে বেরিয়ে পড়ল মুক্তির সন্ধানে…
দুর্গপ্রাকার থেকে একজন প্রহরী তাকে দেখতে পেয়ে গুলি চালাল, ভাগ্যক্রমে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। পলাতক ফ্রীডরিখ্ লণ্ডন শহরে গিয়ে ব্যবসা করে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল।

ইতিহাস পলাতক

সোভিয়েট রুশিয়ার বৈমানিক লেফটেন্যান্ট মাইকেল দেভিয়াতাইয়েফ জার্মানদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী। প্রুশিয়ার পূর্ব সীমান্তে তাঁর বিমানকে ভূপাতিত করে জার্মানরা তাঁকে বন্দী করেছিল। দেভিয়াতাইয়েফ কয়েকবার বন্দীশালা থেকে পালাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। 'শুইনেমুণ্ড' নামে যে বন্দীশালা-তে দুর্দান্ত বন্দীদের রাখার ব্যবস্থা ছিল, সেইখানে তখন দেভিয়াতাইয়েফকে জার্মানরা পাঠিয়ে দিল ...

হঠাৎ প্রহরীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বন্দীর দল...
অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে জার্মান প্রহরীরা হাতের অস্ত্র ব্যবহারের সুযোগ পেল না। তারা পরাজিত হল। এর মধ্যে দেভিয়াতাইয়েফ চটপট দেখে নিলেন বিমানটিতে যথেষ্ট তেল মজুত আছে...
শত্রু বিমানটিকে অধিকার করে পলাতকরা তৎক্ষণাৎ আকাশপথে যাত্রা করলেন। তলা থেকে বিমান-বিধ্বংসী কামান চালিয়েও বিমানটিকে ঘায়েল করতে পারল না জার্মানরা — তখন একটি 'ফাইটার' বিমান উপরে উঠে পলাতক বিমানকে আক্রমণ করল ... কিন্তু একটু পরেই পলাতকদের বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত গুলিতে বিদ্ধ হয়ে আক্রমণকারী বিমানটি ধ্বংস হয়ে গেল...
ঘন্টা তিনেকের মধ্যেই তেল ফুরিয়ে গেল। বিমানটিকে তাড়াতাড়ি রুশ এলাকার মধ্যে একটা মাঠের উপর নামিয়ে ফেলা হল। রুশ সৈনিকরা ছুটে এসে সবিস্ময়ে দেখল জার্মান-বিমানের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে তাদেরই দলের মানুষ!

ইতিহাসে পলাতক
১৯৪১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে জার্মান প্যারাট্রুপার বাহিনীর হাতে বন্দী হল বৃটিশ সেনাবিভাগের 'ল্যান্স-কর্পোর‍্যাল' আর্নল্ড ও 'প্রাইভেট' উডওয়ার্ড। পূর্বোক্ত দুই সৈনিককে গ্রীসে বন্দী করা হয়েছিল। কিন্তু তারা বার বার পালানোর চেষ্টা করছিল বলে জার্মানরা তাদের পাঠিয়ে দিল অস্ট্রিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার সীমান্তে অবস্থিত এক ভয়ংকর কারাগারে...
১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বন্দীরা পেরেকের সাহায্যে কারাগারের জানালা থেকে দুটি গরাদে খুলে নিল...
লোহার গরাদ দুটিকে প্যান্টের ভিতর লুকিয়ে তারা পেরেক দিয়ে দরজার তালা খুলে ফেলল...
বাইরে বেরিয়ে এক প্রহরীর সঙ্গে দেখা! তৎক্ষণাৎ ডাণ্ডা মেরে প্রহরীকে অজ্ঞান করে তার কোমরের রিভলভারটি হস্তগত করল দুই বন্দী...
একতলায় প্রহরীদের আস্তানায় হানা দিয়ে দুটি প্রহরীকে ঘায়েল করে বন্দীরা সংগ্রহ করল আরও একটি রিভলভার..
কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করার পর তৃতীয় দিনে তারা এসে পড়ল অস্ট্রিয়ার সীমান্তে। হঠাৎ তারা দেখল তাদের দিকে আসছে...
চারজন সশস্ত্র জার্মান সৈনিক!
জামার হাতায় স্বস্তিকা-চিহ্ন লাগিয়ে তারা রওনা দিল এবং অস্ট্রিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার সীমানায় এসে পৌঁছাল। এর মধ্যে কয়েকবার জার্মান সৈন্যরা তাদের পথরোধ করেছিল, কিন্তু দুই বন্দীর মুখে 'হাইল হিটলার' ধ্বনি শুনে আর জামার হাতায় স্বস্তিকা-চিহ্ন দেখে জার্মানরা তাদের পথ ছেড়ে দিল...

গাছ আর পাথরের আড়ালে ছিল বলে পলাতকদের দেখতে পায় নি জার্মানরা — তারা কাছাকাছি আসতেই পলাতকদের রিভলভার গর্জে উঠল ; অতর্কিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল চার জন জার্মান সৈনিকের রক্তাক্ত মৃতদেহ ...
নিরাপদে সীমান্ত পার হয়ে দুই পলাতক একটি সেতুর কাছে এসে আবার একদল জার্মান সেনার সামনে পড়ে গেল। সৈন্যদের অফিসার তাদের থামতে আদেশ করল...
কিন্তু এমন সপ্রতিভভাবে নিখুঁত জার্মান কায়দায় তারা অভিবাদনে জানাল যে, অফিসার তাদের ফ্যাসিস্ট বাহিনীর লোক ভেবে যাওয়ার অনুমতি দিল তৎক্ষণাৎ...
যুগোশ্লাভিয়ার ভিতর এসে তারা স্থানীয় মুক্তি-ফৌজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে গেরিলা-বাহিনীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। জার্মানদের সৈন্যবাহী ট্রেন, ট্রাক প্রভৃতি ধ্বংস করে তারা শত্রুপক্ষকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল...
অবশেষে শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে তারা সাগর উপকূলে এসে পৌঁছায় এবং সেখান থেকে বৃটিশ নৌবহরের একটি জাহাজে উঠে মিশরে পালিয়ে যায়।

ইতিহাসে পলাতক

১৬৫১ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসের ৩ তারিখে 'ব্যাটল্ অব উসটার' নামক প্রসিদ্ধ যুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের সদ্যসিংহাসন প্রাপ্ত রাজা দ্বিতীয় চার্লস পরাজয় বরণ করলেন ক্রমওয়েল পরিচালিত সেনাবাহিনীর কাছে। পরাজিত রাজা কয়েকজন অনুগত অনুচর নিয়ে রণভূমির প্রান্তর ত্যাগ করে নগরে প্রবেশ করলেন।

আত্মগোপনের সুবিধা হবে বলে রাজা এবং তাঁর অনুচরবর্গ ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে পায়ে হেঁটে পালাতে চেষ্টা করছিলেন। দুই তিনজন করে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পলাতকরা নগরের সঙ্কীর্ণ পথে পথে ছড়িয়ে পড়লো – পিছনে অনুসরণ করতে লাগল শত্রুপক্ষের অশ্বারোহী সৈন্যদল ...

কিছুক্ষণের মধ্যেই পলাতকদের আবিষ্কার করে ফেলল অনুসরণ-কারী অশ্বারোহী বাহিনী...

পলাতকদের মধ্যে কেউ আত্মসমর্পণ করে প্রাণ বাঁচাতে চাইল না; অস্ত্র-হাতে শত্রুবধ করতে করতে তারা মৃত্যুবরণ করল...

রাজা আর তাঁর একমাত্র সঙ্গী একটুর জন্য বেঁচে গেলেন। একটা প্রবেশপথের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে তাঁরা দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন — সামনের পথ ধরে ঝড়ের মতো ছুটে চলে গেল শত্রু-বাহিনী...

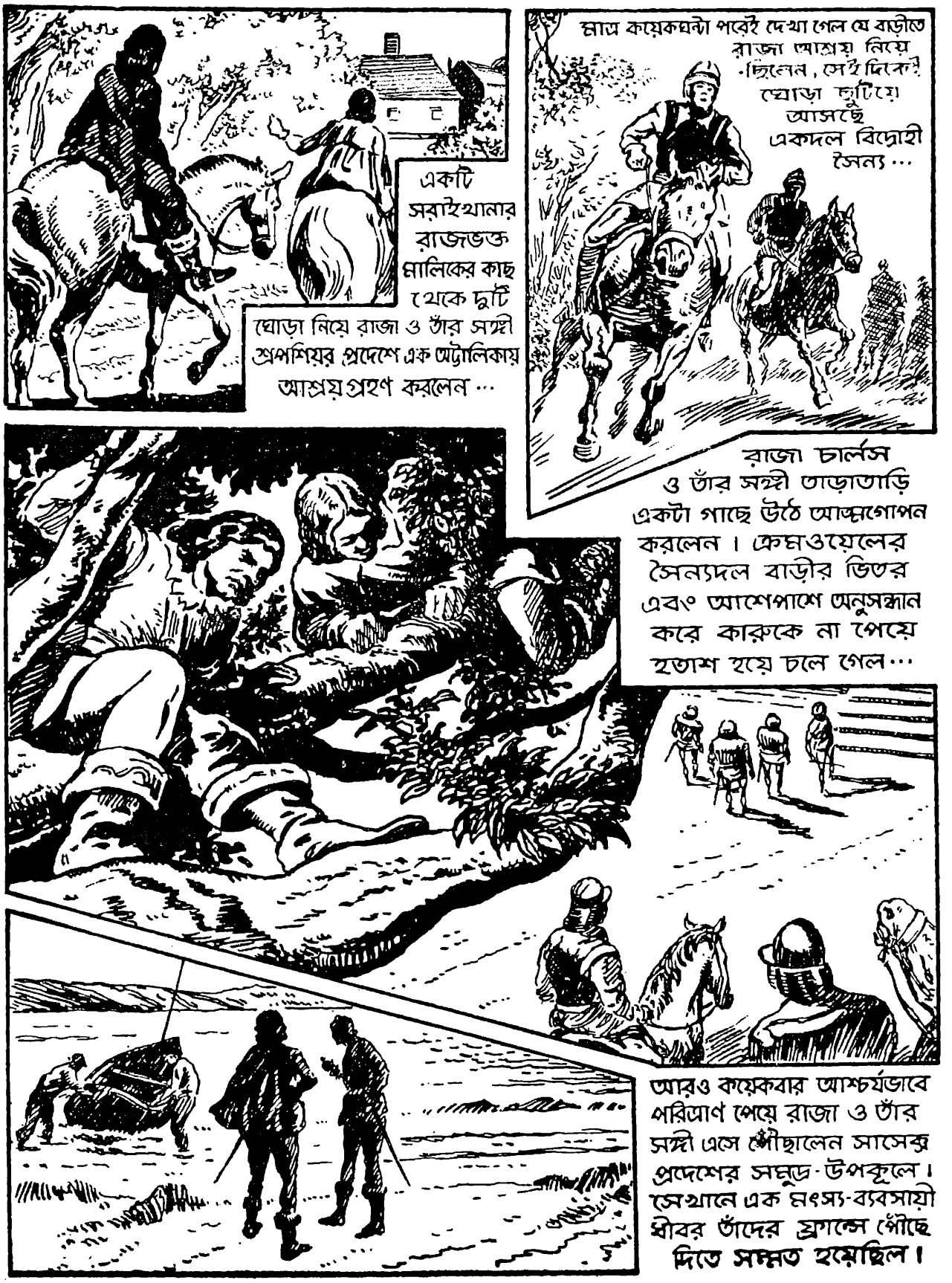
একটি সরাইখানার রাজভক্ত মালিকের কাছ থেকে দুটি ঘোড়া নিয়ে রাজা ও তাঁর সঙ্গী শ্রপশিয়র প্রদেশে এক অট্টালিকায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন ...
মাত্র কয়েকঘন্টা পরেই দেখা গেল যে বাড়ীতে রাজা আশ্রয় নিয়ে ছিলেন, সেই দিকেই ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে একদল বিদ্রোহী সৈন্য ...
রাজা চার্লস ও তাঁর সঙ্গী তাড়াতাড়ি একটা গাছে উঠে আত্মগোপন করলেন। ক্রমওয়েলের সৈন্যদল বাড়ীর ভিতর এবং আশেপাশে অনুসন্ধান করে কারুকে না পেয়ে হতাশ হয়ে চলে গেল...
আরও কয়েকবার আশ্চর্যভাবে পরিত্রাণ পেয়ে রাজা ও তাঁর সঙ্গী এসে পৌঁছালেন সাসেক্স প্রদেশের সমুদ্র-উপকূলে। সেখানে এক মৎস্য-ব্যবসায়ী ধীবর তাঁদের ফ্রান্সে পৌঁছে দিতে সম্মত হয়েছিল।

ইতিহাসে পলাতক

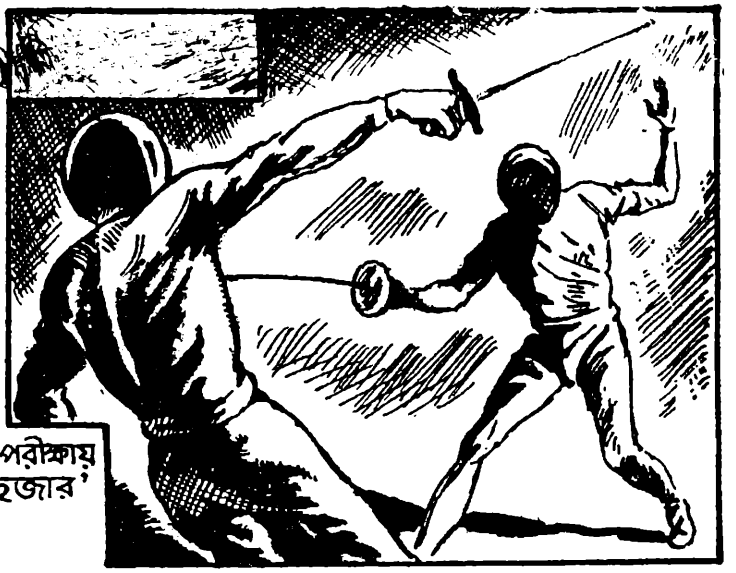

লেখাপড়ায় কোনদিনই ভাল ছিলেন না স্যার উইনস্টন চার্চিল, কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই তাঁর তলোয়ারের হাত ছিল পাকা। ছাত্র-জীবনেই তলোয়ারের দ্বন্দ্বযুদ্ধে তিনি শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডের বিদ্যালয়গুলির মধ্যে তাঁর সমকক্ষ কোন অসিযোদ্ধা ছিল না। 'স্যাণ্ডহার্স্ট' অঞ্চলে 'রয়েল মিলিটারি কলেজ'-এ সৈনিকের শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন চার্চিল এবং পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে বৃটিশ বাহিনীর 'চতুর্থ হুজার' নামক সেনাবিভাগের অন্যতম অধিনায়ক হয়েছিলেন…

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের এক পর্বত-সঙ্কুল স্থানে তিনি যখন অধীন সেনাদের নিয়ে টহল দিচ্ছিলেন, সেইসময় তাঁদের আক্রমণ করল একদল বিদ্রোহী পাঠান। ইংরেজ সেনাদলে সৈন্যসংখ্যা ছিল খুব কম, তাই তারা পিছু হটে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল…

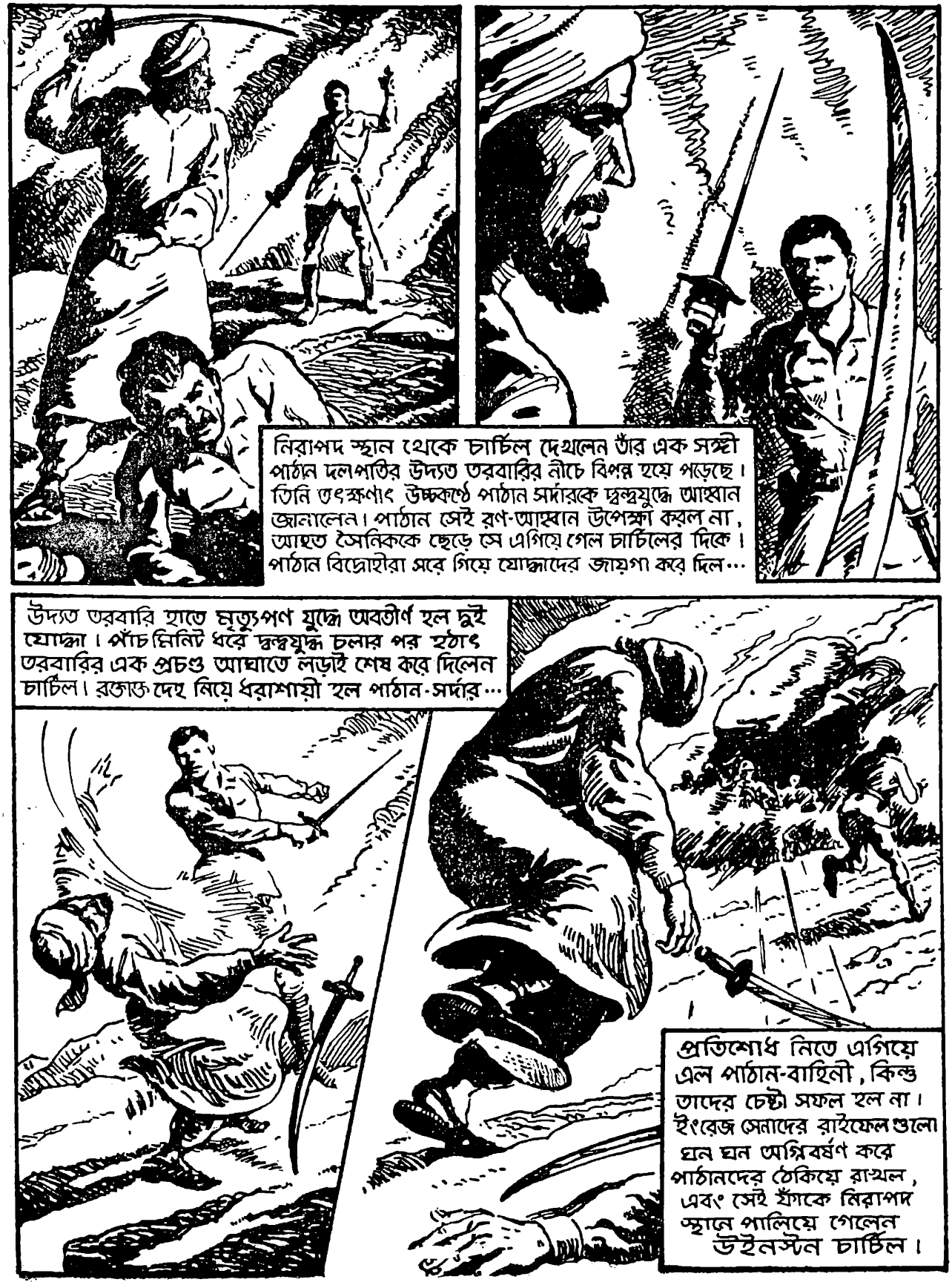
নিরাপদ স্থান থেকে চার্চিল দেখলেন তাঁর এক সঙ্গী পাঠান দলপতির উদ্যত তরবারির নীচে বিপন্ন হয়ে পড়েছে। তিনি তৎক্ষণাৎ উচ্চকণ্ঠে পাঠান সর্দারকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানালেন। পাঠান সেই রণ-আহ্বান উপেক্ষা করল না, আহত সৈনিককে ছেড়ে সে এগিয়ে গেল চার্চিলের দিকে। পাঠান বিদ্রোহীরা সরে গিয়ে যোদ্ধাদের জায়গা করে দিল...
উদ্যত তরবারি হাতে মৃত্যুপণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হল দুই যোদ্ধা। পাঁচ মিনিট ধরে দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলার পর হঠাৎ তরবারির এক প্রচণ্ড আঘাতে লড়াই শেষ করে দিলেন চার্চিল। রক্তাক্ত দেহ নিয়ে ধরাশায়ী হল পাঠান-সর্দার...
প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে এল পাঠান-বাহিনী, কিন্তু তাদের চেষ্টা সফল হল না। ইংরেজ সেনাদের রাইফেলগুলো ঘন ঘন অগ্নিবর্ষণ করে পাঠানদের ঠেকিয়ে রাখল, এবং সেই ফাঁকে নিরাপদ স্থানে পালিয়ে গেলেন উইনস্টন চার্চিল।

তোমার কাছে এমন ব্যবহার আশা করি নি, অভয়!...
আমার কথা তুমি বিশ্বাস করছ না?
পরেশ, তোমার কথা বিশ্বাস করা যায় না।
এই প্রমাণটাও কি বিশ্বাসযোগ্য নয়?

ঐ নখটা অদ্ভুত জিনিস। কিন্তু ওটা যে কৃত্রিম নয়, তার প্রমাণ কি? তুমি পরীক্ষা করার সময় দিতে চাও না, এই মুহূর্তেই তোমার টাকা চাই। তাই তো তোমার সম্পর্কে সন্দেহ — কে?... ভিতরে এস।
আসতে পারি?
কে? ভিতরে এস।
বসন্ত যে! এস, এস!
এলাম একটু আড্ডা দিতে — আরে! পরেশ না?
তারপর পরেশ, এখানে কি মনে করে? ছাত্রজীবনে একসঙ্গে পড়েছি বটে, কিন্তু এখন তোমার সঙ্গে পরিচয় আছে একথা স্বীকার করতেও লজ্জাবোধ হয়।
মুখ সামলে কথা বলো, বসন্ত!
আহা! তোমরা ঝগড়া কোরো না।

পরেশ! তুমি মাথা গরম কোরো না। তুমি জানো আমি দুষ্প্রাপ্য বস্তু সংগ্রহ করি, এটা আমার HOBBY বা শখ, তাই তুমি মস্ত বড় একটা নকল নখ নিয়ে এসে অবিশ্বাস্য গল্প বলে জিনিসটা গছিয়ে দিতে চাইছ, কিন্তু...
কিন্তু আমি জানি তুমি ভারতের বিভিন্ন সংরক্ষিত অরণ্যে অবৈধভাবে চোরাই শিকার বা 'পোচিং' করো, নিহত জানোয়ারের নখ, দাঁত, শিং, চামড়া তুমি বিক্রি করো...
অসাধু ব্যবসায়ীরা ঐসব জিনিস বিদেশে পাচার করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে থাকে একথা আমি জানি। এই নখটা কোন জানোয়ারের আমি জানি না, কিন্তু পরেশ, কৃত্রিম জিনিস বানিয়ে লোক ঠকানো তোমার পক্ষে অসম্ভব নয়। অতএব এই নখটা আমি কিনব না।
তোমাকে সব ঘটনাই বলেছি, তবু—
তবু না হয় আরও একবার বললে! অভয় তোমার গল্প শুনেছে, আমি তো শুনি নি।
আষাঢ়ে গল্প শুনতে আমার খুব ভালো লাগে।
সাবধান বসন্ত!
বসন্ত! আমার ধৈর্যের সীমা আছে।
পরেশ, আমার ধৈর্যও অসীম নয়। লোক-ঠকানোর অনেক কায়দা তুমি জানো— কিন্তু এখানে সুবিধা হবে না।

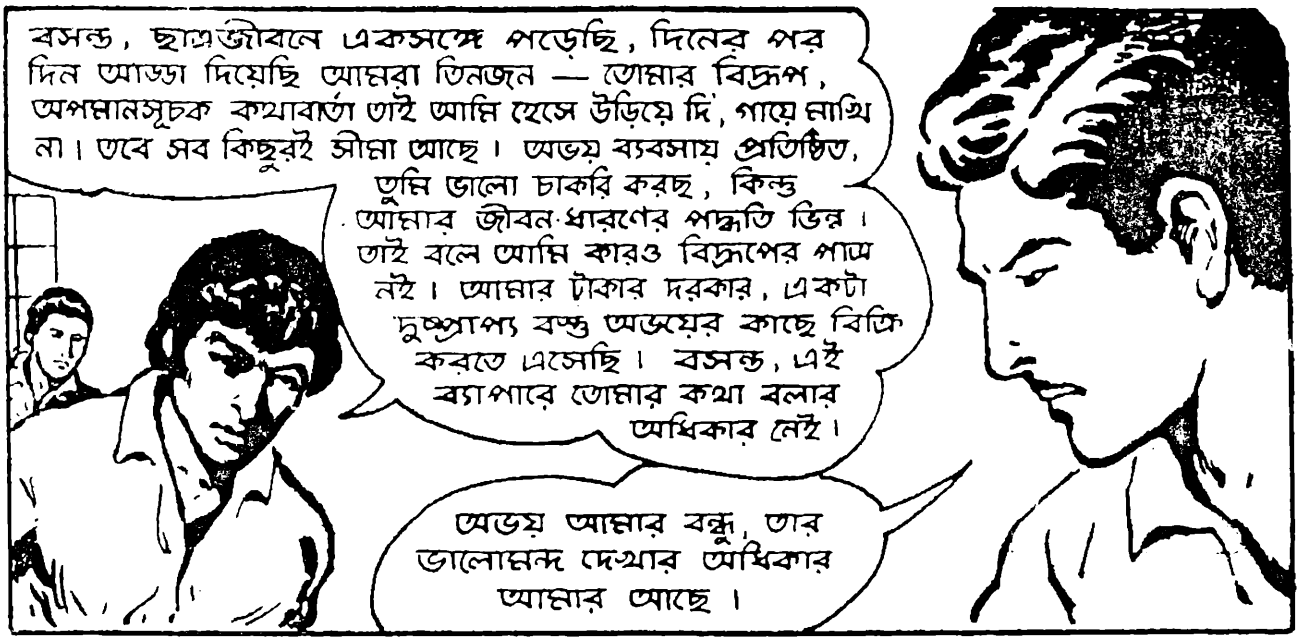
বসন্ত, ছাত্রজীবনে একসঙ্গে পড়েছি, দিনের পর দিন আড্ডা দিয়েছি আমরা তিনজন — তোমার বিদ্রূপ, অপমানসূচক কথাবার্তা তাই আমি হেসে উড়িয়ে দি, গায়ে মাখি না। তবে সব কিছুরই সীমা আছে। অভয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত, তুমি ভালো চাকরি করছ, কিন্তু আমার জীবন-ধারণের পদ্ধতি ভিন্ন। তাই বলে আমি কারও বিদ্রূপের পাত্র নই। আমার টাকার দরকার, একটা দুষ্প্রাপ্য বস্তু অভয়ের কাছে বিক্রি করতে এসেছি। বসন্ত, এই ব্যাপারে তোমার কথা বলার অধিকার নেই।
অভয় আমার বন্ধু, তার ভালোমন্দ দেখার অধিকার আমার আছে।

কথাটা সত্যি। শোনো পরেশ, টাকা দিয়ে খাঁটি জিনিস কিনতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তুমি আমাকে পরীক্ষা করার সময় দিতে রাজী নও, বৈজ্ঞানিকের নামটাও বলতে চাও না।
আমি কথা দিয়েছি তাঁর নাম কারুকে বলব না।
ব্যাপারটা যদি এতই গোপনীয় হয়, তাহলে নামটা শুনতে চাইব না। কিন্তু এই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে তোমার পরিচয় হল কেমন করে পরেশ?

ঘটনাটা অভয়কে বলেছি, তবে তুমি যদি শুনতে চাও তো আর একবার ঘটনাটা বলতে আমার আপত্তি নেই। শোনো…
"কয়েকদিন আগে এক বন্ধুর বাড়ি থেকে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল; রাত তখন প্রায় বারোটা – দেখলাম, এক ভদ্রলোকের টাকা পয়সা ছিনতাই করার চেষ্টা হচ্ছে। শরীরের রক্ত হঠাৎ মাথায় উঠে গেল…

"আমিও যে অন্ধকারের জীব এবং ওদের চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের প্রাণী, সেকথা গুন্ডাদুটো বুঝতে পারেনি – মুহূর্তের মধ্যে পকেট থেকে রিভলভার বার করে গুলি ছুঁড়লাম...
"একটা গুন্ডা সেখানেই পড়ে রইল, আর একজন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাল। আমিও ভদ্রলোকের সঙ্গে দৌড় দিলাম আর একদিকে...
"অনেকটা রাস্তা পার হয়ে আসার পর ভদ্রলোক মুখ খুললেন...
আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। আমার বাড়ি খুব কাছে। দয়া করে পৌঁছে দিন।
বেশ তো, চলুন।
আপনি কি শাদা পোশাকে পুলিস?
না, এইমাত্র আপনি যাদের খপ্পরে পড়েছিলেন, আমি তাদেরই শ্রেণীভুক্ত...
তবে আমি এদের মতো ছ্যাঁচড়া নই। আমরা 'মারি তো গণ্ডার, লুঠি তো ভাণ্ডার।'
আপনার মতো লোককেই খুঁজছি – চলুন আমার বাড়িতে।
তারপর তো ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হলাম। সেখানেই জানতে পারলাম তাঁর পরিচয়। ভদ্রলোক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। তাঁর নামটা প্রকাশ করা চলবে না, তাই "মিঃ সেন" বলেই তাঁকে উল্লেখ করছি, পরবর্তী ঘটনা বলছি শোনো...
তোমার গল্পটা দারুণ জমছে পরেশ!

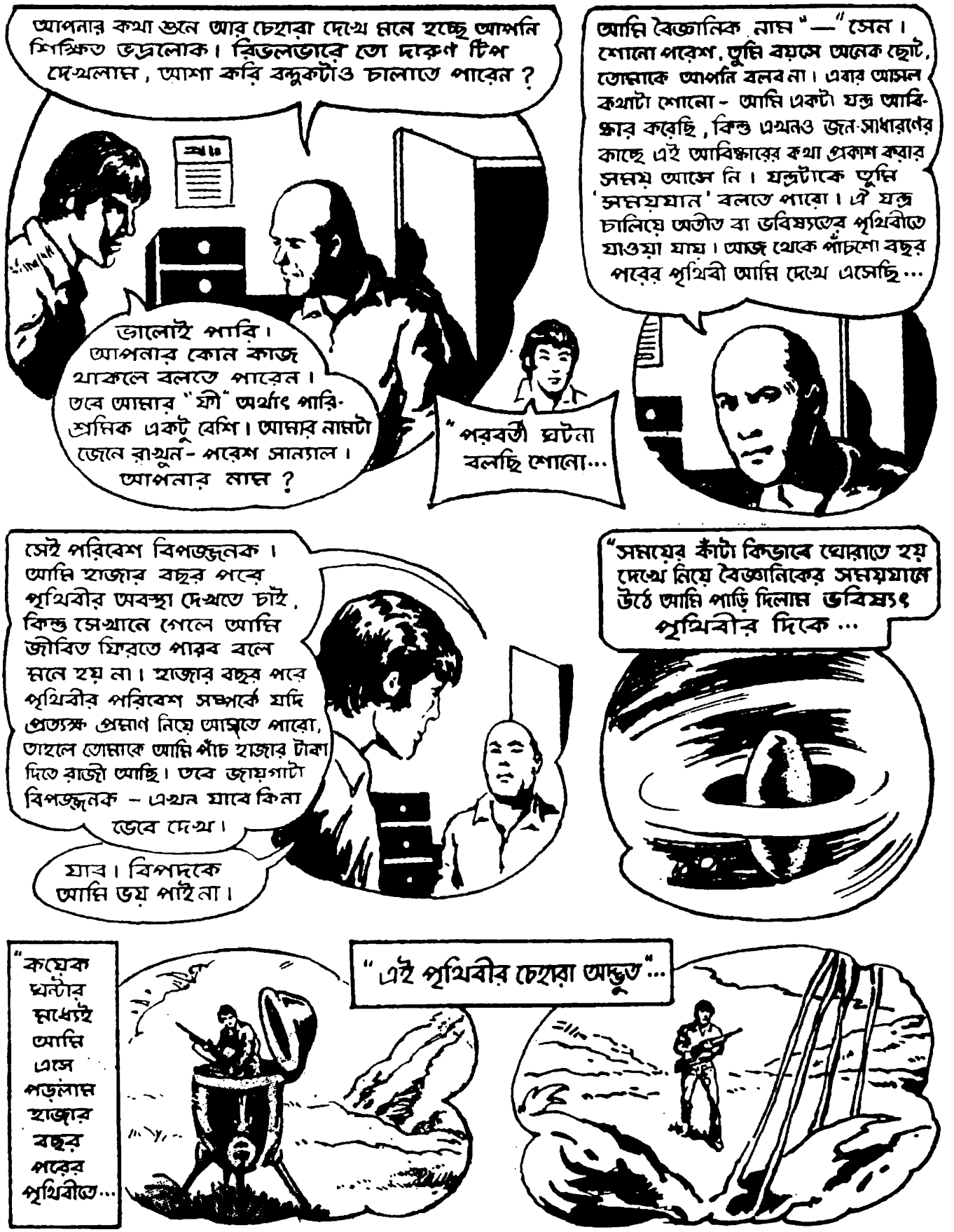
আপনার কথা শুনে আর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে আপনি শিক্ষিত ভদ্রলোক। রিভলভারে তো দারুণ টিপ দেখলাম, আশা করি বন্দুকটাও চালাতে পারেন ?
ভালোই পারি। আপনার কোন কাজ থাকলে বলতে পারেন। তবে আমার "ফী" অর্থাৎ পারিশ্রমিক একটু বেশি। আমার নামটা জেনে রাখুন- পরেশ সান্যাল। আপনার নাম ?
আমি বৈজ্ঞানিক নাম "—" সেন। শোনো পরেশ, তুমি বয়সে অনেক ছোট, তোমাকে আপনি বলব না। এবার আসল কথাটা শোনো - আমি একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছি, কিন্তু এখনও জন-সাধারণের কাছে এই আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করার সময় আসে নি। যন্ত্রটাকে তুমি 'সময়যান' বলতে পারো। ঐ যন্ত্র চালিয়ে অতীত বা ভবিষ্যতের পৃথিবীতে যাওয়া যায়। আজ থেকে পাঁচশো বছর পরের পৃথিবী আমি দেখে এসেছি...
"পরবর্তী ঘটনা বলছি শোনো...
সেই পরিবেশ বিপজ্জনক। আমি হাজার বছর পরে পৃথিবীর অবস্থা দেখতে চাই, কিন্তু সেখানে গেলে আমি জীবিত ফিরতে পারব বলে মনে হয় না। হাজার বছর পরে পৃথিবীর পরিবেশ সম্পর্কে যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ নিয়ে আসতে পারো, তাহলে তোমাকে আমি পাঁচ হাজার টাকা দিতে রাজী আছি। তবে জায়গাটা বিপজ্জনক - এখন যাবে কিনা ভেবে দেখ।
যাব। বিপদকে আমি ভয় পাই না।
"সময়ের কাঁটা কিভাবে ঘোরাতে হয় দেখে নিয়ে বৈজ্ঞানিকের সময়যানে উঠে আমি পাড়ি দিলাম ভবিষ্যৎ পৃথিবীর দিকে ...
"কয়েক ঘন্টার মধ্যেই আমি এসে পড়লাম হাজার বছর পরের পৃথিবীতে...
"এই পৃথিবীর চেহারা অদ্ভুত"...

চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম — আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে একটি ভয়ংকর জানোয়ার...
জন্তুটা ঝাঁপ দিল, আমিও গুলি ছুঁড়লাম...
"জন্তুটার দেহের আয়তন বাঘের মতো, গঠনে বর্তমান পৃথিবীর কোন জীবের সঙ্গেই মিল নেই"..
এই হল ঘটনা। জন্তুটার দুটো নখ কেটে এনেছিলাম। একটা নখ বৈজ্ঞানিক মিঃ সেনকে দিয়েছি, আর একটা নখ অভয়কে বিক্রি করতে এনেছি। জরুরী কাজে পরশু চলে যাব, তাই টাকাটা এখনই চাই। সব তো শুনলে,
এখন আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে?
শোনো পরেশ, — তুমি বলছো জন্তুটার দেহের আয়তন বাঘের মতো। এমন কিছু বড় জানোয়ার নয়, তার মাথাটা তুমি সহজেই কেটে ফেলতে পারবে। যদি তুমি জন্তুটার মাথা আমায় এনে দিতে পারো, তাহলে তোমায় আমি পাঁচহাজার টাকা দেব — রাজী?
নিশ্চয়। আমি এখনই বৈজ্ঞানিক মিঃ সেনের বাড়িতে যাচ্ছি।
আমাকে সময়যান আর রাইফেলটা একবার দিতে হবে। আমি আর একবার ঘুরে আসব। তবে এবার আমাকে টাকা দিতে হবে না।
তুমি হঠাৎ যেতে চাইছ কেন জানি না। যেতে চাও যাও, তবে জায়গাটা আদৌ নিরাপদ নয়।

ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা হল শুরু!...
এই তো সেই জায়গাটায় এসে পড়েছি...
!
মৃত্যুর পর অদ্ভুত এক প্রক্রিয়া ঘটে গেছে জন্তুটার দেহে। ছোট খাটো জন্তুটা প্রায় হাতির মতো প্রকাণ্ড হয়ে গেছে মৃত্যুর পরে! হাজার বছর পরে পৃথিবীর আবহাওয়া মৃত জীবের শরীরে এমন আশ্চর্য পরিবর্তন আনবে একথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। এর মাথাটা অতিকষ্টে যদি কাটতে পারি, অত ভারি জিনিসটা সময়যানের ভিতর তুলতে পারব না। বন্ধুদের কাছে আমি মিথ্যাবাদী হয়ে গেলাম। পাঁচ হাজার টাকাও পাব না।

আপনাকে শেষবারের মতো বলছি, মিঃ সেনকে ডেকে দিন। বিশেষ দরকার। পরেশ দত্ত নামটা বললেই উনি দেখা করবেন।
আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, কাল আসবেন — আজ মিঃ সেনের সঙ্গে দেখা হবে না।
দেখা হবে। আমি নিজেই ব্যবস্থা করছি...
আঃ! সরে গেল!
তা তো যাবই — আমি কি দাঁড়িয়ে মার খাব?

শান্ত হোন পরেশবাবু।
!
জামা ছেড়ে দিন। কে আপনি? আমার নাম জানলেন কেমন করে?
ভোম্বল সব জানতে পারে। আপনার ভাগ্য ভালো – হঠাৎ ভোম্বল এসে পড়ল, না হলে দেখিয়ে দিতাম আমিও হাত চালাতে পারি; বোধ করি আপনার চেয়ে ভালোই পারি।
তাই নাকি? চলে আসুন তবে।
ও সব চেষ্টা করে লাভ নেই, মশাই। ভোম্বলের সামনে লড়াই করা সম্ভব নয়।
সাহস থাকে, এগিয়ে আসুন। ভোম্বল বাধা দিতে পারবে না।
পারব।
উঃ! লাগছে! হাত ছাড়ুন!
হাঃ! হাঃ! কী বলেছিলাম?

লাগছে? আচ্ছা, আর লাগবে না।
আরে! আরে! করেন কী! পড়ে যাব যে! ছাড়ুন! ছাড়ুন!
এসব কী হচ্ছে? ভোম্বল! পরেশকে এখনই নামিয়ে দাও।
তোমরা জানো না এটা বৈজ্ঞানিকের বাড়ী?... তোমাদের জন্য কি আমি শান্তিতে কাজ করতে পারব না?
আমি তো শান্তিরক্ষার চেষ্টা করেছি...
কিন্তু কেউ যদি সহযোগিতা না করে, তাহলে আমি কি করব স্যার?... এই ভদ্রলোক, মানে পরেশবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসে-ছিলেন। বিমান দেখা করতে দেয় নি। ওঁকে কাল আসতে বলেছিল। তাই পরেশবাবু বিমানকে মারতে গিয়ে-ছিলেন। আমি পরেশবাবুর হাত চেপে ধরতে ওঁর হাতে ব্যথা লাগল। তাই আমি ওঁকে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছি। ওঁর একটুও ব্যথা লাগেনি। তবু উনি চেঁচামেচি করলেন। আমি অবশ্য ওঁর মুখ চেপে ধরতে পারতাম, কিন্তু তাহলে হয়তো ওঁর দু'একটা দাঁত পড়ে যেত, আর উনি আবার ব্যথা পেতেন, তাই —
বুঝেছি। তুমি চমৎকার শান্তিরক্ষা করেছ। এবার দয়া করে চুপ করো। পরেশ! তুমি তো নতুন লোক নও, নির্দিষ্ট সময় ছাড়া আমার সঙ্গে দেখা করা যায় না, একথা তুমি জানো না?
স্যার! আপনি আমায় বলেছিলেন আজ কারও সঙ্গে আপনি দেখা করতে পারবেন না। তাই আমি ওঁকে কাল আসতে বলেছিলাম, উনি আমায় মারতে উঠলেন।
খুব অন্যায়। যাই হোক, পরেশ, একবার তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ, সেকথা আমি ভুলিনি — এবারের মতো তোমায় ক্ষমা করছি, কিন্তু...

কিন্তু ভবিষ্যতে কখনও এমন অভদ্র আচরণ করবে না। করলে —
আবার! আমার খুব শিক্ষা হয়েছে। জোঙ্গল নামে এই দৈত্যটিকে আপনি কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন, মিঃ সেন?
বলছি, তার আগে বলো, আমার সঙ্গে তোমার হঠাৎ কি এত দরকার পড়ল?
আজ্ঞে! হঠাৎ খুব টাকার দরকার পড়ল। বেশী নয়, হাজার দুই হলেই চলবে।
পরেশ, টাকা আমি তোমায় দেব। কিন্তু একটা কাজ তোমাকে করতে হবে।
বলুন।
পরেশ! তুমি নানা কম সমাজবিরোধী কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত। এসব কাজে পয়সা যেমন আছে, বিপদও তেমন আছে — কিন্তু গৌরব নেই। আমি তোমাকে একটা ভালো কাজে লাগাতে চাই। যদি কার্যসিদ্ধি করে ফিরে আসতে পারো, তাহলে জীবনে কখনও অর্থাভাব ঘটবে না। আমার + সময়যানে দু'বার তুমি ঘুরে এসেছ — আরও কয়েকবার তোমায় যেতে হবে। + ভবিষ্যতের পৃথিবীর ভয়াবহ পরিবেশ তুমি দেখে এসেছ, এবার তোমায় যেতে হবে সম্ভবতঃ আরও ভয়ংকর বিপদের মুখে — সুদূর অতীতে। অবশ্য এবার তুমি সঙ্গী পাবে। বিপদে পড়লে সঙ্গীরা তোমায় সাহায্য করবে। বলো, কবে যাবে?
যখন বলবেন তখনই যেতে রাজী। কিন্তু আমার সঙ্গীরা যেন দেহে-মনে শক্তিমান হয়।

ভয় নেই। তুমি যোগ্য সঙ্গী পাবে। তোমার একজন সঙ্গী হচ্ছে বিমান দত্ত – একসময়ের নাম-করা মুষ্টিযোদ্ধা, বর্তমানে আমার সহকারী। আর একজন হচ্ছে ...
ভোম্বল। ওর উপর তুমি নির্ভর করতে পারো।
বিলক্ষণ! ভোম্বল বোধহয় দরকার হলে বাঘের সঙ্গে কুস্তি লড়তে পারে।
বাঘ ওর কাছে কিছুই নয়। দৈহিক শক্তি ছাড়া আরও অজস্র গুণ আছে ওর। আসলে ভোম্বল মানুষ নয়, যন্ত্র -- অর্থাৎ রোবট। কিন্তু মানুষের মতো ও চিন্তা করতে পারে। আশা করি তোমার সঙ্গীদের যোগ্যতা সম্পর্কে তুমি এখন নিশ্চিন্ত। তোমার টাকা তুমি কাল পাবে। অতএব, দিন তিনেক পরেই তোমায় যাত্রা করতে হবে। এবার তোমার গন্তব্যস্থল সুদূর অতীত – খৃঃ পূর্ব ৩২৭ অব্দ ছাড়িয়ে প্রাচীন আর্যাবর্তের বুকে। এখন আরও একটা দরকারী কথা বলছি – সময়যানের কলকৌশল জানে একমাত্র ভোম্বল। তবে সময় নির্ধারণ করতে গিয়ে একটু এদিক-ওদিক হলে তোমরা একেবারে মহাভারতের যুগে পৌঁছে যেতে পারো; পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে দেখা হওয়াও অসম্ভব নয়।
বলেন কী!... কিন্তু মিঃ সেন, যদি ভীমের হাতে পড়ি? শুনেছি মধ্যমপাণ্ডব খুব বদমেজাজী মানুষ।
পরেশ, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। মধ্যমপাণ্ডব যদি মেজাজ গরম করেন, তাহলে সেই মেজাজ আমি ঠাণ্ডা করে দেব।
তাই ভোম্বল, তোমার উপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে। আমাকে যেভাবে তুমি বিড়ালছানার মতো শূন্যে তুলে ফেললে, তাতে মনে হয় ভীমসেনকে অন্ততঃ মিনিট খানেক তুমি থামিয়ে রাখতে পারবে। পালানোর পক্ষে ঐ সময়টুকু যথেষ্ট। ... মিঃ সেন, আমার সঙ্গীদের যোগ্যতা সম্পর্কে আমি নিশ্চিন্ত। আপনার নির্দেশ অনুসারে তিন দিন পরে আমি যাত্রা করছি অতীত আর্যাবর্তের দিকে।

নির্দিষ্ট দিনে সময়যানে উঠে অতীত আর্যাবর্তের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল তিনজন...
আমরা নতুন জায়গায় এসে পড়েছি। পরেশ! বিমান! তোমরা কানে আর গলায় ভাষান্তর যন্ত্র লাগাও।
"ভাষান্তর যন্ত্র" মিঃ সেনের আশ্চর্য আবিষ্কার। কানে লাগানো যন্ত্র যে-কোন ভাষা যন্ত্রধারীর মাতৃভাষায় অনুবাদ করে তার কানে পৌঁছে দেয় এবং গলায় লাগানো যন্ত্র যন্ত্রধারীর মুখের ভাষাকে শ্রোতার মাতৃভাষায় অনুবাদ করে শোনায়। ভোম্বলের অবশ্য যন্ত্রের দরকার হয় না; সে যন্ত্রমানব, যে-কোন ভাষাই সে বুঝতে পারে, বলতে পারে...
আমরা নতুন জায়গায় পৌঁছেছি।
ভোম্বল! আমাদের কি এখানে নামতে হবে?
হুঁম।
প্রাচীন আর্যাবর্তের এক পাহাড়ের উপর আমরা নেমেছি।
কিন্তু দূরে যে-লোকটাকে দেখতে পাচ্ছি, তার পোশাক দেখে তাকে আর্যাবর্তের মানুষ বলে মনে হয় না।
লোকটার পোশাক দেখে বুঝতে পারছি ও প্রাচীন গ্রীসের মানুষ। সময়যানের সময় ঠিক করতে একটু ভুল হয়েছে। অতীত আর্যাবর্তের পরিবর্তে আমরা এসে পড়েছি প্রাচীন গ্রীসের বুকে...
এই মরেচে!
লোকটা খাদের উপরের সেতু বেয়ে ছুটে আসছে। লোকটা দারুণ ভয় পেয়েছে, ওর পিছনে বোধহয় কেউ তাড়া করেছে...

দাঁড়াও! ব্যাপারটা বুঝে দেখি...
ওহে শুনছ?
কে?..
কে তোমরা? অডিয়াস তোমাদের পাঠিয়েছে আমাকে হত্যা করতে?
শান্ত হও, বন্ধু! আমরা বিদেশী, এখানে কাউকে চিনি না। কিন্তু তুমি কে? এমন হন্যে হয়ে ছুটছ কেন?
তোমরা বিদেশী?... হ্যাঁ, তোমাদের পোশাক অতি বিচিত্র। গ্রীসে এমন ধরনের পোশাক দেখা যায় না।... তোমরা আমার পরিচয় জানতে চাও? আমার নাম পার্ডিকাস। ইথাকার অত্যাচারী রাজা অডিয়াসের বিরুদ্ধে আমি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছি। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার বাহিনী পরাজিত; আমার পিছনে ছুটে আসছে অডিয়াসের সৈন্যদল আমাকে হত্যা করার জন্য।
ভাষান্তর যন্ত্রের কল্যাণে গ্রীক ভাষা বুঝতে পারে বিমান ও পরেশ...
নিশ্চিন্ত থাকো, পার্ডিকাস! তুমি সাহসী এবং সৎ। আমি তোমায় রক্ষা করব। ওপার থেকে অনুসরণকারী সৈন্যদল এপারে আসতে পারবে না...
!
!
সেতুটাকে আমি খাদের গর্ভে বিসর্জন দিলাম।
আগন্তুক! তুমি অমিত শক্তিধর। কিন্তু অনুসরণকারী সৈন্যদের নেতৃত্ব দিচ্ছে স্বয়ং হারকিউলিস। তার কবল থেকে তুমিও আমায় বাঁচাতে পারবে না।
হা- হারকিউলিস!
হারকিউলিসকে এই খাদ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।
ঐ দেখ, হারকিউলিস এসে পড়েছে।
পার্ডিকাস! সেতু নষ্ট করে তুমি নিস্তার পাবে না।
আমি আসছি।

যন্ত্রমানব ভোম্বল কি সঠিকভাবে সময়যানকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে বর্তমান কলকাতার নিরাপদ আস্তানায়? নাকি, আবার ভুল সুইচ টিপে ছিটকে পড়বে ভয়াবহ অতীতের গর্ভে?...

ত্রৈলোক্যনাথ
ত্রিবেদীর
বিচিত্র
কীর্তি!

অধ্যাপক ত্রিবেদী ও হানাবাড়ী
কলকাতার কাছে এক শহরতলিতে এসেছেন উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী অধ্যাপক ত্রিলোকনাথ ত্রিবেদী। কেন? তা কেউ জানে না...
হুঁ! সেইরকমই তো মনে হচ্ছে!
আপনি তো অধ্যাপক ত্রিবেদী?
হ্যাঁ? ও, হ্যাঁ — কিন্তু তোমাকে চিনতে পারলাম না তো!
আমার নাম গোবিন্দ ঘোষ। আপনি আমাকে চেনেন না, কিন্তু আপনাকে আমি চিনি। আপনি তো কলকাতা থেকে কয়েকদিন হল এখানে এসেছেন। কিন্তু আপনি হানাবাড়ীর দিকে কি দেখছিলেন?
হানাবাড়ী?
লোকে তাই বলে। আমার সঙ্গে কেউ থাকলে একটা রাত ঐ বাড়ীতে থেকে ভূত দেখার চেষ্টা করতাম। কিন্তু আমার বন্ধুরা ভীতু, কেউ ওখানে রাত কাটাতে সাহস পায় না।
তাই নাকি?
ভূত বলে কিছু নেই। তুমি যদি ওখানে আজ রাত কাটাতে চাও, তবে আমি তোমার সঙ্গে থাকব।
কি মজা! এখন পাঁচটা বাজে, ঠিক রাত দশটায় এখানে আসুন। আমিও আসব।

রাত দশটার পর হানাবাড়ীর একটি ঘরে…
দেখুন, বিকেল-বেলা এসে আমি এই ঘর সাফ করে দুজনের জন্য দুটো বিছানা করে রেখেছি।
বাঃ! তুমি বেশ কাজের ছেলে গোবিন্দ। এইবার মোমবাতি নিভিয়ে দাও…
আমি চশমা-জামা সব খুলে ফেললাম। এবার শুয়ে পড়ছি, তুমিও শুয়ে পড়ো গোবিন্দ!
আচ্ছা!
গভীর রাতে হঠাৎ গোবিন্দের ঘুম ভেঙ্গে গেল…
ওকি! অধ্যাপক ত্রিবেদী নাচছেন কেন?
রাত দুপুরে হঠাৎ অধ্যাপক নাচ শুরু করলেন! নিশ্চয় ত্রিবেদীর ঘাড়ে ভূত চেপেছে …ওরে বাবা!… পালাই!
গোবিন্দ! তুমি জেগে আছ? আমার পিঠটা একটু চুলকে দাও তো। কখন থেকে চেষ্টা করছি, কিছুতেই ঠিক জায়গায় হাত যাচ্ছে না।
আ-আ-আপনি পি-পিঠ চুলকাতে চেষ্টা করছিলেন!!!

অধ্যাপক ত্রিবেদী ও কালো বিড়াল

কলকাতার কাছে এক শহরতলিতে এসেছেন উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ত্রিলোকনাথ ত্রিবেদী। কেন? তা কেউ জানে না। একদিন ঐ এলাকাতে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটা পোড়োবাড়ীর দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন ত্রিবেদী। তিনি তন্ময় হয়ে বাড়ীটা পর্যবেক্ষণ করছেন, এমন সময়ে গোবিন্দ নামে একটি ছেলে তাঁকে জানাল ঐ বাড়ীটি নাকি হানাবাড়ী, অর্থাৎ 'ভূতের বাড়ী'। ত্রিবেদী বললেন ভূত বলে কিছু নেই এবং গোবিন্দকে নিয়ে হানাবাড়ীতে একটি রাত কাটিয়ে তিনি প্রমাণ করে দিলেন ভূতের ব্যাপারটা নিতান্তই গুজব ...

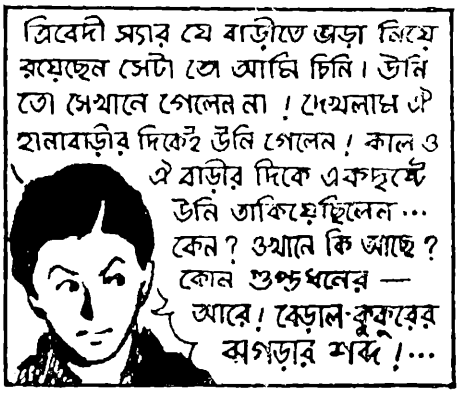

S.N. 2/1

তোর কুকুর ঐ বেড়ালটাকে কামড়াতে যাচ্ছিল, তাই তাড়া দিচ্ছিলাম।
বেড়াল?
বেড়াল কোথায়?... ঐ যে!...যা, যা, জিম, ধর্ ওটাকে!
ইস্! কুকুর ছেড়ে দিলি? ধরতে পারলে বেড়ালটাকে মেরে ফেলবে। তোর কুকুর এপাড়ার দু'তিনটে বেড়াল মেরেছে।
এটাকেও মারবে। ঐ ম্যাথ্...
কোথায় পালাবে? জিম ওকে ঠিক ধরে ফেলবে।
ভোক্! ভোক্!
ভোক্! ভোক্!
এঃ হে!. কাজের সময় যত গোলমাল - সনাতন!
ভোক্! ভোক্!
সনাতন! এই সনাতন! বাড়ীর সামনে একটা কুকুর ভীষণ চ্যাঁচাচ্ছে। মেরে বিদায় কর ওটাকে। স্থির হয়ে কাজ করার উপায় নেই।
কুকুরের তাড়া খেয়ে জানলা দিয়ে একটা বেড়াল ঘরে ঢুকেছে। তাই কুকুরটা চ্যাঁচাচ্ছে। এখন আপনাকে কাজ করতে হবেক নি, বেলা হয়েছে খেতে চলেন।
আচ্ছা, আচ্ছা, এখনই যাচ্ছি।
তাড়াতাড়ি আসুন। আমি আপনার খাবার দিচ্ছি।
এইবার টপ্ করে এটা খেয়ে ফেলি...
জাপানী প্রফেসর তাগাগাকি ব্রুসোনা যে ফরমুলা দিয়েছেন, তার সূত্র অনুসারেই তো মিকশ্চার তৈরী করেছি। যে নমুনা তিনি আমাকে দিয়েছিলেন, হ্যানা - বাড়ীতে ঠিক সেই বস্তুটি পেয়েছি মনে হচ্ছে। তাগাগাকি বলেছেন পনের মিনিট পরেই ফল পাওয়া যায়। আমি না হয় আধঘন্টা অপেক্ষা করব।
S.N.2/2

নাঃ! আর পারি না বাপু — কাজ থাকলে তো ফল-মিষ্টি আর দুধ ছাড়া কিছুই খাবে না — তাও যদি ...
তাও যদি ঠিক সময়ে খায়... খাবার টেবিলে আবার কতকগুলো গাছের পাতা রেখে গেছে।
এইবার খেয়ে নি। এরপর আর খাওয়ার সময় পাব কি না সন্দেহ।
সনাতন! খেতে দে।
অনেকক্ষণ দিয়েছি।
সনাতন, তুই এইবার খেয়ে নে। আমি শুধু ফল মিষ্টি আর দুধ খাচ্ছি, পরিবেষণের ঝামেলা নেই। তুই খেতে যা, অনেকবেলা হল। তোর খাওয়া হলে চিঠির বাক্সটা দেখবি। চিঠি আসতে পারে।
আচ্ছা বাবু।
আধঘন্টা হয়ে গেছে। সনাতনও খেতে গেল, এখন একবার পরখ করি...
একি হল! টেবিলটা একটুও নড়াতে পারলাম না! কিন্তু প্রফেসর অগাগাকির নমুনা তো এইরকমই ছিল মনে হয়...
ফরমুলা মিলিয়েই তো সব করেছি — তবে? নোটবইটা প্যান্টের পকেটেই রয়েছে, খেতে খেতে বরং আর একবার ফরমুলাটা দেখি ... সব তো ঠিকই আছে দেখছি... তবে কি এটা আসল জিনিস নয়? তাগাগাকি বলছিলেন যদিও আমাজন নদীর অববাহিকায় এই জিনিস তিনি পেয়েছেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজায়গায়...
কয়েকজায়গায় ঐ ধরনের গাছ তাঁর চোখে পড়েছে; তবে ঐগুলি পরীক্ষা করার সুযোগ —
থুঃ! থু! থু!
অন্যমনস্ক হয়ে খেতে খেতে খাবারের বদলে একটা পাতা মুখে দিয়ে ফেলেছি — কি তেতো রে বাবা! উঃ! ... ঐ যাঃ!...
ঐ যাঃ! হাতের ধাক্কা লেগে দুধের গেলাস উল্টে গেল!
আরে! একটা কালো বেড়াল এসে জুটেছে! ওহো! সনাতন বলছিল বটে, একটু আগে কুকুরের তাড়া খেয়ে একটা বেড়াল জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকেছে ... বেড়ালটা দুধ খাচ্ছে... থাক... আমি বরং একটু বিশ্রাম করি — মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল, সব পরিশ্রমই ব্যর্থ।
S.N.2/3

ভৌউ-উ-ক্-ক্!...
আবার কি হল? একটু বিশ্রাম নেবার উপায় নেই।
বাবু! শীগগির আসুন!
কি হয়েছে সনাতন? কুকুরের চিৎকার শুনলাম যেন?
ঐ দেখুন বাবু!
ঈস্স্! ঘরের মধ্যে কুকুর মারল কে?
শুনুন বাবু...
আমি চিঠির বাক্স দেখার জন্য যেই দরজা খুলেছি, অমনি একটা কুকুর ঘরে ঢুকে পড়ল। তারপর বাবু কুকুরে আর বেড়ালে কি দারুণ লড়াই! শেষকালে বেড়ালটা দুই থাপ্পড়ে কুকুরটাকে মেরে ফেলে খোলা দরজা দিয়ে ছুটে পালাল!
ভৌ-উ-উ-ক্-ক্!
কি সব বাজে কথা বলছিস? বেড়ালের থাবায় রক্তারক্তি হয়ে এমন ভাবে কুকুর মারা পড়ে? তুই নিজে কুকুরটাকে মেরে বেড়ালের উপর দোষ চাপাচ্ছিস...
এই কুকুরটাই যত নষ্টের গোড়া। এক লাথি মেরে— একি!
আরে বাপ! আপনার দেহে যে ভীমের শক্তি! কুকুরটাকে এক লাথিতে ঘরের বাইরে একশো হাত দূরে ছিটকে ফেললেন!
হ্যাঁ? হ্যাঁ, ওঃ! বুঝেছি!... ইয়ে হয়েছে সনাতন— আমার গায়ের জোরটা একটু বেশী,— তা ইয়ে হয়েছে,— আমায় এক গেলাস জল দিবি সনাতন?
দিচ্ছি বাবু।
জাপানী প্রফেসর 'তাগাগাকি বুবুসোনা' যে গাছের পাতা আমাকে দেখিয়েছিলেন এগুলো সেই পাতা নয়, কিন্তু তার চেয়েও শক্তিশালী। বুবুসোনার পরীক্ষায় দেখা গেছে কয়েকটা বিশেষ ধরনের বস্তু ঐ পাতার সঙ্গে মেশালে যে নির্যাস তৈরী হয়, সেই তরল বস্তু পান করে কিছুক্ষণের জন্য অসীম শক্তির অধিকারী হওয়া যায়। হানাবাড়ী থেকে যে পাতা আমি এনেছি সেগুলো পিষে রস করে বুবুসোনার ফরমুলার জিনিস মিশিয়ে ফল পাওয়া যায় না— কিন্তু কাঁচা খেলে শরীরে অসীম শক্তির জোয়ার আসে। বেড়ালটা দুধের সঙ্গে বোধহয় কয়েকটা দুধমাখা পাতা খেয়েছিল, তাই ওর থাবার আঘাতে কুকুরটার এমন দুর্দশা!... কিন্তু কথা হচ্ছে ঐ পাতার ক্ষমতা কতক্ষণ স্থায়ী?..
S.N.2/4

অধ্যাপক ত্রিবেদী ও বাঘা মুকুন্দ
কলকাতার কাছে এক শহরতলিতে এসে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী অধ্যাপক ত্রিলোকনাথ ত্রিবেদী এক আশ্চর্য গাছ আবিষ্কার করেছেন। ঐ গাছের পাতা চিবিয়ে খেলে সর্বশরীরে অসাধারণ শক্তির উদ্ভব হয়। কিন্তু সেই আশ্চর্য-পাতার ভেষজ-গুণ কতক্ষণ স্থায়ী সেকথা এখনও জানতে পারেন নি অধ্যাপক ত্রিলোকনাথ ত্রিবেদী...
একঘন্টা হল কয়েকটা আশ্চর্য-পাতা খেয়েছি। এখনও শরীরে প্রচণ্ড শক্তি অনুভব করছি...
কিন্তু কতক্ষণ পর্যন্ত এই শক্তিমত্তা থাকবে সেইটাই জানা দরকার। ঐ যে কয়েকটা ছেলে ফুটবল খেলছে, ওদের সঙ্গে একটু খেললে আশ্চর্য-পাতার শক্তিটা বোঝা যাবে... আরে! বলটা যে এইদিকে আসছে!
ইস! বড় জোর হয়ে গেল!
আবার তুই বলটা পুকুরের মধ্যে ফেলবি।
ধন্যবাদ স্যার। আপনি না ধরলে বলটা পুকুরে পড়ত। এখন ওটা দিন।
এই নাও।
বলটা কোথায় চলে গেছে রে!
উঃ! ত্রিবেদী স্যারের গায়ে তো দারুণ জোর!
ধ্যাস!
ওঃ!
ঐ ছোঁড়াগুলো আমার ঘাড়ে বল ফেলেছে! মজা দেখাচ্ছি।
পালা! পালা! বাঘা মুকুন্দর ঘাড়ে বল পড়েছে — ধরতে পারলে খুন করে ফেলবে।
S.N.3/1

পালাবি কোথায় ? একটাকে তো ধরবই ...
এইবার কি হয় ?
আমাকে ছেড়ে দাও মুকুন্দদা, বল ছুঁড়েছেন ত্রিবেদী স্যার— আমাদের দোষ নেই।
আবার মিথ্যে কথা !
ওর দোষ নেই। বল আমিই ফেলেছি।
আপনার নাম তো ত্রিলোকনাথ ত্রিবেদী ? পাড়াতে নতুন এসেছেন, আর ...
আর শিং ভেঙে বাছুরের দলে মিশেছেন ? ... তা বেশ করেছেন, কিন্তু চোখেও কি দেখতে পান না ? নাকি চারটে চোখেও চলছে না ?
ভদ্রভাবে কথা বলবে, নইলে —
নইলে কি করবেন ? মারবেন নাকি ? ... হাঃ ! হাঃ ! হাঃ ! আচ্ছা, এই আঙুলটা বাঁকাতে পারবেন ?
আঙুল বাঁকা করব না — গোটা শরীরটা বাঁকা করে দিচ্ছি—
উহুহু ! লাগছে, ছেড়ে দিন !
ছেড়ে দিলুম ...
আশ্চর্য পাতার গুণে ত্রিবেদীর দেহে এখন ভীষণ শক্তি !
এবার উঠে এসে আমার আঙুলটা বাঁকাও।
রক্ষে করুন মশাই !..
আমার নাম মুকুন্দ — লোকে বলে বাঘা মুকুন্দ। সেই বাঘকে আপনি এক আছাড়ে ছাগল বানিয়ে দিয়েছেন ! উঃ ! আঃ !
খুব লেগেছে ?
লেগেছে মানে ? মনে হচ্ছে আমার কোমরের উপর এক ভজন হাতী ডন-বৈঠক দিচ্ছে। আজ আমাদের পাড়ার সঙ্গে বাগনান ক্লাবের কবাডি-খেলার ম্যাচ আছে। ঐ ম্যাচে আমি...
আমি না খেললে আজ আমাদের পাড়া নির্ঘাত হেরে যাবে। কিন্তু আমার কোমর এমন মচকে গেছে যে খেলা তো দূরের কথা, উঠে দাঁড়াতেও কষ্ট হচ্ছে।
কবাডি খেলা ? ... এইসব খেলা জাতির বৈশিষ্ট্য। মুকুন্দ ! তোমাদের আমি সাহায্য করব ...
তোমার বদলে আজ আমি খেলব। চলো — কোনদিকে খেলার মাঠ ... আমি সাইকেল চালাব, তুমি সামনের রডে বসবে।
S.N.3/2

অধ্যাপক ত্রিবেদী ও খেলোয়াড় গদাই
কলকাতার কাছে এক শহরতলিতে এসে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ত্রিলোকনাথ ত্রিবেদী এক আশ্চর্য গাছ আবিষ্কার করেছেন। ঐ গাছের পাতা খেলে শরীরে অসাধারণ শক্তির সঞ্চার হয়, কিন্তু সেই আশ্চর্য-পাতার ভেষজ-গুণ কতক্ষণ স্থায়ী হয় এখন পর্যন্ত সে কথা জানতে পারেন নি অধ্যাপক ত্রিলোকনাথ ত্রিবেদী ...
কি ব্যাপার বলো তো!
অধ্যাপক ত্রিবেদী যে গ্রামে থাকেন, সেই গোলাপ-কলোনির সঙ্গে বাগমান ক্লাবের ছেলেদের কপাটি-খেলার প্রতি-যোগিতা হবে, কিন্তু প্রধান খেলোয়াড় মুকুন্দ ওরফে বাঘা মুকুন্দের অনুপস্থিতি গোলাপ-কলোনির খেলোয়াড়দের ভাবিয়ে তুলেছে ...
বুঝতে পারছি না, চারটে বাজতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি, এখন পর্যন্ত মুকুন্দের পাত্তা নেই।
চারটে থেকে খেলা শুরু। মুকুন্দ না এলে ওকে বাদ দিয়েই খেলতে হবে। আর ও না খেললে আমরা নির্ঘাত হারব। ওদের গদাই—
হ্যাঁ, গদাইকেই তো ভয়। মুকুন্দ ছাড়া ঐ দৈত্যটার মহড়া কেউ নিতে পারবে না।
এই যে শশাঙ্ক — চারটে তো বাজল, এইবার মাঠে নেমে পড়া যাক।
মুকুন্দ এখনও আসে নি। আমরা ওর জন্য অপেক্ষা করছি।
মধ্যস্থ আর সময় দিতে রাজী হলেন না। উভয়পক্ষের সমর্থক এবং দর্শকদের প্রবল উত্তেজনার মধ্যে খেলা শুরু হল ...
চারটে বেজে গেছে, আর সময় দেওয়া যায় না—
চু-কিৎ-কিৎ ...
কিৎ-কিৎ ...
খেলা থামল। পনের মিনিটের জন্য বিশ্রাম ...
আমাদের সাতজনের মধ্যে পাঁচজনই 'মোড়' হয়ে গেল। এবার আমরা হেরে ভূত হব ক্যাপটেন। গদাই দুর্ধর্ষ খেলছে। ওকে কে আটকাবে? মুকুন্দ থাকলে—
ঐ যে! মুকুন্দ এসে গেছে!
মুকুন্দ! বাঘা মুকুন্দ এসেছে!
কিছুক্ষণ খেলার পর দেখা গেল গোলাপ-কলোনির অবস্থা কাহিল! গদাই যেন একাই একশ!

তুমি অনেক দেরী করে ফেলছ মুকুন্দ। যাই হোক, এখনও হয়তো আশা আছে। অসীম বসবে, ওর বদলে তুমি মাঠে নামবে।
আমার কোমর মচকে গেছে, খেলতে পারব না। আমার বদলে ইনি খেলবেন।
আমরা ভীষণ ভাবে হেরে যাচ্ছি, এ সময় রসিকতা ভাল লাগে না মুকুন্দ।
রসিকতা নয় শশাঙ্ক। সব কথা খুলে বলছি শোনো –
আমাদের ক্যাপটেন শশাঙ্ককে ডেকে নিয়ে মুকুন্দ কি এখন প্রাইভেট টক্ করছে রে? সঙ্গে একটা রোগা-পটকা লোক।
ভদ্রলোকের নাম ত্রিলোকনাথ ত্রিবেদী। ওপাড়াতে নতুন এসেছেন।
ওরে গদাই! বাঘা মুকুন্দ এসে গেছে। হাফ-টাইমের পর সাবধানে খেলতে হবে।
মুকুন্দকে আমি ভয় করি না। আরে! — ওদের দলের মধ্যে ঝগড়া লেগেছে মনে হচ্ছে যেন!
বাগমান ক্লাবের ছেলেরা মুকুন্দকে দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে…
গদাই দ্যাখ – মুকুন্দ খেলছে না, তার বদলে একটা রোগা লোককে ওরা মাঠে নামাচ্ছে… আরে! উনি তো অধ্যাপক ত্রিবেদী! গোলাপ-কলোনিতে নতুন এসেছেন।
মুকুন্দই তো জোর করে ঐ লোকটাকে মাঠে নামাল মনে হচ্ছে। মুকুন্দটার মাথা খারাপ হল নাকি? ঐ তালপাতার সেপাইকে তো ফুঁ দিলে উড়ে যাবে!
গোলাপ-কলোনির দলের সবাই 'মোড়' হয়ে গেছে। বাকি ছিল কেবল ক্যাপটেন শশাঙ্ক আর অসীম। সকলের আপত্তি অগ্রাহ্য করে ত্রিবেদীকে খেলার মাঠে নামাল মুকুন্দ। শুধু ক্যাপটেন শশাঙ্ককে ত্রিবেদী সম্পর্কে মুকুন্দ তার তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বলেছিল, অন্য খেলোয়াড়দের কাছে ব্যাপারটা সে চেপে গেল। বিশ্রামের সময় উত্তীর্ণ হতেই আবার খেলা শুরু হল…
ছু-কিৎ-কিৎ …
ক্যাপটেন শশাঙ্ক হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণপণে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে জড়িয়ে ধরল …
ঈস! ফসকে গেল! অসীম সঙ্গে থাকলে ঠিক এটাকে মোড় করতে পারতাম। মুকুন্দটা যেমন— ওকি!
কিৎ-কিৎ…
মুকুন্দ তাহলে ঠিকই বলেছিল!
ওফ্!
আশ্চর্য-পাতার গুণে ত্রিবেদীর দেহে এখন আশ্চর্য-ক্ষমতা…

কি কাণ্ড! ত্রিবেদী মশাই তো সাংঘাতিক লোক!
ওরে গদাই! এযে দেখছি দুর্ধর্ষ খেলোয়াড়!
লোকটা চটপটে আছে। তবে আমার সঙ্গে চালাকি চলবে না। আসুক একবার এইদিকে।
ঐ লোকটাই এবার দান দিতে আসছে রে!
ঝট করে চেপে ধরলেই কাবু হবে। যতই চটপটে হোক অত রোগা লোকের গায়ে কখনও জোর থাকতে পারে না— চেপে ধরলেই ফিনিশ।
ওঃ! আশ্চর্য-পাতার তো দারুণ শক্তি!
কিরে গদাই কি হল? দেখতে দেখতে আমাদের দলের তিন-তিনটে খেলুড়েকে 'মোড়' করে দিল? তুই না বলেছিলি চেপে ধরলেই ফিনিশ?
ফিনিশ হওয়ার জিনিস এ নয়। বাপ রে বাপ— যেন ঝড় ছুটে গেল!
আচ্ছা, এবার আমি যাব ..
তালপাতার সেপাইটাকে একবার হাতের নাগালে পেলে হয়।
চু- কিৎ- কিৎ-
গদাই দান দিতে আসছে। ত্রিবেদী মশাই ওকে ধরে ফেলুন। গদাই মোড় হলে আমরা নির্ঘাত জিতব। আমাদের চারজন খেলোয়াড় আবার মাঠে নেমেছে, কারণ আপনি ওদের চারটি খেলুড়েকে মেরে এসেছেন। এখন যদি গদাইটাকে কয়েক সেকেন্ড ধরে রাখতে পারেন, তাহলে আমরা সবাই মিলে ওকে নিশ্চয়ই কাবু করে ফেলতে পারব।
আমি একাই ওকে কাবু করতে পারব শশাঙ্ক।
দর্শকদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা..
দারুণ খেলছে গদাই। দু'জন ওকে জড়িয়ে ধরেছে আরও দু'জন... শাবাশ! চারজনকে মেরে বেরিয়ে গেল গদাই!
উঃ! আমার চেয়ালটাও যে মেরে উড়িয়ে দিলেন মশাই!
ধরেছি গদাইকে!
কিৎ-কিৎ...
ত্রিবেদী ঝাঁপিয়ে পড়ে গদাইএর পা ধরে ফেললেন..
হঠাৎ দুর্বল লাগছে কেন? সর্বনাশ! নিশ্চয় এখন আশ্চর্য-পাতার গুণ ফুরিয়ে গেছে!
কিৎ-কিৎ...
গদাই সজোরে পা ছুঁড়ল...

অধ্যাপক ত্রিবেদী ও খেলোয়াড় গদাই
(দ্বিতীয় অর্ধ)
উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ত্রিলোকনাথ ত্রিবেদী কলকাতার এক শহরতলিতে এসে দৈবক্রমে একটি গাছে আশ্চর্য-পাতা আবিষ্কার করেন। ঐ গাছের পাতা চিবিয়ে খেলে অবিশ্বাস্য দৈহিক শক্তির অধিকারী হওয়া যায়, কিন্তু সেই পাতার ভেষজ-গুণ কতক্ষণ স্থায়ী সেকথা ত্রিবেদী তখন ও জানতে পারেন নি। গোলাপ-কলোনির হয়ে বাগনান ক্লাবের বিরুদ্ধে কপাটি-খেলার প্রতিযোগিতায় নেমে অধ্যাপক ত্রিবেদী যখন আশ্চর্য-পাতার গুণে সকলকে স্তম্ভিত করে দিয়েছেন, সেইসময় হঠাৎ প্রতিপক্ষের দুর্ধর্ষ খেলোয়াড় গদাইকে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে তিনি সভয়ে অনুভব করলেন আশ্চর্য-পাতার গুণ তাঁর দেহ থেকে বিদায় নিয়েছে, ফিরে এসেছে তাঁর স্বাভাবিক দুর্বলতা! পরক্ষণেই গদাইএর পায়ের ঝটকায় ত্রিবেদী হলেন শূন্যপথের যাত্রী...
ওরকম ভেগ্যে গাছটা ছিল, নয়তো ঝামেলা আজ থাকত না... একি! এটা দেখছি আশ্চর্য-পাতার গাছ!
কি হল স্যার? চোট লাগল নাকি?
না। আমি ভালোই আছি।
এর অর্থ ক্যাপটেন শশাঙ্ক বিরোধীপক্ষের একজনকে ছুঁয়ে অর্থাৎ চোড় করে ফিরে এসেছে। কপাটি খেলার নিয়ম অনুসারে একপক্ষের যে কয়জন খেলোয়াড় চোড় হবে, অপরপক্ষের সেই কয়জন চোড়-হওয়া খেলুড়ে আবার মাঠে নেমে খেলতে পারে। অতএব আবার মাঠে নামলেন ত্রিবেদী...
ভাল করে খেলবেন স্যার।
তুমি নিশ্চিন্ত থাকো মুকুন্দ।
কয়েকটা পাতা খেয়ে নিয়েছি, এখন আবার শরীরে শক্তির জোয়ার অনুভব করছি।
দলের ক্যাপটেন হিসাবে আমি খুব নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।
শশাঙ্ক, এবার আমি দান দিতে যাচ্ছি। গদাইকে নিশ্চয় মেরে আসব।
ভালো কথা।
অধ্যাপক ত্রিবেদী নির্ভয়ে এগিয়ে গেলেন প্রতিপক্ষের ঘরে...
কিৎ-কিৎ...
আবার গদাইএর দিকে কেন? একবারে কি শিক্ষা হয় নি?
একটু আগে কিন্তু লোকটি ভাল খেলছিল।
সবাই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল... অনেকগুলো জোয়ানের দেহের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন ত্রিবেদী, শুধু তাঁর দম নেবার শব্দ ভেসে আসতে লাগল...
কিৎ-কিৎ...
কিৎ-কিৎ করলে কি হবে? কতক্ষণ দম রাখতে পারবে?
ঐ চেহারা নিয়ে কপাটি খেলা হয় না।
দর্শকদের ভিতর থেকে বিরূপ মন্তব্য শোনা যায়...

আশ্চর্য-পাতার গুণে ত্রিবেদীর দেহে এখন অমানুষিক শক্তি, —এক ঝটকায় খেলোয়াড়দের ছিটকে ফেলে ত্রিবেদী তীরবেগে এসে পৌঁছালেন নির্দিষ্ট স্থানে!
কিৎ-কিৎ!...
কিৎ-কিৎ!
খেলা শেষ! সাতজন প্লেয়ারই ছোড়! নতুন ভদ্রলোক তো দারুণ খেলল!
উনি হলেন অধ্যাপক ত্রিলোকনাথ ত্রিবেদী, গোলাপ-কলোনিতে নতুন এসেছেন।
উত্তেজিত দর্শকদের মধ্যে দুটি মানুষ শান্ত, নির্বিকার।
উল্লসিত খেলোয়াড়ের দল ত্রিবেদীকে কাঁধে তুলে নিল...
যাঁর অসামান্য ক্রীড়া নৈপুণ্যে আমরা আজ খেলাতে জয়লাভ করেছি, সেই খেলোয়াড়ের নাম অধ্যাপক ত্রিলোকনাথ ত্রিবেদী। বলো— হ্রী চিয়ার্স ফর—
চুপ!
কী!
গদাই! তুই কি ভেবেছিস বাঘা মুকুন্দ মরে গেছে? আমরা খেলায় জিতে ফুর্তি করছি, তাতে তোর কি? তুই চুপ করতে বলেছিস কেন?
আলবৎ বলব। কেন, বাংলা ভাষায় কি ফুর্তি করা যায় না? বলো— অধ্যাপক ত্রিবেদী কী জয়!
ঠিক! ঠিক! বলো ভাই—
অধ্যাপক ত্রিবেদী কী জয়!
এই গদাই! তোর কি মাথাটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল? হেরে গিয়ে ওদের খেলুড়ের নামে জিগীর দিতে লজ্জা করল না?
আমি খেলোয়াড়, তাই— ভাল খেলোয়াড়কে সম্মান দিতে কখনও লজ্জা পাই না।
ডাক্তার! পথ চলতে চলতে হঠাৎ থেমে ভিড়ের মধ্যে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে কপাটি-খেলা দেখে কেন সময় নষ্ট করলেন বুঝলাম না।
মোটা বুদ্ধিতে আমার কপালে ফুটিই লীডার হতে। আমি অকারণে সময় নষ্ট করি না।

নন্টে আর ফন্টে
ঐ যে রামবাবুর পিছনে ফন্টেটা আসছে। এই ফন্টে, তাড়াতাড়ি আয় — সিনেমায় যাব।
কি বললি? সিনেমা?
সিনেমা? দাঁড়া নন্টে, দৌড়ে যাচ্ছি।
হুক্!
রাস্তায় কে যেন কলার খোসা ফেলে দিয়েছিল. সেই কলার খোসার উপর পড়ল ফন্টের পা!
ওঃ!
আরে! ফন্টে হঠাৎ পা পিছলে রামবাবুকে ধাক্কা মেরে বসল!

শাবাশ নন্টে! খুব জোর ক্যাচ লুফেছিস বটে!

ইস্‌স্‌! পাঁচ টাকা!
প্যাকেটের মধ্যে একটা ভাল ফুলদানী আছে। শখ করে ফুলদানীটা কিনে বাড়ীর দিকে যাচ্ছি, কোথা থেকে হতভাগা ফন্টেটা ষাঁড়ের মতো এসে গুঁতো মারল! তুই ধরে না ফেললে ফুলদানীটা টুকরো টুকরো হয়ে যেত। এই নে নন্টে, এই টাকাটা দিয়ে মিষ্টি খাস। তুই খুব ভাল ছেলে, ফন্টে হচ্ছে পাজি, বাঁদর, ত্যাঁদড়! ...আমি চললাম।

বেশ মজা! আমি পা পিছলে আছাড় খেলাম, তারপর খেলাম গালাগালি আর তোর বরাতে জুটল পাঁচ-পাঁচটা টাকা!

আমার ভাগ্য এখন ভাল যাবে— জ্যোতিষী বলেছে।
যা! যা! ব্যাপারটা বাই চান্স ঘটে গেছে। আমি প্রমাণ করে দেব যে তোর জ্যোতিষী তোকে গুল মেরেছে। আজ বিকেলে পাড়ার বক্সিং ক্লাবে এসে আমার সঙ্গে একহাত লড়ে যা দেখি! তোর ভাগ্য যদি সত্যিই ভাল হয়, তবে তুই নিশ্চয়ই জিতবি?

নিশ্চয়ই জিতব।
বেশ, আজ বিকেলে দেখা হবে।
আজ বিকেলেই নন্টে বুঝবে ওর ভাগ্য কত খারাপ! ও তো জানে না যে আমি রোজ ওয়েলেসলিতে বক্সিং প্র্যাকটিস করি।
সেদিন বিকেলে পাড়ার বক্সিং ক্লাবে নন্টে আর ফন্টের লড়াই শুরু হল...
নন্টে একটা ঘুষিও লাগাতে পারছে না। শুধু মার খাচ্ছে!
ছেলেটার ধৈর্য আছে।
ওহ্!
জ্যোতিষী তোকে বাজে কথা বলেছিল, নন্টে...
!
তোর ভাগ্য এখন খুব খারাপ — এই দ্যাখ্!
নন্টে, এবার একটু বিশ্রাম করে বাড়ী চলে যাও।
চল নন্টে, আমিও তোর সঙ্গে যাব।

কিরে নন্টে, তোর ভাগ্য এখন কেমন চলছে ?
খুবই খারাপ। ফন্টে, জ্যোতিষী গুল মেরেছে।
ও খোকারা! একটু দাঁড়াও..
তোমার নামই তো নন্টে ?
আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে তো কখনও দেখি নি!
আমাকে তুমি আগে কখনও দ্যাখ নি, তবে হয়তো আমার নাম শুনেছ..
আমার নাম বিনয় সরকার, সংক্ষেপে বি, সরকার।
!
আপনিই বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা বি, সরকার!
বিখ্যাত কিনা জানি না, তবে আমিই বি, সরকার। এই ক্লাবের ট্রেনার জগৎ ঘোষ অর্থাৎ তোমাদের জগাদা আমার বিশেষ বন্ধু। তোমার বক্সিং দেখে খুব ভাল লাগল, তাই জগার কাছ থেকে তোমার নামটা জেনে নিলাম। শোনো, নন্টেবাবু ...
বক্সিং লড়তে হলে মার দেওয়ার মতো মার খাওয়ার শক্তিও দরকার। তোমার সহ্যশক্তি আছে, সাহসও আছে, — প্র্যাকটিস করলে তুমি ভাল বক্সার হবে। এই নাও পাঁচটা টাকা, মাংস-টাংস খেও... আচ্ছা ভাই, আজ চলি।
দেখলি ফন্টে, আমার ভাগ্যটা কেমন? একদিনে দশ-দশটা টাকা! আজ খুব মার খেয়েছি, এবার পেট ভরে চপ-কাটলেট খাব। ঘাবড়াসনি ফন্টে, তোকেও ভাগ দেব।
তোর টাকায় আমি খেতে চাই না, নন্টে।

বন্ধ
সূত্রধর গুপ্ত
কাহিনীর পটভূমি দার্জিলিং। বাগানে যে মেয়েটি শুয়ে আছে, বহুদিন পরে সে ঘরের কোণ ছেড়ে মুক্ত আলো-বাতাসের মধ্যে আসার অনুমতি পেয়েছে। মেয়েটির নাম রুণা — রুণা রায়...
হঠাৎ পাখির আর্তস্বর!
না, না, পুষি,— ওকে ছেড়ে দাও।
কিচ্! কিচ্!
ডাক্তারবাবু! দেখেছেন রুণার কাণ্ড! নিষেধ করা সত্ত্বেও বিছানা ছেড়ে উঠেছে!
দৃশ্যটা রুণার মা এবং চিকিৎসকের চোখে পড়ল...
মিসেস রায়! ওকে কিছু বলবেন না। আমি ব্যাপারটা দেখছি...
আমি পাখির পা ওষুধ দিয়ে বেঁধে দিয়েছি... কিন্তু তুমি বিছানা ছেড়ে উঠবে না – বুঝেছ?
আপনি খুব ভালো ডাক্তারকাকু।
পাখিটা হাঁটছে

সাতদিন পরে
পাখিটার পা প্রায় ঠিক হয়ে গেছে। ওকে নিয়ে রুণা সর্বদাই ব্যস্ত। রুণার শরীরও এখন ভালো আছে।
কিন্তু মিসেস রায়, একটা কথা আপনার ভাবা উচিত। এখন গ্রীষ্মকাল, তাই রুণা ভালো আছে। শীতের সময় এখানে থাকলে ও আবার অসুস্থ হয়ে পড়বে, — তাই বলছিলাম শীতকালে ওকে সমুদ্রের ধারে কোথাও পাঠানো দরকার।
বন্ধু
ধারাবাহিক চিত্রকাহিনী
বৈশাখ ১৩৯৭
ডাক্তারবাবু! রুণার বাবার মৃত্যুর পর আমাদের দুজনের কীভাবে চলছে, তা আপনি জানেন। রুণার বাবার বন্ধু ছিলেন আপনি — রুণাকে ভালোবাসেন, তাই বিনাপয়সায় চিকিৎসা করছেন...
আপনি না থাকলে রুণার চিকিৎসা হ'ত না। এই তো আমার অবস্থা — সমুদ্রের ধারে মেয়েকে রেখে চিকিৎসা করার মতো আর্থিক সামর্থ্য আমার নেই... ডাক্তারবাবু! রুণার ভাগ্যে যা আছে, তা-ই ঘটবে।
বন্ধু! তোমার গান শুনলে আমার দুর্বলতা চলে যায়। মনে হয় শরীরে আগের মতন শক্তি ফিরে পাচ্ছি।
পাখি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ — কিন্তু রুণাকে ছেড়ে সে নীল আকাশের বুকে ডানা মেলতে চায় না...
ডাক্তারবাবু বলেছেন তুমি গরম-দেশের পাখি, এখানকার শীতে তুমি বাঁচবে না। নভেম্বর শুরু হ'ল — এখানে ভীষণ ঠান্ডা পড়বে। বন্ধু, এইবার তুমি পালাও।
অবশেষে একদিন...
শীত এসে গেল। রুণাকে নিয়ে কী করব ভেবে পাচ্ছি না।
ভীষণ খবর!
ক-কে? কী!

বন্ধু

ভীষণ ব্যাপার - মানে, ভীষণ খবর! আমার বন্ধু বিনয় বসুর মেয়ে অনিতা রুণার মতো একই রোগে ভুগছিল। পুরীতে সমুদ্রতীরে মেয়েকে রেখে বিনয় তার চিকিৎসা করেছে, আজ অনিতা সম্পূর্ণ রোগমুক্ত। সে আমায় চিঠি লিখেছে — জানিয়েছে — তার কন্যার সমবয়সী মেয়ে যদি ঐরোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে, মেয়েটিকে সমুদ্রের ধারে রেখে চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে রাজী আছে ...
এই জন্য অসুস্থ মেয়েটির অভিভাবকদের কাছ থেকে টাকাপয়সা সে নেবে না। মেয়েটির থাকা-খাওয়া ও চিকিৎসার সব আর্থিক দায়িত্ব সে গ্রহণ করতে সম্মত — বলুন, মিসেস রায়, এটা কি একটা ভীষণ ব্যাপার নয়?
না, ডাক্তারবাবু, এটা মোটেই ভীষণ ব্যাপার নয় — এটা দারুণ সুখবর! রুণা যদি বাঁচে, আপনার জন্যই বাঁচবে। আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার জানা নেই।
রুণাকে পুরী পৌঁছে দিয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন ডাক্তারকাকু। এবার রুণাকে সাদর আহ্বান জানালেন তার নতুন-পাওয়া "বিনয়কাকু" — তিনি বললেন কিছুদিন সমুদ্রের হাওয়া খেলেই রুণার সব অসুখ ভালো হয়ে যাবে ...

রুণা, এই আমাদের বাড়ী। তুমি ঐ আরাম-কেদারায় শুয়ে বিশ্রাম নাও। অনি এখনই এসে পড়বে। তোমায় বেশিক্ষণ একা থাকতে হবে না। আমি একটু ঘুরে আসছি — বিশেষ কাজ আছে।
বন্ধু
কিছুক্ষণ পর...
এই যে ভাই রুণা, তুমি এসে পড়েছ!
আমি সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমার নাম —
জানি — অনিতা বসু। তোমার বাবা ডাকেন — 'অনি।' আচ্ছা ভাই অনিতা — হঠাৎ আমার মতো একটি মেয়েকে তোমরা এখানে আনলে কেন?
সেটা এক আশ্চর্য ব্যাপার — বলছি শোনো...
"একদিন আমি রোদে শুয়েছিলাম। হঠাৎ একটি ছোট পাখি উড়ে এসে এই বারান্দার রেলিংএর উপর বসল...
"পাখিটা এমন মিষ্টি সুরে গান গাইতে লাগল যে, আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভেঙ্গে উঠে মনে হল আমার শরীরে কোন অসুখ নেই, আমি ভালো হয়ে গেছি। তখন আমি বাপিকে বললাম আমার মতো আর একটি অসুস্থ মেয়েকে সুস্থ হওয়ার সুযোগ দিলে আমি খুব খুশি হব।"
আমার মা মারা যাওয়ার পর দারুণ একা-একা লাগত — এখন তোমায় পেয়ে ভীষণ ভালো লাগছে, রুণা।
হঠাৎ...
দেখ, দেখ, রুণা — অনেকদিন পর সেই পাখিটা আজ এখানে এসেছে!
রুণা হাত বাড়িয়ে দিতেই পাখি তার হাতের উপর এসে বসল, কিন্তু একটু পরেই আকাশের বুকে ডানা মেলে উধাও হয়ে গেল...
ওকে আমি চিনি!..
আমার ছোট্ট বন্ধু! তোমার জন্যই আজ আমি এখানে আসতে পেরেছি।
শেষ

মুক্তি পেল রতনলাল

প্রায় জলের দরেই পুরানো "ভিনসেন্ট" গাড়িটা পেয়ে গেলেন মাধব চক্রবর্তী। তিনি যদি জানতেন ঐ গাড়ির উপর হানা দিয়ে ফিরছে হিংস্র মৃত্যুদূত, তাহলে নিশ্চয়ই সস্তায় দাঁও মারার লোভ তিনি সংবরণ করতেন...

স্কুলের মাঠে কপাটি খেলতে গিয়ে পা ভেঙ্গে সাতদিন হ'ল বাড়িতে বসে আছি। ওদিকে মামার বিয়েতে মা গেছে শিলিগুড়ি, কবে ফিরবে কে জানে! আমি এখন খেলতে পারি না, কোথাও বেড়াতে যেতে পারি না — প্লাষ্টার-করা ভাঙ্গা পা নিয়ে কি বাসে-ট্রামে ওঠা যায়?... আমার ভীষণ খারাপ লাগছে, কিছুই ভালো লাগছে না।

সুমিতা, আজ আমি এমন একটা জিনিস কিনেছি, যেটা দেখলেই তোমার মন ভালো হয়ে যাবে..

বলো তো, জিনিসটা কী হতে পারে?

আমি জানি না। বাবা, তুমি বলো।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে আমরা এখন যাব মোটর-গ্যারেজে, — সেইখানে তুমি আজ নতুন-কেনা "ভিনটেজ" গাড়িটা দেখতে পাবে।

বাঃ! চমৎকার! বাবা, আমি ভাঙ্গা পা নিয়েই এই গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়াতে পারব।

গাড়ি দেখে খুশি হ'ল সুমিতা...

বাপ আর মেয়ের সঙ্গে এসেছিল আদরের কুকুর "রনি" — সে হঠাৎ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠল..

ভোক্! ভোক্!

পরবর্তী অংশ ভিতরে..

মুক্তি পেল রতনলাল • ধারাবাহিক চিত্রকাহিনী • আষাঢ় ১৩৯৭
স্যার, মনে হচ্ছে আপনার কুকুর মোটর-মিস্ত্রীদের পছন্দ করে না।
চুপ! রনি, চুপ!
আমার মনে হচ্ছে রনি এই গাড়িটাকে পছন্দ করছে না।
গাড়ি ছুটল রাজপথ ধরে..
ভোক! ভোঃ!
ভালোই চলছে গাড়িটা; রনিও এখন চুপচাপ বসে আছে পিছনের আসনে, কিন্তু একটু আগে ও হঠাৎ উত্তেজিত হয়েছিল কেন সুমি?
বুঝতে পারছি না, বাবা।
রনি!
এই!
ক্রমশঃ শহর ছেড়ে শহরতলির মেঠো পথ ধরলেন মাধববাবু ... মনের আনন্দে সুমিতা তার ভাঙ্গা পায়ের দুঃখ ভুলে গেল – হঠাৎ ভয়ার্ত চিৎকার করে এক লাফ মারল রনি ...
হতচ্ছাড়া কুকুরটার জন্য সবাই মরতে বসেছিলাম। ভাগ্যিস আমি গাড়িটাকে মাঠের উপর এনে থামাতে পেরেছিলাম...
হতভাগা কুকুর! এখন বাড়ী চলো, আজ রাতে তোমার খাওয়া বন্ধ।
সেই রাতে বাড়ীতে..
আশ্চর্য ব্যাপার! রনি এখনও গাড়িটাকে লক্ষ্য করছে! আমার পায়ে যদি প্লাষ্টার না থাকত, তাহলে আমি রনির কাছে একতলায় নেমে যেতাম। নাঃ, ঘুম পাচ্ছে, শুয়ে পড়ি..

মুক্তি পেল রতনলাল
ধারাবাহিক চিত্রকাহিনী
গাড়িটাকে ধরা অসম্ভব, সুমিকে বোধহয় বাঁচাতে পারলাম না... আরে! আরে! রনিটা হঠাৎ এসে জুটল কোথা থেকে!
DANGER NO ENTRY
সুমিতার কাঁধের জামা কামড়ে ধরে প্রচণ্ড বেগে লাফ মারল রনি...
রনি! তুই ফিরে এলি! কিন্তু আমরা যে মরতে চলেছি রে!
পরবর্তী অংশ ভিতরে...

সুধাধর গুপ্ত

ভাদ্র ১৩৯৭

অন্ধ নাকড়সা

ডিসেম্বর মাস। কনকনে ঠান্ডা।

কলকাতার শহরতলি গোলাপনগরের পথে পথে রাত্রির অন্ধকারে যে নিশাচর শেয়ালগুলো টহল দিয়ে বেড়ায় আর থেকে থেকে তীব্রকণ্ঠে নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করে আজ রাতে তাদেরও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। রাত মাত্র বারোটা—

কিন্তু গোলাপনগর কলোনির পথে দাঁড়িয়ে কেউ যদি মনে করে সমস্ত পৃথিবীতে বুঝি একটিও মানুষ জেগে নেই তাহলে বোধহয় বিশেষ ভুল হবে না। তবু দিনের পৃথিবী যখন ঘুমিয়ে পড়ে রাতের পৃথিবী তখন জেগে ওঠে...

তাই গোলাপনগরের ফাঁকা মাঠটার উপর যে মস্ত তিনতলা বাড়ীটা দাঁড়িয়ে আছে...

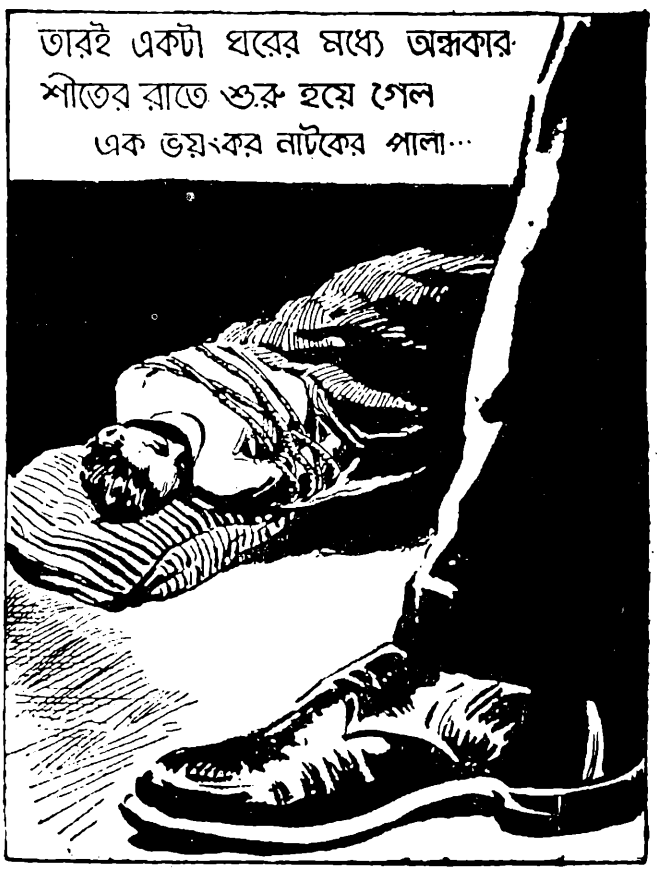

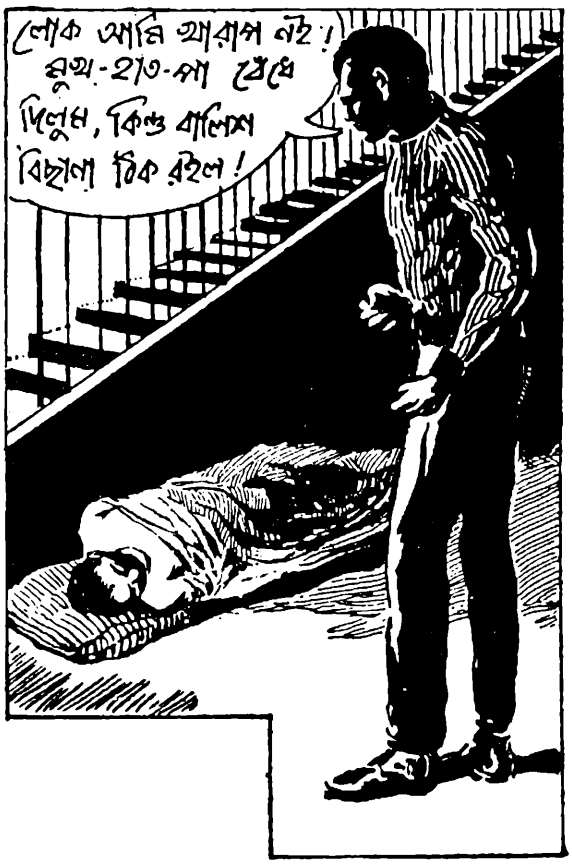

একটা ঝামেলা কাটল, এখন আসল কাজই বাকি...
দরজা তো দেখছি খোলা আছে, কিন্তু ঘরের ভিতর কিসের শব্দ!...
ঘোঁ-ঘঘঘ-ঘ...
ওব্বাবা! একি নাকের ডাক— না, বাঘের ডাক!
ঐ তো আলমারি— লোকটাও দেখছি মড়ার মত ঘুমাচ্ছে. এবার...
আগন্তুক পকেট থেকে টর্চ আর চাবি বার করল...

আলমারি খুলতে বিশেষ অসুবিধা হল না। ভিতরে টুকিটাকি অনেক কিছুই রয়েছে, কিন্তু আগন্তুক কোন দিকে দৃষ্টি দিল না। উপরের তাকে একটা ছোট চামড়ার ব্যাগের দিকে হাত বাড়াল...
আর সেই মুহূর্তে হঠাৎ নাক ডাকার শব্দ থেমে গেল। পরক্ষণেই আলো জ্বলে উঠল...
ব্যাগটা রেখে দাও!...
আগে ব্যাগটা আলমারিতে রেখে দাও — তারপর পুলিশ...
বুড়ো কখন উঠল, কখন দরজা বন্ধ করল একটুও শব্দ পেলুম না! দরজাও তো একটা, আর হতভাগা তাতেই পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছে — যাই কি করে...

ঘুম আমার অনেক আগেই ভেঙেছে- তোমায় ধোঁকা দেবার জন্য চোখ বুজে নাক ডাকিয়েছি। এবার কোথায় যাবে?

আপনি আমায় আটকাতে পারবেন?

দেয়ালের ফটোগুলির দিকে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখ!

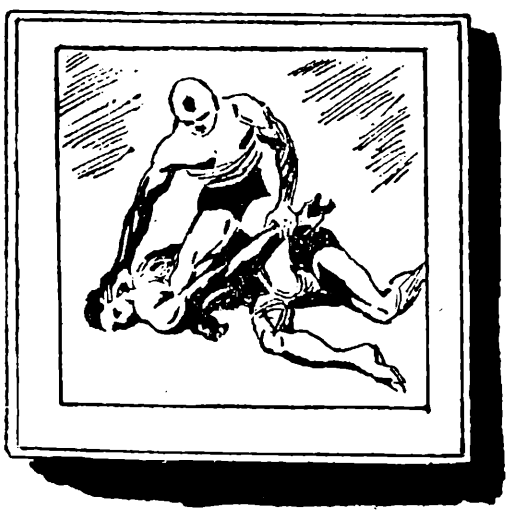

বুড়ো হলেও তোমার মত লোককে আমি পিষে ফেলতে পারি!
তা ঠিক। কিন্তু চোখে না দেখলে আপনি পিষবেন কাকে?

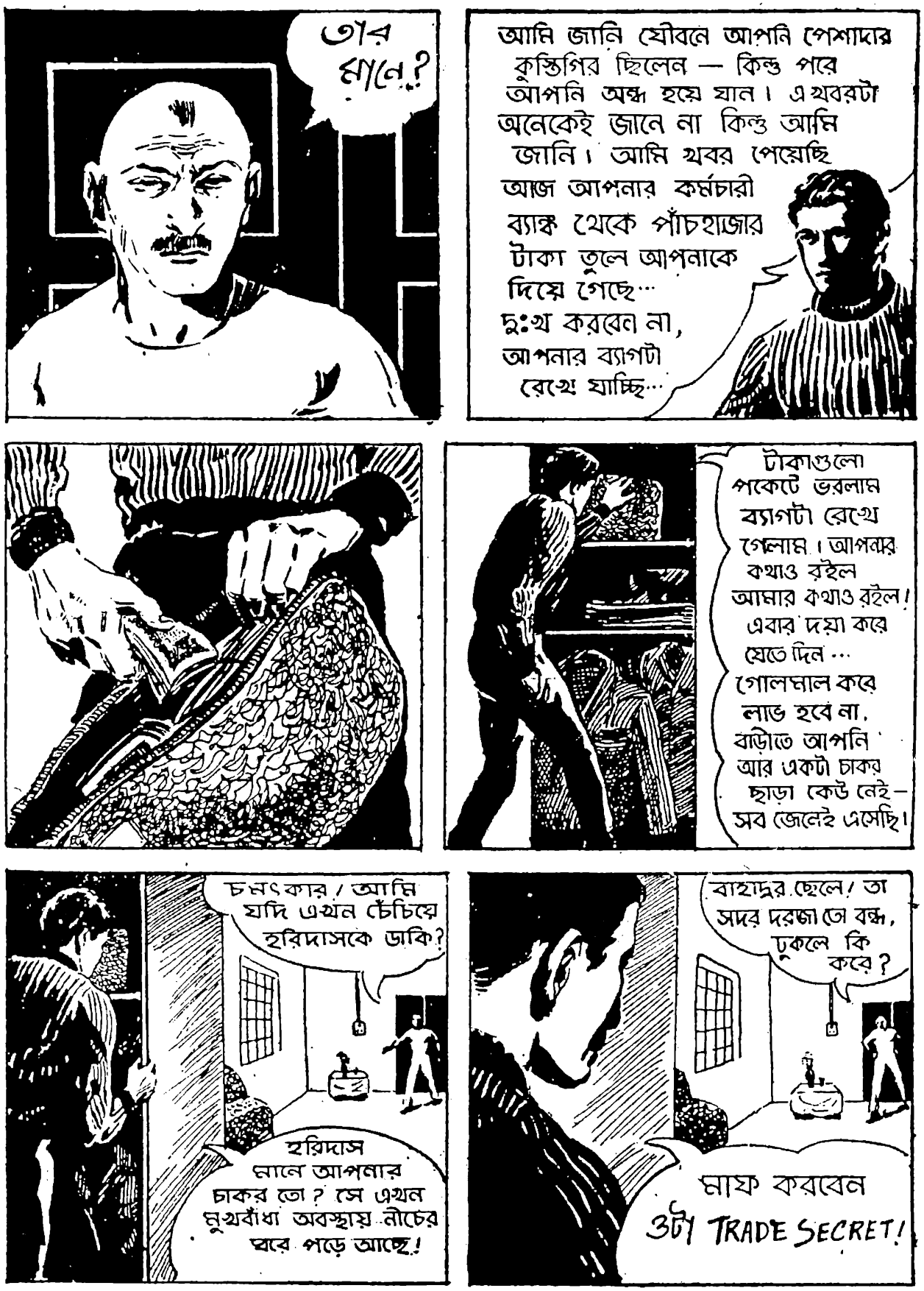
তার মানে?
আমি জানি যৌবনে আপনি পেশাদার কুস্তিগির ছিলেন — কিন্তু পরে আপনি অন্ধ হয়ে যান। এ খবরটা অনেকেই জানে না কিন্তু আমি জানি। আমি খবর পেয়েছি আজ আপনার কর্মচারী ব্যাঙ্ক থেকে পাঁচহাজার টাকা তুলে আপনাকে দিয়ে গেছে… দুঃখ করবেন না, আপনার ব্যাগটা রেখে যাচ্ছি…
টাকাগুলো পকেটে ভরলাম ব্যাগটা রেখে গেলাম। আপনার কথাও রইল আমার কথাও রইল! এবার দয়া করে যেতে দিন… গোলমাল করে লাভ হবে না, বাড়ীতে আপনি আর একটা চাকর ছাড়া কেউ নেই— সব জেনেই এসেছি।
চমৎকার! আমি যদি এখন চেঁচিয়ে হরিদাসকে ডাকি?
হরিদাস মানে আপনার চাকর তো? সে এখন মুখবাঁধা অবস্থায় নীচের ঘরে পড়ে আছে!
বাহাদুর ছেলে! তা সদর দরজা তো বন্ধ, ঢুকলে কি করে?
মাফ করবেন ওটা TRADE SECRET!

তুমি দেখছি লেখাপড়া শিখেছ — শিক্ষিত চোর!
লেখাপড়া শিখেও আমায় চুরি করতে হয় এই লজ্জা কি শুধু আমার? ...যাক, আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করতে আসি নি — পথ ছাড়ুন!...
খট করে একটা শব্দ হয়, আলো নিভে যায়...
সঙ্গে সঙ্গে একটা ভারি শরীর ছুটে আসে চোরের দিকে। চোর হঠাৎ নীচু হয়ে ঝুঁকে পড়ে, বাঘের থাবার মত একটা হাত চোরের ঘাড়ের উপর দিয়ে পিছলে যায়...
চোর বন্ধ দরজার দিকে ছুটে যায়, কিন্তু হঠাৎ টেবিলে পা বেধে সশব্দে ধরাশয্যা গ্রহণ করে...
মাটিতে শুয়ে শুয়েই চোর দেখল অন্ধ আবার তার দিকে ঝাঁপ দিচ্ছে...

অন্ধের ডান হাতটা চোরের বাঁ পায়ের উপর এসে পড়ল, কিন্তু ভাল করে আঁকড়ে ধরার আগেই চোর ডান পা দিয়ে ভদ্রলোকের মুখে লাথি মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল...
অন্ধের বাঁহাত তলোয়ারের মত টেবিলের একটা পায়ার উপর পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে পায়াটা ভেঙ্গে গেল!...
ওরে বাবা! এ যদি ধরতে পারে তাহলে আমার নিস্তার নেই। কিন্তু পালাই কি করে?...
আরে! ঐ জানালাটায় দেখেছি লোহার শিক নেই - শুধু কাঁচ...
প্রতাপ চৌধুরীকে তুমি লাথি মেরেছ! তোমার ঠ্যাং দুটো আমি আগে টেনে ছিঁড়ব, তারপর তোমায় পুলিসে দেব!
হতভাগা বুড়োর গায়ে যা জোর, ধরতে পারলে সত্যিই ঠ্যাং টেনে ছিঁড়বে!
চোর নিঃশব্দে জানালা খুলে ফেলল...
কি হে বোবা সেজে বেঁচে যাবে ভাবছ নাকি? বৃথা আশা-শোন একটা গল্প বলি...
কার্পেথিয়ান পাহাড়ের অন্ধকার গুহায় এক ধরনের মাকড়সা জন্মায়...

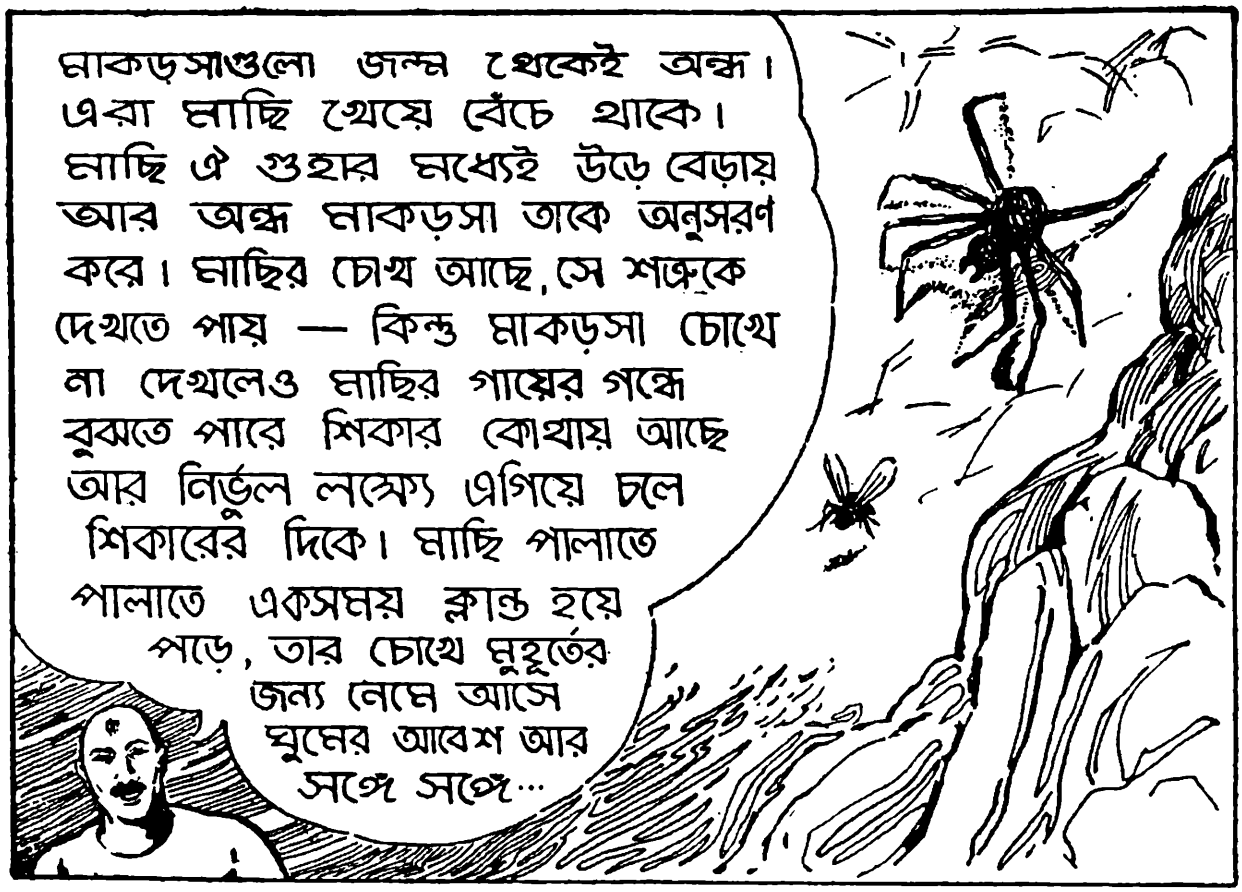
মাকড়সাগুলো জন্ম থেকেই অন্ধ। এরা মাছি খেয়ে বেঁচে থাকে। মাছি ঐ গুহার মধ্যেই উড়ে বেড়ায় আর অন্ধ মাকড়সা তাকে অনুসরণ করে। মাছির চোখ আছে, সে শত্রুকে দেখতে পায় — কিন্তু মাকড়সা চোখে না দেখলেও মাছির গায়ের গন্ধে বুঝতে পারে শিকার কোথায় আছে আর নির্ভুল লক্ষ্যে এগিয়ে চলে শিকারের দিকে। মাছি পালাতে পালাতে একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তার চোখে মুহূর্তের জন্য নেমে আসে ঘুমের আবেশ আর সঙ্গে সঙ্গে…

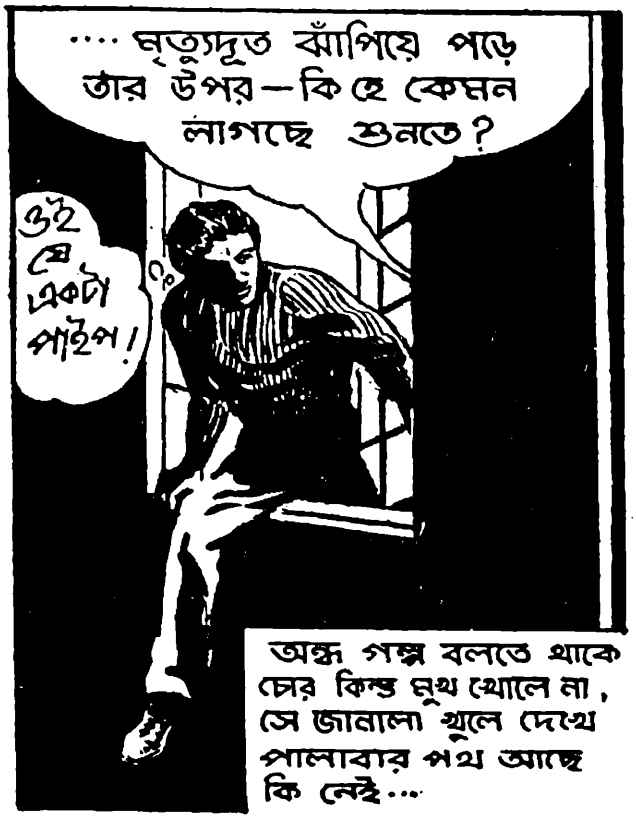
…. মৃত্যুদূত ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর—কি হে কেমন লাগছে শুনতে?
ওঃ যে একটা পাইপ!
অন্ধ গল্প বলতে থাকে চোর কিন্তু মুখ খোলে না, সে জানালা খুলে দেখে পালাবার পথ আছে কি নেই…

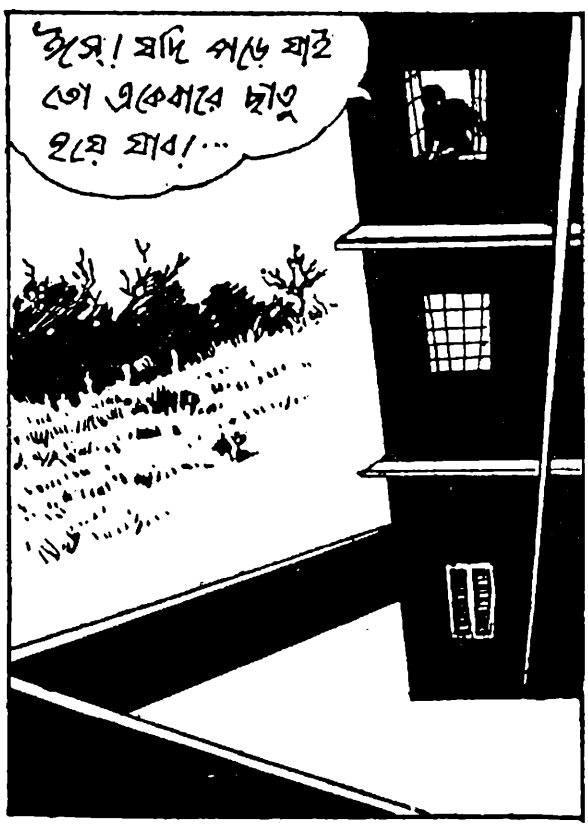
ঈস্! যদি পড়ে যাই তো একেবারে ছাতু হয়ে যাব!…

কি ব্যাপার কথা কইছ না কেন? এই! এই!
চোর সাবধানে জানালার কার্নিশে নেমে পড়ে, এইবার পাইপটা কোনরকমে ধরতে পারলেই হয় কিন্তু, হায়...
ক্রাক কট!
পায়ের তলায় কার্নিশের এক অংশ সশব্দে ভেঙ্গে পড়ল!
কিসের শব্দ? ও বুঝেছি দাঁড়াও!
জানালার কার্নিশে দাঁড়িয়ে তুমি আমায় ফাঁকি দিতে চাও?

অন্ধ জানালার কাছে আসে...
কি বাবা! এবার কোথায় যাবে?
আঃ! আঃ! বাঁচাও!
অন্ধ নীচের দিকে পা বাড়াল, কিন্তু তার পা পড়ল ভাঙা কার্নিশের ফাঁকে, পরক্ষণেই তার দেহ শূন্যপথে ছিটকে পড়ল...

লোকটা শেষে অপঘাতে মরল — আরে! আরে! করে কি!
কিন্তু মরিয়া না মরে রাম' — হঠাৎ হাত বাড়িয়ে অন্ধ জানালার কাঠ ধরে ফেলল...
ওঃ! পড়ে গেলাম! বাঁচাও!
চোর এবার জানালা টপকে ঘরের ভিতর প্রবেশ করল..
প্রচন্ড ঠান্ডায় অসাড় হাতের আঙ্গুলগুলি আর দেহের ওজন ধরে রাখতে পারে না — অন্ধ বুঝতে পারে তার মুঠো জানালা থেকে ক্রমশঃ আলগা হয়ে যাচ্ছে...
বাঁচাও! বাঁচাও! বাঁচাও!....

হুঁহাৎ!

কি মশাই! এবার যদি হাত ছেড়ে দি?

কি চুপ করে গেলেন যে? ... শুনুন, আমি আপনাকে বাঁচাতে পারি, কিন্তু একটা শর্ত আছে — আমায় ছেড়ে দিতে হবে আর আপনার টাকা ও আমি ফিরিয়ে দেব না...
আগে আমায় টেনে তোল পরে তোমার শর্তের কথা আমি বিবেচনা করে দেখব। ... নাও, তাড়াতাড়ি কর, এভাবে শূন্যে ঝুলতে ভালো লাগে না...

না, আগে আপনাকে কথা দিতে হবে .... তাড়াতাড়ি বলুন, এবার কিন্তু হাত ছেড়ে দেব।
কথা দিলেই কি লোকে কথা রাখে?

ইতরে রাখে না ভদ্রলোকে রাখে। আমি জানি প্রতাপ চৌধুরী সত্যিকার ভদ্রলোক।
তাহলে এই কথাটাও জেনে রাখো সত্যিকার ভদ্রলোক কখনও অন্যায়ের সাথে আপোষ করে না — তোমার যা খুশি তুমি তাই করতে পারো...
আপনি দেখছি ভাগেন তো মচকান না, এখনই যদি আরে! আরে!
!!!
হঠাৎ একটা দারুণ ঝাঁকানি দিয়ে প্রতাপবাবুর দেহটা শূন্যে দুলে উঠল পরক্ষণেই তাঁর বাঁহাতটা বিদ্যুৎবেগে নীচের থেকে ছিটকে এসে জানালার কাঠ চেপে ধরল। চোর সচমকে হাত ছেড়ে দিল বটে কিন্তু জানালার কাঠ ততক্ষণে অন্ধের ডানহাতের কঠিন মুঠিতে ধরা পড়ে গেছে...

চোর মানুষের মত চেয়ে থাকে, পালাবার কথা মনে হয় না।
কিরে কোথায় গেলে?
চোরের চমক ভাঙে সে দরজার দিকে দৌড় দেয়
বাবার জুতোয় শব্দ হয় না, কিন্তু ভাঙা টেবিলটাই গোলমাল বাধালে।
তিন ঠ্যাং তুলে টেবিলটা মাটিতে পড়ে ছিল, চোরের পা লেগে সেটা খটাং করে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে শব্দ লক্ষ্য করে অন্ধ ঝাঁপ দিল...

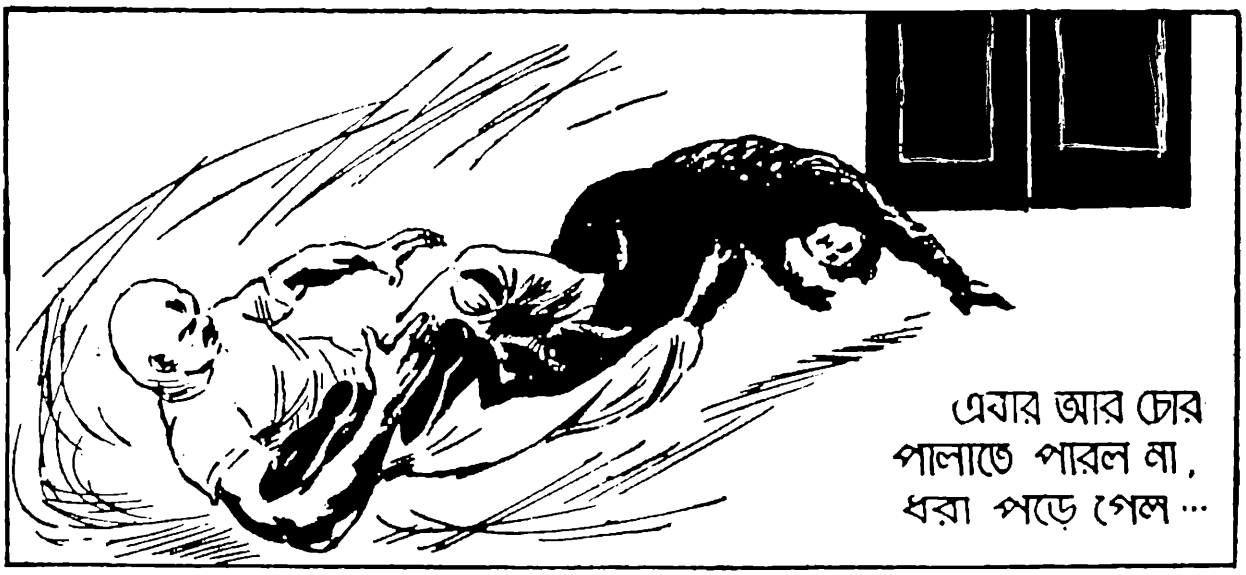
এবার আর চোর পালাতে পারল না, ধরা পড়ে গেল…

এবার কি হয়?
হাতটা আগে ভেঙ্গে ফেলুন, পরে পুলিসে দেবেন।

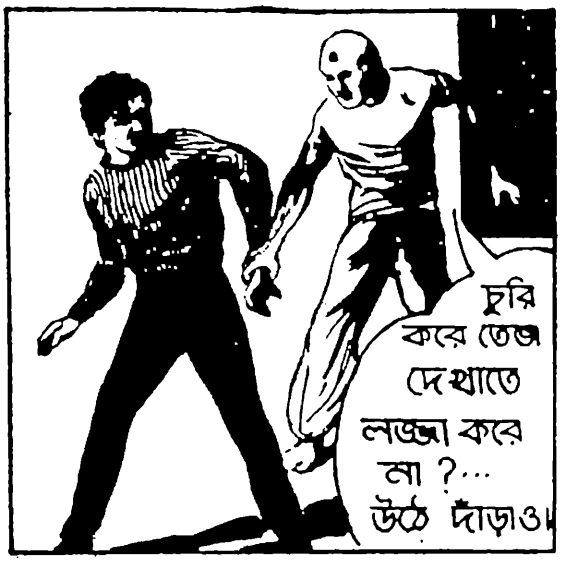
চুরি করে তেজ দেখাতে লজ্জা করে না?… উঠে দাঁড়াও।

চোররা তো শুনেছি সঙ্গে ছুরি ছোরা রাখে,— তোমার কাছে কিছু নেই?
না, আমি মানুষ খুন করি না।

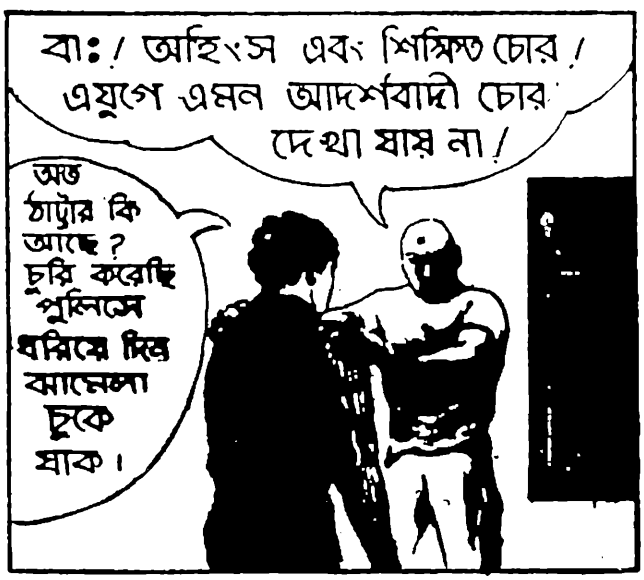
বাঃ! অহিংস এবং শিক্ষিত চোর! এযুগে এমন আদর্শবাদী চোর দেখা যায় না!
অত ঠাট্টার কি আছে? চুরি করেছি পুলিসে ধরিয়ে দিন ঝামেলা চুকে যাক।

লেখাপড়া শেখার খোঁটা দিচ্ছেন? আই.এ পরীক্ষা দিয়েছি — হঠাৎ বাবা মারা গেলেন। মা আর একটি ছোট বোনকে নিয়ে চোখে সর্ষেফুল দেখলাম। কত চেষ্টা করলাম চাকরির জন্য — কি হল?
শেষ পর্যন্ত দেখলাম নীতির ধ্বজা তুলে যদি বাঁচার চেষ্টা করি তাহলে মা বোনকে নিয়ে তিল তিল করে না খেয়ে মরতে হয়। অতএব নীতির মাথায় চাবুক মেরে চুরি বিদ্যা ধরলাম — তাই আজ আমি শিক্ষিত চোর, আপনাদের বিদ্রূপের পাত্র!...
সবই তো বুঝলাম,— তা তোমার নামটি কি? চোর চূড়ামণি বলে তো আর ডাকা চলে না!
নাম ধরে আপনাকে ডাকতে হবে না। পুলিসের কাছেই নাম ধাম সব জানাব।
কি বিপদ! পুলিস কি তোমায় চাকরি দেবে?
য়্যাঁ? তার মানে?
বাঃ! আমার প্রাইভেট সেক্রেটারির নামটা তো আমার জানা দরকার!
আপনি আমাকে — একটা চোরকে বিশ্বাস করতে পারবেন?
পারব। তুমি ধরেছিলে বলেই আমার প্রাণ বাঁচল — তোমায় বিশ্বাস করতে পারব না? বল, তোমার নাম কি?
চোর তার নাম বলেছিল, কিন্তু আমি বললাম না। অতীতের অন্ধকার থেকে যে মানুষ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে এল, সেদিনের লক্ষ্যভ্রষ্ট যুবকের নাম উল্লেখ করে তাকে লজ্জা দেবার প্রয়োজন নেই।
ময়ূখ চৌধুরী

রূপকথা নয়

রূপকথা নয়, সত্য ঘটনা।

ছোটবেলায় যে ড্রাগনের গল্প শুনে আমরা ভয়ে শিউরে উঠতাম, পরিণত বয়সে সেই রূপকথার রাক্ষস হঠাৎ আমার উপর হানা দিল জীবন্ত দুঃস্বপ্নের মত!

সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথাই আজ বলব।

আমি আমেরিকার নাগরিক, আমার নাম ব্রাউন — ষ্টিভ ব্রাউন। জাভা অর্থাৎ যবদ্বীপে আমি তখন আস্তানা বেঁধেছি।

এই দ্বীপের মধ্যে বোগর শহরের একপ্রান্তে একটা ছোট রেঁস্তরায় বসে একদিন রাত্রিবেলা নৈশভোজের শেষে ধূমপান করছি এমন সময়ে ...

হ্যালো মিঃ ব্রাউন! একা একা বসে কি ভাবছেন? কোনও সঙ্গী জুটল না?

আরে! হের ভন্ ইফেন! আসুন!... আপাততঃ আমাকে নিঃসঙ্গ মনে করার কোনও কারণ নেই...

হের ভন্ ইফেন-এর মত এমন একজন চমৎকার সঙ্গী থাকতেও কেউ যদি আমায় নিঃসঙ্গ মনে করে তাহলে আমি তার বুদ্ধির প্রশংসা করতে পারব না!
বাঃ! আপনি তো বেশ সুন্দর কথা বলতে পারেন!... কিন্তু এতক্ষণ চুপ... চাপ বসে কি ভাবছিলেন?

না, এমন কিছু নয় — মানে হয়ে ... না, ও কিছু নয় ... নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপার!
আপনার ব্যক্তিগত বিষয়ে প্রশ্ন করা উচিত নয়। মিঃ ব্রাউন! আমার অন্যায় কৌতূহলের জন্য ক্ষমা চাইছি।
না, না, আপনার কিছু অন্যায় হয় নি। ব্যাপারটা অতি তুচ্ছ, তাই বলতে চাই না --
যদি আপনার বিশেষ আপত্তি না থাকে তাহলে আমায় সব কিছু খুলে বলতে পারেন।
আপত্তির কিছু নেই। ব্যাপারটা নিতান্তই তুচ্ছ আর হাস্যকর ...

এখানে এসে একটা গুজব শুনতে পাচ্ছি। স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস এখানকার বনে জঙ্গলে নাকি অসংখ্য ড্রাগন ঘুরে বেড়ায়। এই জন্তুগুলি নাকি ভীষণ হিংস্র — একটা বলিষ্ঠ মানুষকে একটা ড্রাগন অতি সহজেই টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে পারে ... আমি অবশ্য এসব বাজে গল্প বিশ্বাস করি না, তবে —
ওদের কথা সম্পূর্ণ সত্য। ড্রাগন সত্যিই আছে!
হের ভন ইফেন! আপনি একজন সুসভ্য ওলন্দাজ — এইসব আজগুবি গল্প আপনি বিশ্বাস করেন? আপনি নিজে কখনও ড্রাগন দেখেছেন?
দেখেছি। শুধু আমি নই — আপনি বোধহয় জানেন না গত ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে একদল প্রাণীতত্ত্ববিদ্ এই অঞ্চলে ড্রাগনের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। জাভা দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত কোমোডো এবং অন্যান্য কয়েকটা দ্বীপে আজও এই অতিকায় সরীসৃপ-জাতীয় জীব বাস করে ...
তবে আজকাল গভর্নমেন্ট সবাইকে ড্রাগনের আস্তানায় প্রবেশ করার অনুমতি দেয় না।
হের ভন ইফেন! আমি ঐ দ্বীপে অনুসন্ধান করব — ওলন্দাজ গভর্নমেন্টের অনুমতি নিতে আমার অসুবিধা হবে না ...

গভর্ণমেন্টের অনুমতি নিয়ে জাহাজের সাহায্যে আমি একটা অখ্যাত দ্বীপে উঠলাম এবং সেখান থেকে একটা নৌকা ভাড়া করে দু'জন স্থানীয় অধিবাসীকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করলাম কোমোডো দ্বীপের উদ্দেশ্যে...
আমাদের নৌকা কোমোডো দ্বীপে ভিড়ল...
আমার সঙ্গীদের নাম বারোসি এবং অনোডা। শেষোক্ত লোকটি ড্রাগনের আস্তানায় হানা দিতে রাজি হল না — আমি বারোসিকে সঙ্গে নিয়ে দ্বীপের ভিতর প্রবেশ করলাম ...

দ্বীপের ভিতর ঘন বন-জঙ্গলে এবং ঘাসজমির উপর দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম — হঠাৎ ...
মিঃ ব্রাউন! দেখুন — ঘাসগুলো ভীষণ কাঁপছে!
ঐযে!
সাবধান বারোসি! জন্তুটা আমাদের আক্রমণ করবে!

ঘন ঘাসঝোপের আড়াল থেকে মাঠের উপর আত্মপ্রকাশ করলে এক বিপুলবপু বন্য বরাহ! জন্তুটা আমাদের দিকে ছুটে এল...
লক্ষ্যস্থির করে গুলি ছুঁড়লাম। আহত বরাহ একটু ছটফট করে স্থির হয়ে গেল...

শুয়রের মাংসের লোভে এখানে ড্রাগন আসতে পারে।
তাই নাকি? তাহলে এটাকে পাহাড়ের উপরে নিয়ে চলো। ঘন ঘাসের মধ্যে ড্রাগনের সঙ্গে দেখা হলে আমরা বিপদে পড়ব!
একটা গাছের ডাল কেটে মরা শুয়রটাকে ঝুলিয়ে আমরা পাহাড়ের দিকে যাত্রা শুরু করলাম...
ঐ পাথরগুলোর আড়াল থেকে আমরা মরা জন্তুটাকে সহজেই লক্ষ্য করতে পারব।
পাহাড়ের উপর এসে আমরা শূকরের মৃতদেহটাকে নামিয়ে রাখলাম...

আমি একটা ঠ্যাং কেটে নেব। শুয়োরের মাংসের স্টেক খেতে বড় ভালো!
চমৎকার জায়গা! ড্রাগন এলে আমাদের দেখতে পাবে না।
ঠিক বলেছ। এখন চলো বারোসি, চারদিকটা একবার ভাল করে দেখে আসি।
ঠ্যাংটা এখানে রেখে দিলাম ফিরে এসে আগুনে ঝলসে খাওয়া যাবে..
বারোসি! একটা অদ্ভুত পায়ের দাগ!
মাটির উপর এক জায়গায় হঠাৎ আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল...
ড্রাগনের পায়ের দাগ!

পদচিহ্ন অনুসরণ করে আমরা এগিয়ে চললাম...
মিঃ ব্রাউন! সাবধান!
দেখছেন কি! গুলি করুন!
উঃ!

গুলি করুন মিঃ ব্রাউন!

দনেন! দনেন!
উপরি-উপরি দু'বার গুলি ছুঁড়লাম কিন্তু সেই বিরাট সর্পদানব একটুও কাবু হল না। আমি পাগলের মত গুলিবৃষ্টি করতে লাগলাম...

সাপটা মরেছে! খুব বেঁচে গেছি!
অবশেষে সেই রাক্ষুসে সরীসৃপ গাছের উপর থেকে সশব্দে মাটিতে আছড়ে পড়ল —তার মাথাটা গুলির আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে...

মিঃ ব্রাউন! এ যাত্রা আমরা খুব বেঁচে গেছি!
বারোসি! কথাটা বড় তাড়াতাড়ি বললে — বিপদ এখনও কাটেনি!
আমার সঙ্গে আর গুলি নেই! জঙ্গলের মধ্যে যদি হঠাৎ কোনও জন্তু আক্রমণ করে তাহলে অবস্থাটা কি হবে?
গুলি নেই! সর্বনাশ!
তাড়াতাড়ি পা চালাও বারোসি — নৌকায় উঠে পড়লে আর ভয় নেই!
নৌকায় ওঠার আগে পাহাড়ে উঠতে হবে — শুয়রের ঠ্যাংটা নিয়ে যাব...
দ্বীপে যখন থাকা হল না তখন আর শুধু ঠ্যাং কেন? আস্ত শুয়রটাকে ঝুলিয়ে নিয়ে যাব — রাতের ভোজটা জমবে ভাল...

আমাদের চোখের সামনে যে দৃশ্য ফুটে উঠল তার জন্য আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না —
শূকরের মৃতদেহটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে দুটো বীভৎস জানোয়ার —
ড্রাগন !

প্রচন্ড দংশনে শুয়রের শক্ত চামড়া ঠিক পাতলা কাগজের মত ছিঁড়ে গেল! দ্বিতীয় ড্রাগনটা এবার এগিয়ে এসে ভোজের অংশ গ্রহণ করলে...

আমরা ঝোপের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে পাথরগুলোর দিকে এগিয়ে চললাম। পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিতে পারলে কিছুটা নিরাপদ হওয়া যাবে...

বারোসি হঠাৎ লাফিয়ে উঠে পাথরগুলোর দিকে ছুটতে শুরু করলে…
প্রকাণ্ড লাফ মেরে বারোসি পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি বুঝলাম দারুণ আতঙ্কে বেচারার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে…
আ-আ-আ-আ!…
হিস্স্স্-স্স্-স্স্!…
পাথরের আড়াল থেকে ভেসে এল বারোসির তীব্র আর্তনাদ এবং পরক্ষণেই সেই আর্তস্বরকে ডুবিয়ে জাগলো এক হিংস্র গর্জনধ্বনি!
সর্বনাশ! ওই পাথরের আড়ালে শুয়রের কাটা ঠ্যাংটা ছিল! একটা ড্রাগন বোধহয় মাংসের গন্ধে ওখানে এসে শূকর-মাংসের সদ্ব্যবহার করছিল আর বারোসি ওই জন্তুটার মুখেই লাফিয়ে পড়েছে!

পাথরের উপরে লাফিয়ে উঠতেই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল এক ভয়াবহ দৃশ্য

হঠাৎ বারোসি কোমরের খাপ থেকে ছোরা বার করলে...
ছোরার খোঁচা খেয়ে ড্রাগন বারোসির পা ছেড়ে দিল বটে কিন্তু...
পরমুহূর্তেই বিকট মুখব্যাদান করে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল — একজোড়া বলিষ্ঠ চোয়ালের কঠিন নিষ্পেষণে ধরা পড়ল বারোসির ছোরাশুদ্ধ হাত!
ওঃ! এখনই বারোসির হাত ছিঁড়ে ফেলবে!

বারোসি! ভয় নেই—
আমি আসছি!

রাইফেলটাকে মুগুরের মত
বাগিয়ে ধরে ড্রাগনের
মাথার উপর
সজোরে আঘাত করলাম...

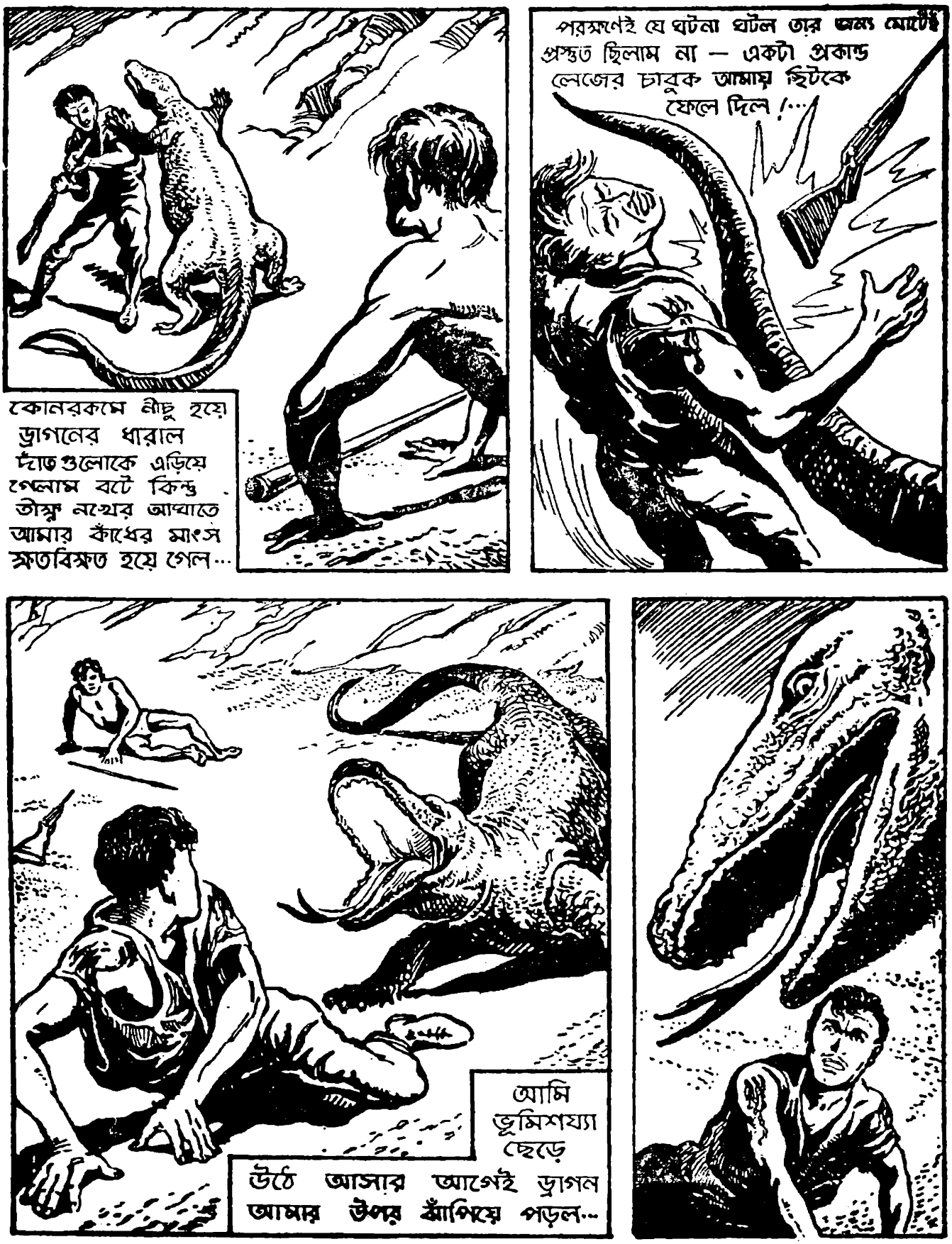
কোনরকমে নীচু হয়ে ড্রাগনের ধারাল দাঁতগুলোকে এড়িয়ে গেলাম বটে কিন্তু তীক্ষ্ণ নখের আঘাতে আমার কাঁধের মাংস ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল...
পরক্ষণেই যে ঘটনা ঘটল তার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না — একটা প্রকাণ্ড লেজের চাবুক আমায় ছিটকে ফেলে দিল!...
আমি ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠে আসার আগেই ড্রাগন আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল...

একটা বলিষ্ঠ লাঙ্গুলের প্রচন্ড চাবুক তৎক্ষণাৎ বারোসির দেহের উপর আছড়ে পড়ল...

জন্তুটার দৃষ্টি তখন বারোসির দিকে
— আমি সেই সুযোগে একপাশে সরে গেলাম ...
ড্রাগনের সুদীর্ঘ লাঙ্গুল আবার ছোবল মারল ...

বারোসির ছোরা এইখানে পড়ে গেছে!
হঠাৎ মাটির উপর কি যেন একটা কিছু সূর্যের আলোয় চকচক করে উঠল...

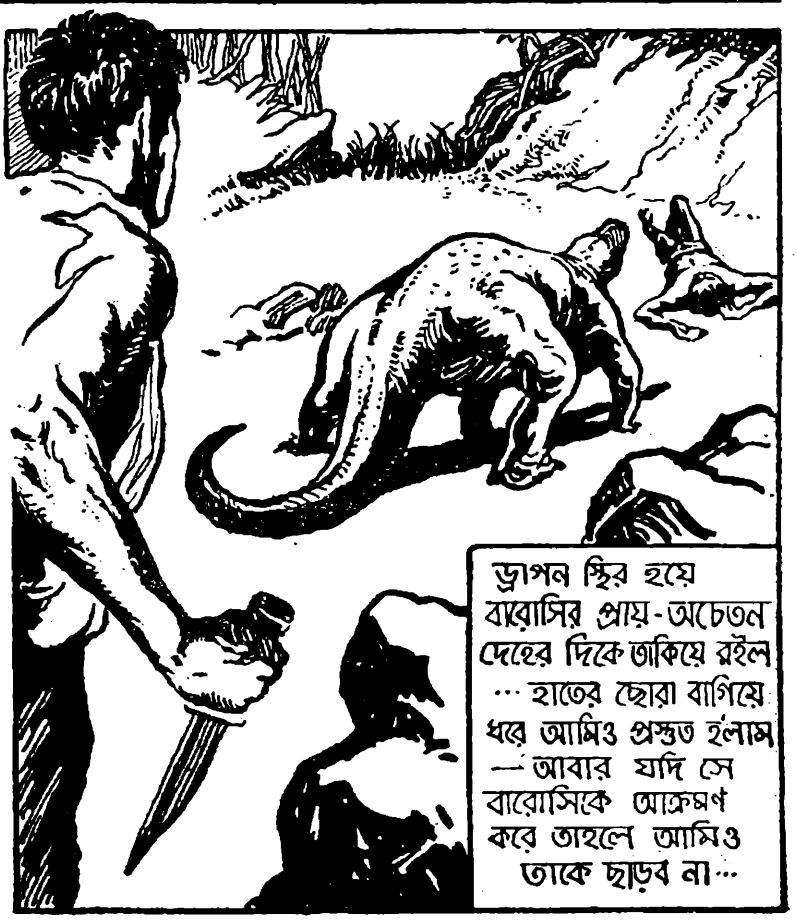
ড্রাগন স্থির হয়ে বারোসির প্রায়-অচেতন দেহের দিকে তাকিয়ে রইল ... হাতের ছোরা বাগিয়ে ধরে আমিও প্রস্তুত হলাম — আবার যদি সে বারোসিকে আক্রমণ করে তাহলে আমিও তাকে ছাড়ব না...

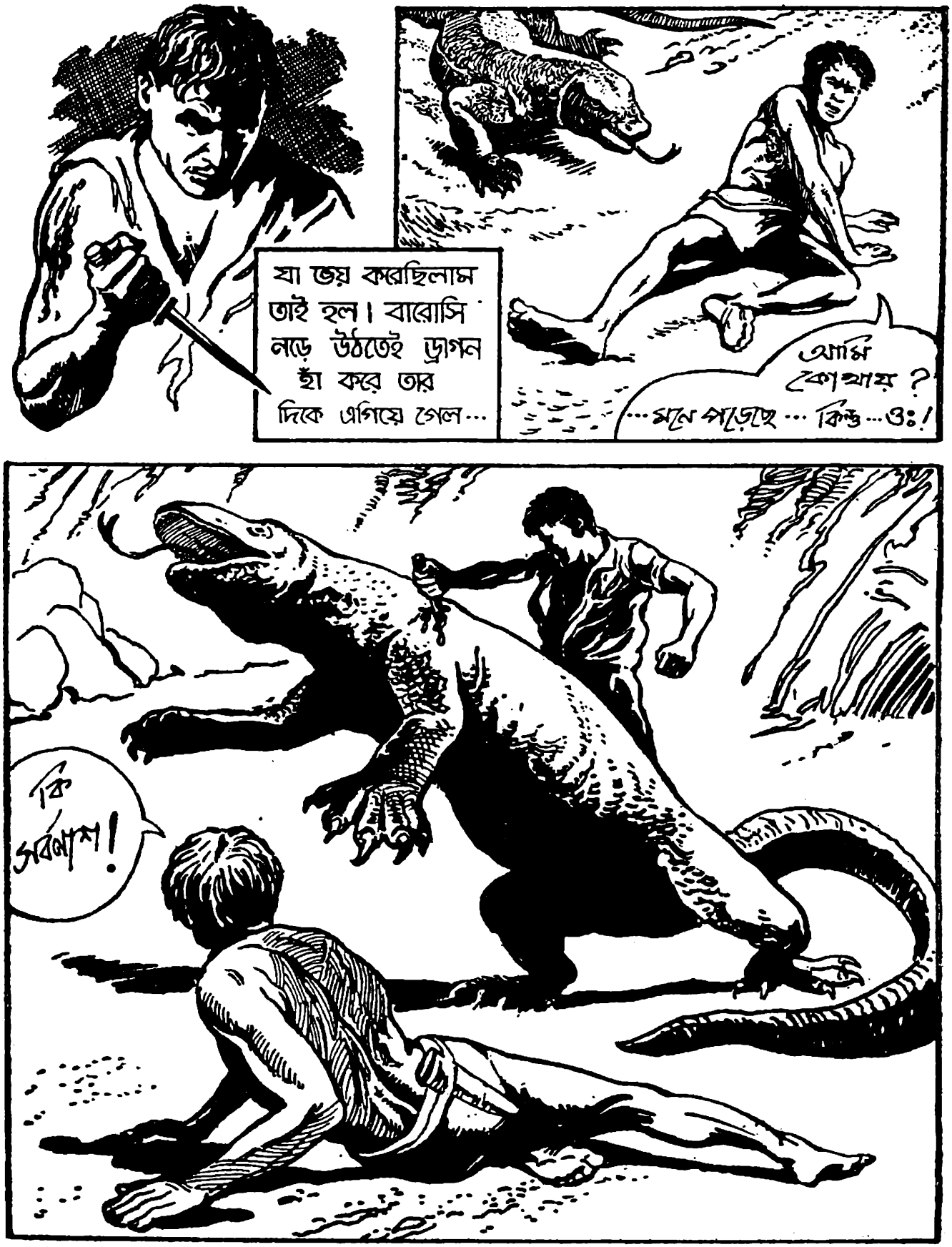
যা ভয় করেছিলাম তাই হল। বারোসি নড়ে উঠতেই ড্রাগন হাঁ করে তার দিকে এগিয়ে গেল...
আমি কোথায়?
...মনে পড়েছে... কিন্তু...ওঃ!
কি সর্বনাশ!

সাবধান মিঃ ব্রাউন! লেজে সামলে!

এবার আমি সাবধান ছিলাম লেজের চাবুক আমার গায়ে লাগল না...

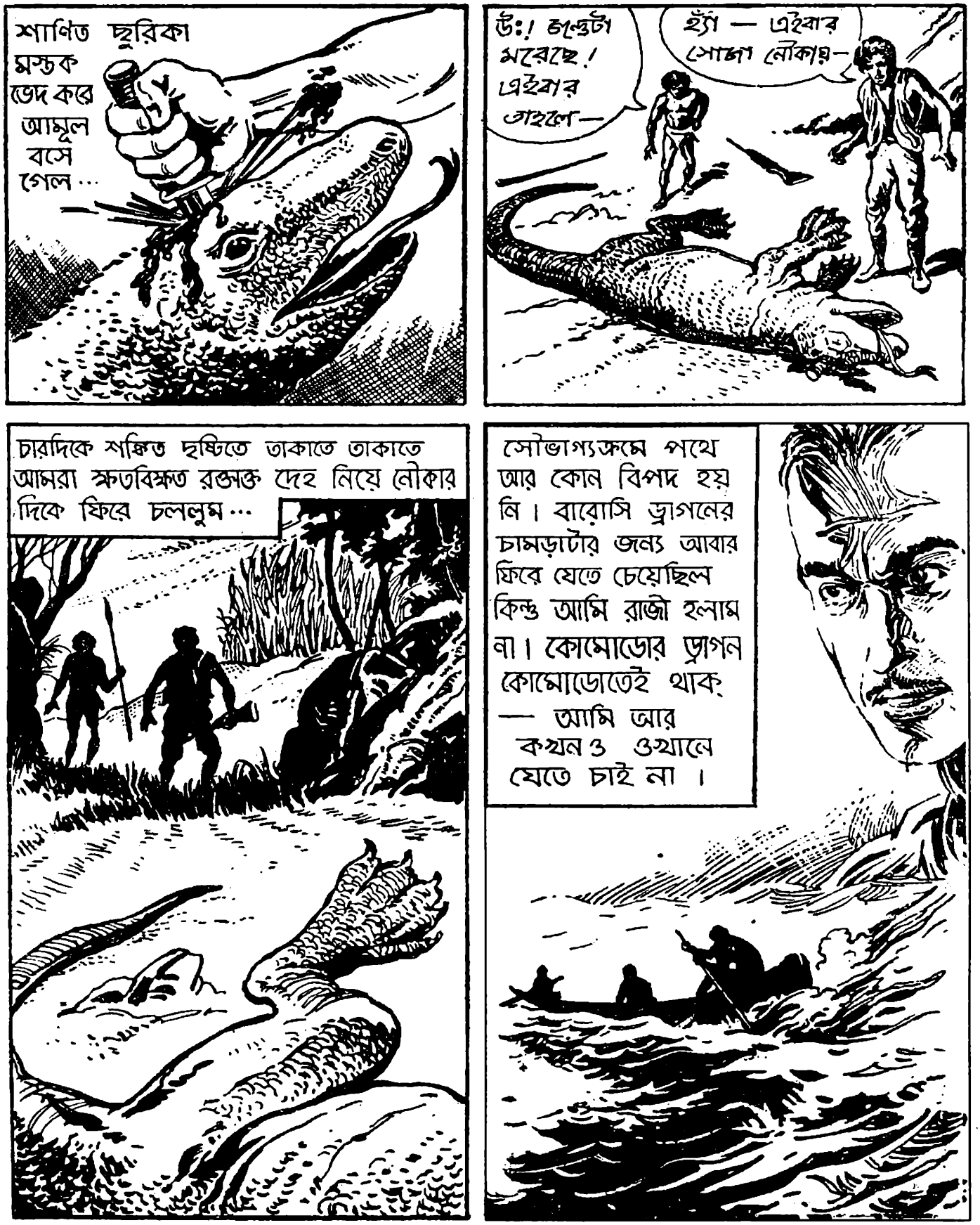
শাণিত ছুরিকা মস্তক ভেদ করে আমূল বসে গেল…
উঃ! জন্তুটা মরেছে! এইবার তাহলে—
হ্যাঁ — এইবার সোজা নৌকায়—
চারদিকে শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে আমরা ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত দেহ নিয়ে নৌকার দিকে ফিরে চললুম…
সৌভাগ্যক্রমে পথে আর কোন বিপদ হয় নি। বারোসি ড্রাগনের চামড়াটার জন্য আবার ফিরে যেতে চেয়েছিল কিন্তু আমি রাজী হলাম না। কোমোডোর ড্রাগন কোমোডোতেই থাক্ — আমি আর কখনও ওখানে যেতে চাই না।

সাহেব
নির্বেদ রায় লিখিত কাহিনী অবলম্বনে
কমিক্স!
প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর মৃত্যুফাঁদ ভেদ করে শুরু হয় মানুষের জয়যাত্রা — অন্ধকার থেকে আলোকের পথে ...
চিত্রনাট্য ও চিত্রণ - রাজো রায়

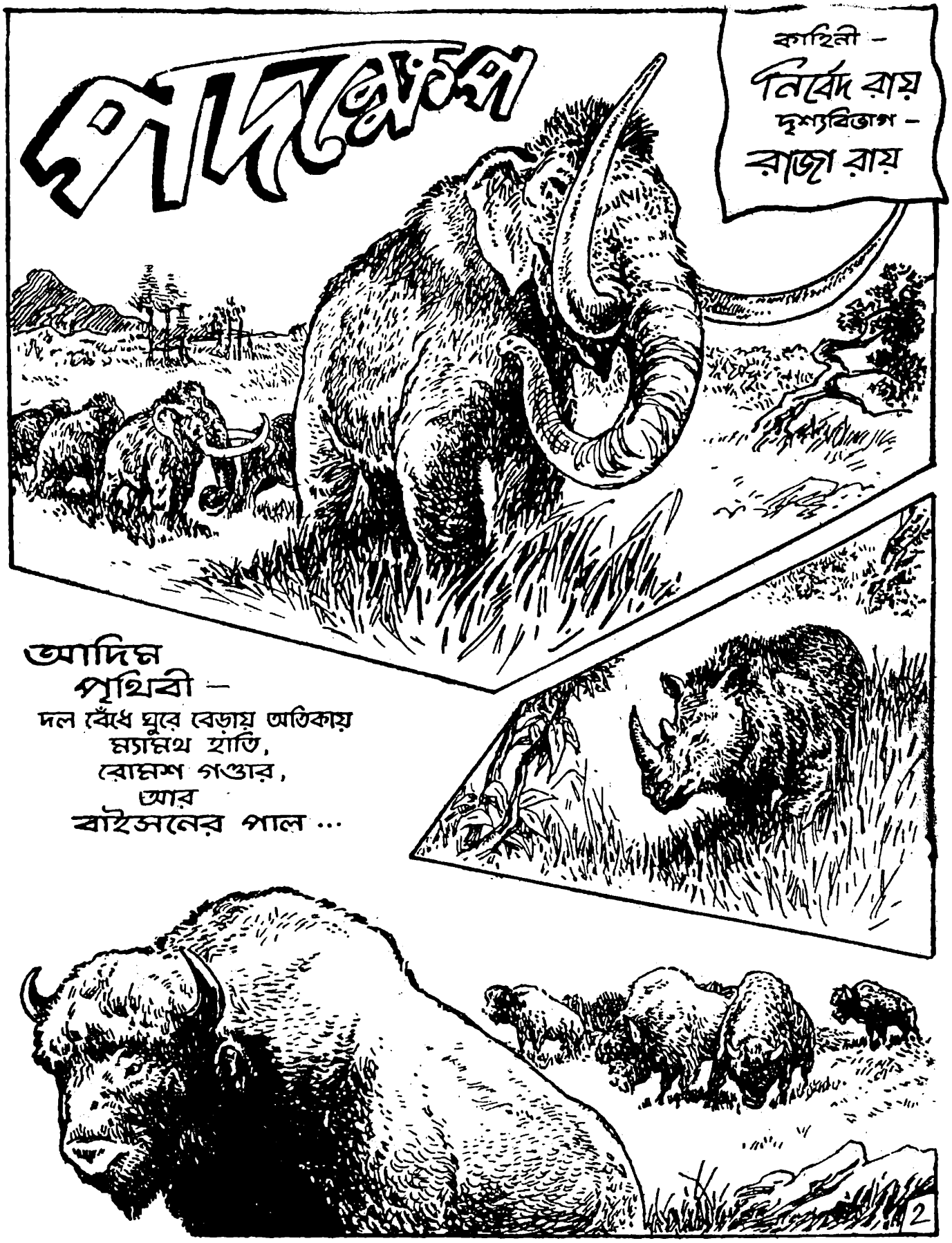
পদচিহ্ন
কাহিনী –
নির্বেদ রায়
দৃশ্যবিভাগ –
রাজা রায়
আদিম
পৃথিবী –
দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায় অতিকায়
ম্যামথ হাতি,
রোমশ গণ্ডার,
আর
বাইসনের পাল ...
2

উল্টোদিকে বাতাস বইছে, তাই একটু দূরে ঘাস-ঝোপের ভিতরে লুকিয়ে-থাকা শত্রুর গায়ের গন্ধ টের পায় না বাইসন-দলপতি...
শুধু শ্বাপদ নয়, দূর পাহাড়ের উপর থেকে বাইসন-দলপতিকে লক্ষ্য করতে থাকে একাধিক দ্বিপদ শত্রু...
হঠাৎ দলকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে ওঠে দলপতি— বিপদের সংকেত!
না, খাঁড়া-দেঁতো নয়, তার চেয়েও ভয়ংকর বিপদের আভাস পেয়েছে দলপতি...
পালাও! দেবতার খিদে পেয়েছে!
লাফ দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় খাঁড়াদেঁতো, এগিয়ে আসছে ক্ষুধার্ত বিভীষিকা— মহিষ, বাঘ বা মানুষ, কিছুতেই তার অরুচি নেই!

গুর-গুর-গুর-গুর!
শোনো! পাহাড়ের ভিতর থেকে আগুন-দেবতা গর্জন করছে!
এখনই সে ছুটে আসবে সবাইকে খেতে! তাই পালিয়ে যাচ্ছে হাতি, মোষ আর খাঁড়াদেঁতো বাঘ!
গুর-গুর-গুর-গুর!...
গুর-গুর-গুর!...

পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে আগুন-দেবতা! জন্তুরা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পালাচ্ছে, কিন্তু আমরা সাঁতার জানি না - আমাদের এখানেই দাঁড়িয়ে মরতে হবে।
সর্দার লেবও! আমি এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরতে রাজী নই। সাঁতার না জানলেও আমি নদী পেরিয়ে পালাব ...
আগুন আমাকে ধরতে পারবে না।
টোগো নদীর দিকে ছুটছে। কিন্তু ও সাঁতার জানে না - নদী পার হবে কেমন করে?

সর্দার লেবঙ! জলে ভেসে-যাওয়া গাছের গুঁড়ি ধরে নদী পার হতে চাইছে টোগো।
তাই তো দেখছি, আরও কয়েকটা গাছ জলে ভেসে যাচ্ছে বটে, কিন্তু সেগুলো সব মাঝনদীতে গভীর জলে — আমাদের নাগালের বাইরে।
গুঁড়িটাকে ধরেছি! এবার আমি বেঁচে গেলাম। আগুন আর আমাকে ধরতে পারবে না।
আগুন-দেবতাকে ফাঁকি দিতে পেরে টোগো খুব খুশি, কিন্তু সে জানে না নদীর বুকে হানা দিয়ে ফিরছে ক্ষুধার্ত মৃত্যুদূত...

আরে! আরে! জলের রাক্ষস! ... টোগো! তোমার পিছনে তাকাও!
জলের রাক্ষস!
পাহাড়ের উপর থেকে আসন্ন বিপদ দেখে সকলে চমকে উঠল — চিৎকার করে টোগোকে সাবধান করে দিল সর্দার লেবঙ ...
ভয় নেই, টোগো! আমি আসছি।
ডোরান কি বাঁচাতে পারবে টোগোকে ক্ষুধার্ত সরীসৃপের গ্রাস থেকে? ...
ডোরান! যেও না, তুমিও মারা পড়বে।

ছুটে এল ডোরান, কিন্তু উদ্যত বর্শা তার হাতেই রয়ে গেল, মুহূর্তের মধ্যে টোগোকে নিয়ে জলের তলায় ডুব দিল কুমির...
টোগোকে নিয়ে গেল জলের রাক্ষস!
তোমরা দাঁড়িয়ে আছ কেন? পাহাড়ের উপর থাকলে সবাইকে মরতে হবে, আগুন এগিয়ে আসছে। টোগোকে বাঁচাতে পারলাম না, কিন্তু আমরা বাঁচব। একটা গাছ কেটে জলে ভাসিয়ে আমরা নদী পার হব।

সর্দার লেবঙ! আমার বুদ্ধিটা দেখলে তো?... গাছের গুঁড়ি ভাসিয়ে কত সহজে আমরা নদী পার হলাম। এখন শিকারের খোঁজ করতে হবে। শিকার না জুটলে খেতে পাব না।
ডোরান! শিকার পাবই — সব জানোয়ার নদী পার হয়ে এপারে এসেছে।
ঐ যে শিকার!
বুনো শুয়র!
হঠাৎ এগিয়ে এসে বর্শা ছুঁড়ল লেবঙ...
ফস্কে গেল!
অব্যর্থ সন্ধান!

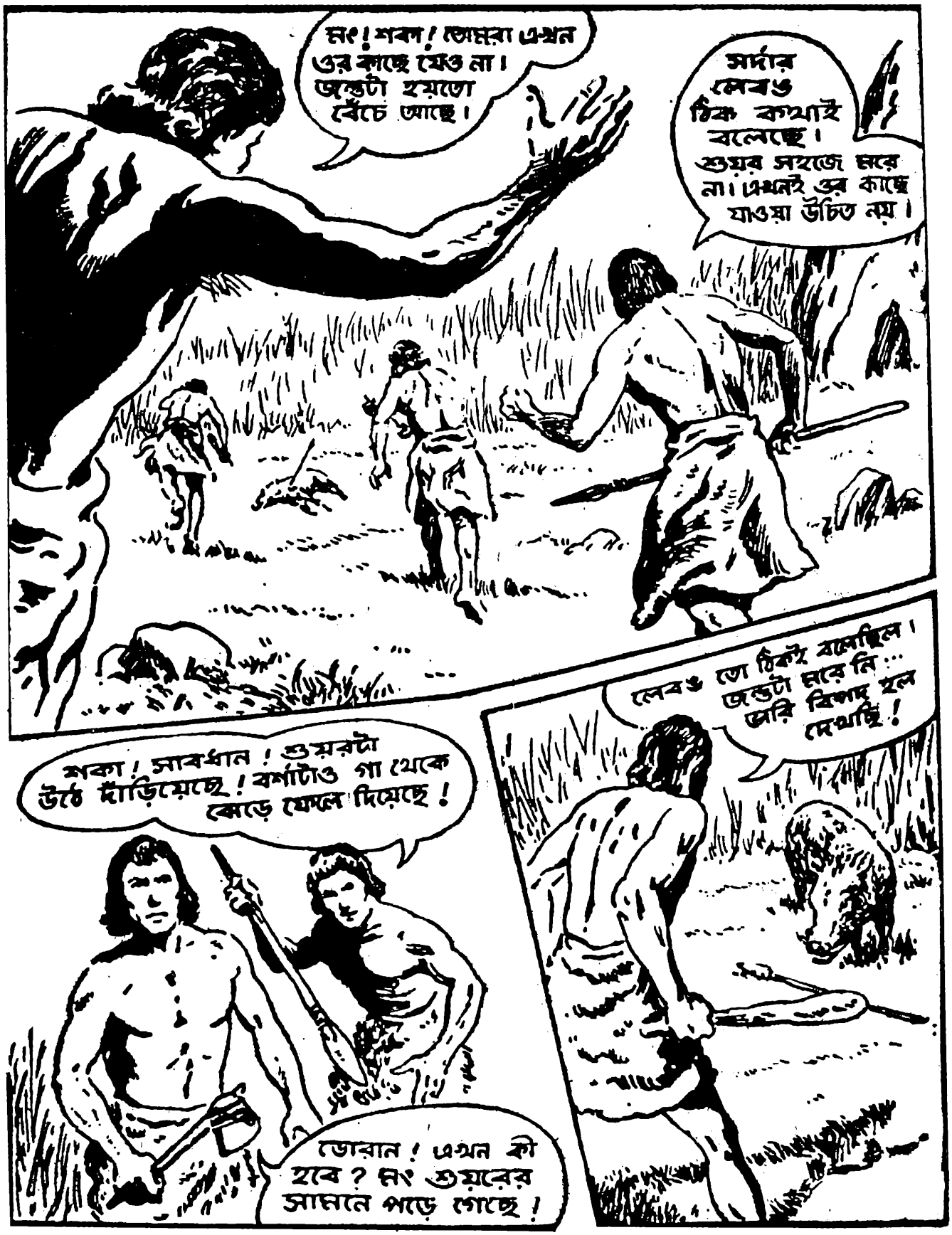
মং! শবল! তোমরা এখন ওর কাছে যেও না। জন্তুটা হয়তো বেঁচে আছে।
সর্দার লেবও ঠিক কথাই বলেছে। শুয়র সহজে মরে না। এখনই ওর কাছে যাওয়া উচিত নয়।
শকা! সাবধান! শুয়রটা উঠে দাঁড়িয়েছে! বর্শাটাও গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে!
ডোরান! এখন কী হবে? মং শুয়রের সামনে পড়ে গেছে!
লেবও তো ঠিকই বলেছিল। জন্তুটা মরে নি... ভারি বিপদ হল দেখছি!

উঃ!
হুংক্!
লেবঙ আর শকা শুয়রের পিছনে ছুটল, কিন্তু মং যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল, সেদিকে কারও খেয়াল নেই। মংকে এভাবে ফেলে রাখা যায় না...
শুয়রটা ঝোপের মধ্যে ঢুকেছে। চলো, শকা! আমরাও ঝাপের মধ্যে ঢুকে ওটাকে মারব।
মংকে নিরাপদ জায়গায় রেখে আসতে হবে।
ম্যা-ও-য়েন্-ন্!
মংএর অচৈতন্য দেহ তুলে নিল ডোরান আর হঠাৎ ঝোপের ভিতর থেকে ভেসে এল রক্ত-জল-করা ভয়ংকর শব্দ!...

আহ-অনর!
শুয়রটাকে তাহলে খাঁড়া দেঁতোই মারল। ও এখন আমাদের উপর ঝাঁপ দেবে। বর্শাটা শুয়রের গা থেকে যেখানে খসে পড়ল, সেখান থেকে তুলে আনা উচিত ছিল – কী ভুল যে করেছি।
এখন কুড়ুল দিয়েই ওর সঙ্গে লড়তে হবে।

গরর!
গর্জনের শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে এল ডোরান এবং ভয়ংকর দৃশ্যটা চোখে পড়তেই থমকে দাঁড়াল...
খাঁড়াদেঁতো!

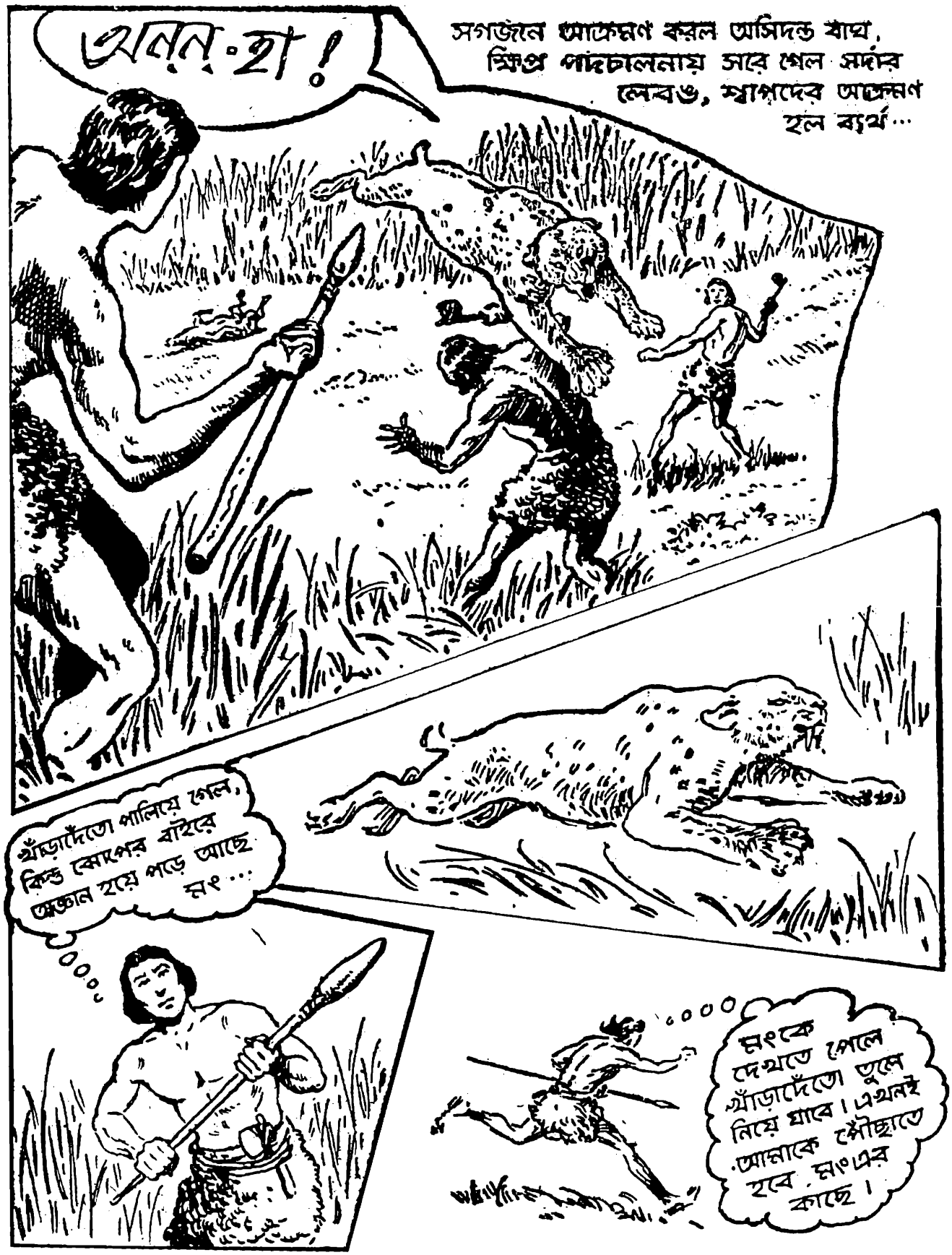
অনন্-হা!
সগর্জনে আক্রমণ করল অসিদন্ত বাঘ, ক্ষিপ্র পাদচালনায় সরে গেল সর্দার লেবঙ, স্বাগদের আক্রমণ হল ব্যর্থ...
খাঁড়াদেঁতো পালিয়ে গেল, কিন্তু ঝোপের বাইরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে মং...
মংকে দেখতে পেলে খাঁড়াদেঁতো তুলে নিয়ে যাবে। এখনই আমাকে পৌঁছাতে হবে মংএর কাছে।

মং নেই! এখানেই তো ওকে রেখে গিয়েছিলাম...
তবে কি খাঁড়াদেঁতো ওকে তুলে নিয়ে গেল?...
না। রক্তের দাগ নেই, মুগুরটাও নেই। মং জ্ঞান ফিরে পেয়ে চলে গেছে—
কিন্তু কোথায়?
দারুণ খিদে পেয়েছে। এতক্ষণে মং আর শকা নিশ্চয় শুয়রের মাংসে ভোজ বসিয়েছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে ভাগ বসানো যাক, পরে মংএর খোঁজ নেব।
আরে! মং!
মং এখানে বরার মাংস খাচ্ছে!
তুমি ঠিক সময়ে এসে পড়েছ মং!
হুঁ, সর্দার! দেরি হলে মাংসের ভালো টুকরোগুলো শেষ হয়ে যেত।

আমিও ঠিক সময়ে এসে পড়েছি।
ডোরান!
ডোরান!
ডোরান!
ডোরান! এদিকে হাত বাড়াবে না। তুমি খাঁড়াদাঁতোকে দেখে পালিয়েছ — এই মাংসে তোমার ভাগ নেই।
ভীতু খরগোশ বর্বার মাংস খায় না, ঘাস খায়। ডোরান! তুমি চলে যাও এখান থেকে।
সৎ! তুমি অকৃতজ্ঞ! তোমাকে বাঘের মুখ থেকে বাঁচানোর জন্যই আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম।

মং ! তুমি যে এমন অকৃতজ্ঞ তা জানতাম না।
বাজে কথা শুনতে চাই না। তুমি চলে যাও এখান থেকে।
মং অকৃতজ্ঞ নয়, তুমি ভীরু কাপুরুষ। আমি দলপতি লেবঙ আদেশ করছি তুমি চলে যাও। ডোরান ! আমার দলে তোমার স্থান হবে না।
লেবঙ ! তোমার দলপতি হওয়ার যোগ্যতা নেই। তোমার আদেশ আমি মানব না। সাহস থাকলে আমার সঙ্গে তুমি লড়াই করো।
শুয়রের ঠ্যাংটা লেবঙ সজোরে ছুঁড়ে মারল ডোরানকে লক্ষ্য করে — অব্যর্থ সন্ধান !

ভোরান তার হাতের বর্শা বাগিয়ে ধরল, সর্দার লেবাঙের সঙ্গে দুই সহচরও উদ্যত অস্ত্র হাতে এগিয়ে এল চরম সংঘর্ষের জন্য, কিন্তু অসীম যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী শোচনীয় পরিণতি ঘটল না…
হঠাৎ দূর থেকে ভেসে এল শ্বাপদকণ্ঠের হিংস্র কোলাহল – নেকড়ে! চমকে উঠে অস্ত্র নামিয়ে নিল চারটি যুযুধান মানুষ ; এগিয়ে আসছে ভয়ংকর বিপদ – এখন কলহের সময় নয়…
উ-উ-উ-উ-উ!
নেকড়ের চিৎকার!
উউ-উ-উ!

আমার পথে একটা গুহা দেখেছি। সেখানে ঢুকে আমরা নেকড়েগুলোকে বাধা দিতে পারি। এখন সবাই চলো আমার সঙ্গে।
শুয়রের মৃতদেহটা তুলে নিয়ে ছুটতে লাগল লেবঙ, দলের সকলে তাকে অনুসরণ করল ...

শুয়রের ঠ্যাংটা তুলে নি, পরে সুবিধা বুঝে খাওয়া যাবে।
সর্দার! আমরা গুহায় পৌঁছে গেছি। এখানে দাঁড়িয়ে আমরা নেকড়েদের বাধা দিতে পারব।

ডোরান! এখানে তোমার জায়গা হবে না।
ডোরানকে চাই না।
ডোরান! তুমি চলে যাও।
উ-উ-উ-উ-উ-উ!...
উ-উ-উ!
তিনজনের সঙ্গে লড়তে গেলে মারা পড়ব...
এদিকে নেকড়ের দল এগিয়ে আসছে...
এখন পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হবে।

অন্ধকার হয়ে আসছে, রাতের জন্য আশ্রয় সন্ধান করতে করতে একটা ছোট পাহাড়ের তলায় এসে পৌঁছাল ডোরান ...
পাহাড়ের উপর একটা গুহা দেখা যাচ্ছে। ওটার মধ্যে ঢুকে রাত কাটানো যাবে।
গুহার মুখটা ছোট কিন্তু ভিতরে বেশ জায়গা আছে।
প্রথমেই কিছু শুকনো ডালপালা আর পাতা দিয়ে একটা বিছানা তৈরি করে ফেলল ডোরান, তারপর একটা মস্ত পাথর গড়িয়ে এনে গুহার মুখটা বন্ধ করল। ডোরান এবার কিছুটা নিশ্চিন্ত – ঘুমের মধ্যে হঠাৎ কোন জানোয়ার তার উপর হামলা করতে পারবে না। এর মধ্যে কয়েকটা বড় বড় পাথরও সে জড়ো করেছে গুহার মধ্যে –
নেকড়ের দল হানা দিলে পাথরগুলো দরকার হবে...
শুয়রের ঠ্যাংটা খেয়ে এখন পেট ভরাই। কাল সকালে নতুন শিকার খুঁজতে হবে।

পাথরটায় পিঠ লাগিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল ডোরান, হঠাৎ পিঠের উপর ধাক্কা পড়তেই তার ঘুম ভেঙে গেল — কে যেন পাথরটা ঠেলে সরাতে চাইছে! তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে পাথরটা চেপে ধরল ডোরান…
সর্বনাশ!
পাথর আর গুহার ফাঁকে চোখ রেখে চমকে উঠল ডোরান — পাথর ঠেলছে খাঁড়াদেঁতো!…
কিছুক্ষণ ঠেলাঠেলি করে সরে এল খাঁড়াদেঁতো… সে কি এইবার চলে যাবে?…

আসন্ন আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য এইবার বর্শা তুলে নিল ডোরান...
পাথরের ফাঁক দিয়ে বর্শা চালাল ডোরান...
ঘেঁয়াওং!
বিদ্যুদ্‌বেগে বর্শাদণ্ড কামড়ে ধরল বাঘ – মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে গেল অস্ত্র ...
মাড়াং!
সর্বনাশ! বর্শা ভেঙে দিল! এবার জন্তুটাকে সামলাব কি করে!
পাথরটা চেপে ধরে খাঁড়াদেঁতোকে বেশীক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারব না। আমার চাইতে ওর গায়ের জোর অনেক বেশী।

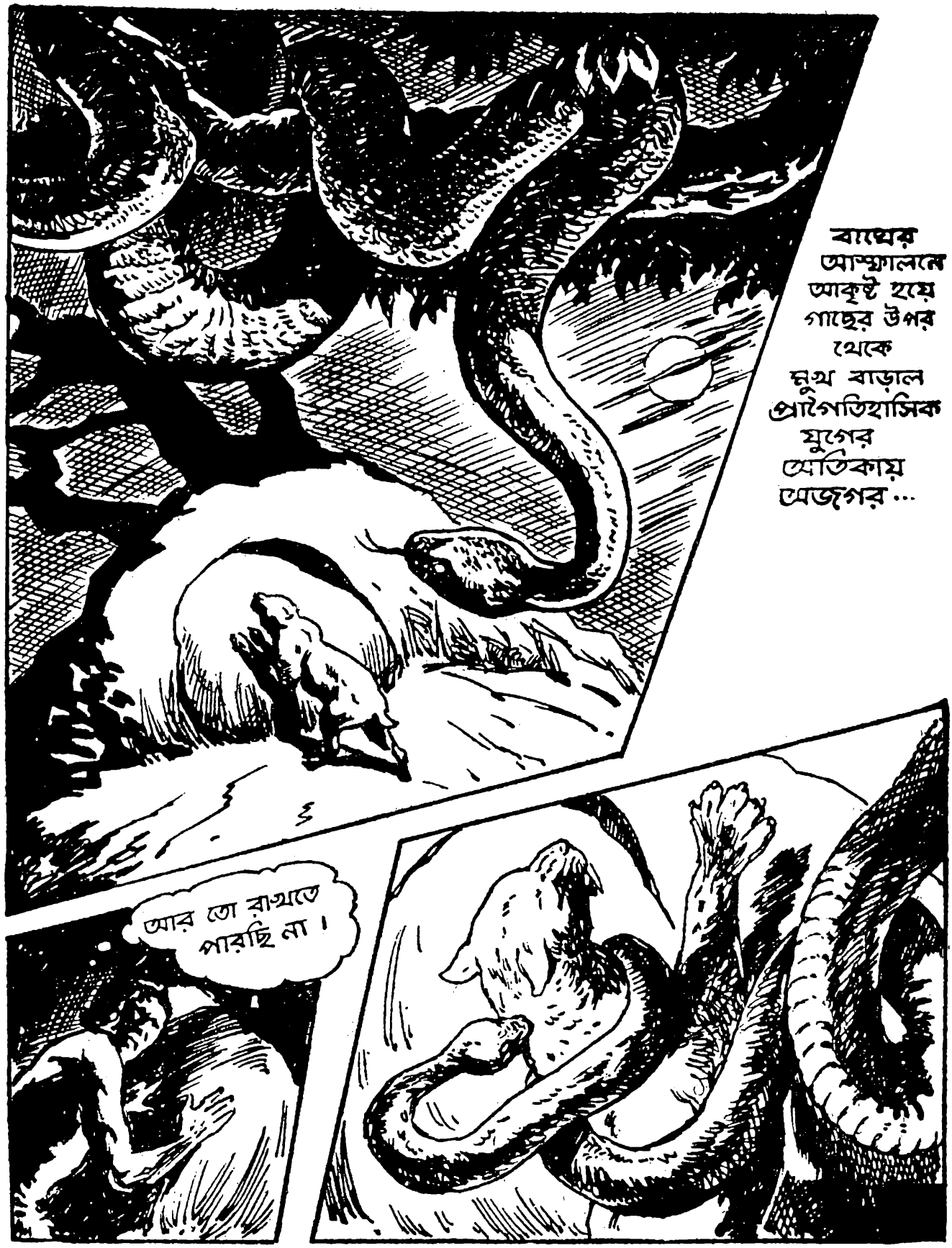
বাঘের আস্ফালনে আকৃষ্ট হয়ে গাছের উপর থেকে মুখ বাড়াল প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় অজগর...
আর তো রাখতে পারছি না।

হঠাৎ পাথরের উপর চাপ আলগা হয়ে গেল কেন?... খাঁড়াদেঁতো কার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে? পাথরটা সরিয়ে দেখি...
ভীষণ ব্যাপার!
যাঃ! দুটোই শেষ হয়ে গেল!
অজগরের আলিঙ্গন থেকে কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করতে না পেরে শূন্যে ঝাঁপ দিল বাঘ...

গরর!
নেকড়ে!
গরর!
একটা দুটো নয়, একপাল নেকড়ে! কোনরকমে গুহায় ঢুকে গুহার মুখ পাথর চাপা দিতে পারলে হয়তো বাঁচতে পারব ...
ডোরান একটা পাথর ছুঁড়ে মারল, ভয় পেয়ে সামনের নেকড়ে দুটো সরে যেতেই ডোরান গুহার দিকে ছুটল ...

ছুটে এসে গুহার মধ্যে প্রবেশ করল ডোরান, বড় পাথরটা সরিয়ে গুহার মুখ বন্ধ করার সময় সে পেল না।, গুহার ভিতর থেকে একটা পাথর তুলে নিয়ে আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল ডোরান। গুহার মুখে এগিয়ে এল দুটো নেকড়ে ...

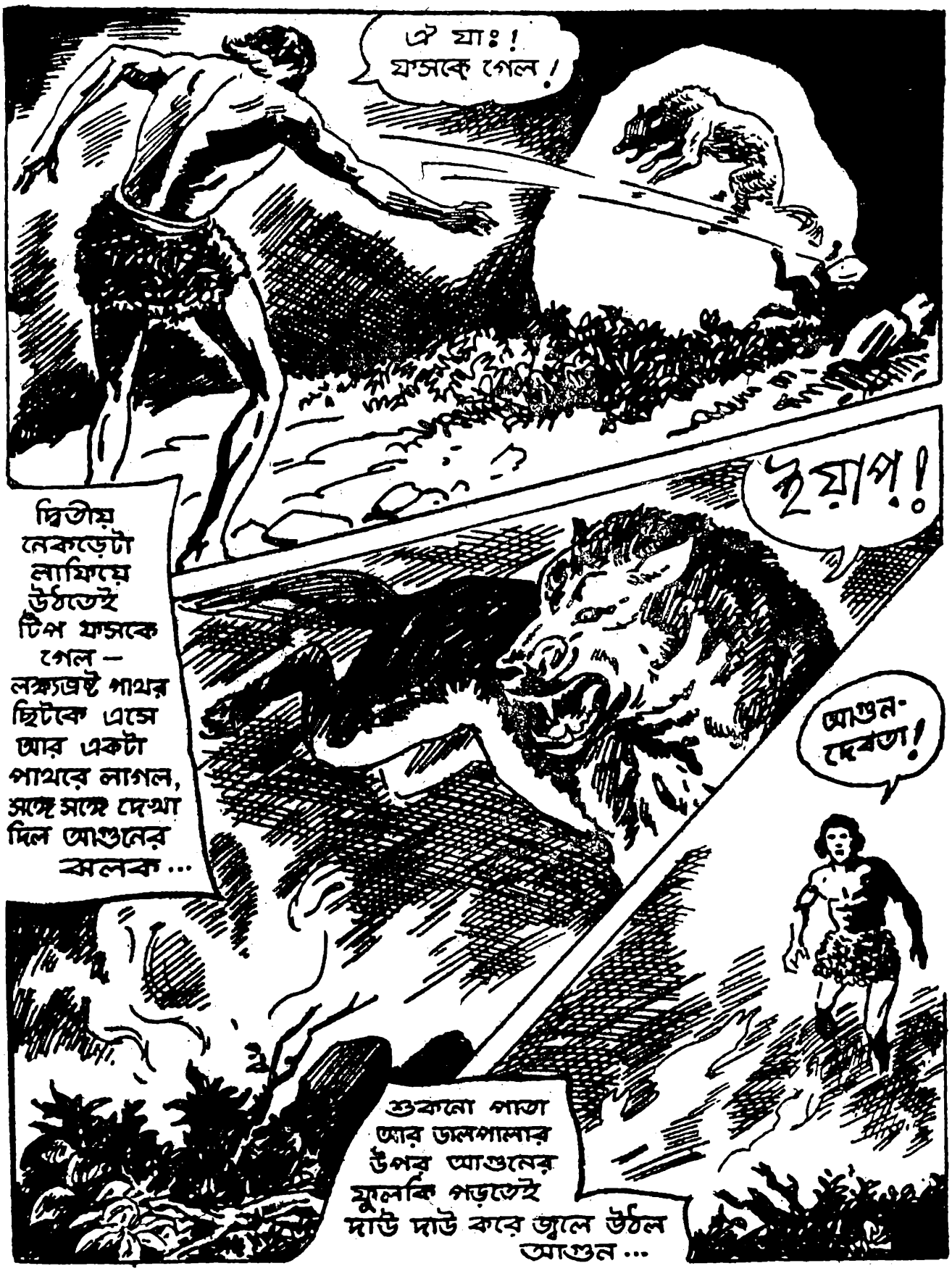
ঐ যাঃ! ফসকে গেল!
দ্বিতীয় নেকড়েটা লাফিয়ে উঠতেই টিপ ফসকে গেল — লক্ষ্যভ্রষ্ট পাথর ছিটকে এসে আর একটা পাথরে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল আগুনের ঝলক...
হুয়াপ!
আগুন-দেবতা!
শুকনো পাতা আর ডালপালার উপর আগুনের ফুলকি পড়তেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন...

ডোরানকে দেখে দলের সবাই স্তম্ভিত! লেবঙের মতো দুর্ধর্ষ যোদ্ধার মুখে স্পষ্ট ভয়ের ছায়া — জীবনে এই প্রথম কোনও মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে লেবঙকে ভয় পেতে দেখল ডোরান।

কিন্তু আজ ডোরান প্রতিশোধ নিতে আসেনি। সে এসেছে দলকে রাত্রিজয়ের মন্ত্র জানাতে, আগুন-দেবতাকে তৈরি করার কৌশল হাতে নিয়ে। ডোরানের হাতের প্রজ্বলিত মশালের আলোয় তখন গুহার অভ্যন্তর আলোকিত, অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে আলোর উজ্জ্বল পথে শুরু হয়েছে মানব-সভ্যতার প্রথম পদক্ষেপ! ...

অপরাধী কে?

গগনচারী

অন্ধকার রাতে শহর কলকাতার এক অভিজাত অঞ্চলে পাইপ বেয়ে উঠছে দুঃসাহসী তস্কর…

এই লোকগুলো খুব উঁচুতে শূন্যে উঠে দোল খেতে ভয় পায় না — আমার বিশ্বাস এদের মধ্যেই কেউ চুরি করেছে।
কোন সূত্র ধরে চোরের সন্ধানে সার্কাসে হানা দিল অনন্ত ?
একটি ছোট ছেলেকে ডাকল অনন্ত ...
খোকা ! এইমাত্র যে-দুজন ট্রাপিজের খেলা দেখাল, ওদের অটোগ্রাফ অর্থাৎ হাতের সই এই নোটবুকে এনে দিতে পারবে ? দুটো টাকা দেব।
হ্যাঁ।
একটু পরেই 'অটোগ্রাফ' এনে দিল ছেলেটি...
এই কলমের উপর থেকে এখন আঙুলের ছাপ বার করতে হবে।
সেই রাতেই আঙুলের ছাপ পরীক্ষা করা হল...
না, অনন্ত - চোরের আঙুলের ছাপের সঙ্গে এই ছাপগুলো মিলছে না।
আমারই ভুল হয়েছে।
সার্কাস
তিন খেলোয়াড়ের শূন্যের উপর রোমহর্ষক ক্রীড়া
একটা ভুল সূত্রের পিছনে ছুটছিলাম বিনয় !
অনন্ত ! বোধহয় তোমার ভুল হয় নি। আবার আমরা সার্কাস দেখতে যাব।
বিনয় কেন ভাবছে অনন্তের ভুল হয় নি ! ভালো করে দেখুন — ছবিতেই উত্তর আছে।
পরের রাত্রে...
ডোরাকাটা প্যান্ট-পরা লোকটাই বোধহয় আমাদের আসামী। কিন্তু অনন্ত - পরখ করব কেমন করে ?
উপায় ভাবতে হবে বিনয়।

১। অপরাধের স্থানে ফরেন মেয়ে অন্তু ব্যবহৃত এই চুরির ব্যবসায়ে কোনও সার্কাসের ট্রাকিক ম্যানেজারও জড়িত আছে। কিন্তুরে: পুরানো মাস্টারের সঙ্গে প্রথম চোরাকে অপরাধের স্থান ছিলেন না, ওরা অনন্ত পর এরপর সম্পর্কে নিশ্চিত হন। সেইসময় কলকাতায় ঘটা একটি সার্কাস উপলক্ষে ছিল বেশ অনেকের কাছে সরেজ হয়ে ফিরেছিল। অনন্ত আগে সার্কাস ট্রাকিক ম্যানেজারের সাথে ফেরিন মাস্টারের ভালো মেলা মেশার — কারণ, সাথে ফেরিন মাস্টারের প্রাকশ স্থান সম্পর্কে পথে সাতপ্রায় ভয় থাকে না।

২। দ্বিতীয় সূত্রটা আরও সরল। সার্কাসের ট্রাকিন ম্যানেজারের অপরাধের স্থান নিয়েছিল অনন্ত, কিন্তু পুরো কাজের অভিজ্ঞ সম্পর্কে তা অবশ্যে ছিল না। সার্কাসের ক্যান্টিনে মেয়ে অন্তের সঙ্গেনী বিনয় পুরো কাজের ভিগ্যিতে জানতে পারে। এই ঘটনায় প্রধান হয় স্থর ক্রিয়ার লোকে ভুল করতে পারে। সাজেন্ট অনন্তও ভুল করেছিল।

— যদি ... ? তো চোর কি করে ধরা পড়ল বলুন তো? বলতে না পারেন, তবে তলায় উত্তর দেখুন

কমিকসের নাম	পত্রিকা ও বই	প্রকাশকাল	
ছদ্মবেশী	ইন্দ্রনীল	আশ্বিন—১৩৭৫	১৯৬৮
দুরন্ত কাহিনী	বেনুবীণা	আশ্বিন—১৩৭৪	১৯৬৭
বঙ্গদেশে রঙ্গ	মণিহার	আশ্বিন—১৩৭৭	১৯৭০
শয়তানের দ্বীপ	নীহারিকা	আশ্বিন—১৩৭২	১৯৬৫
রক্তাক্ত মানচিত্র	অরুণাচল	আশ্বিন—১৩৭৩	১৯৬৬
ঋণশোধ	সন্দেশ	ফাল্গুন—১৩৬৮	১৯৬২
ফাঁদ	পূরবী	আশ্বিন—১৩৭৯	১৯৭২
মবগো	কিশোর ভারতী	আশ্বিন—১৩৮৮	১৯৮১
পেক্কা	সন্দেশ	আশ্বিন—১৩৭০	১৯৬৩
প্রান্তরে মৃত্যুর হানা	নরকের প্রহরী		১৯৮২
বনবাসী বন্ধু	বোধন	আশ্বিন—১৩৮৮	১৯৮১
সাক্ষী ছিল চাঁদ	সন্দেশ/ছুটির ঘণ্টা	কার্তিক—১৩৭৬	১৯৬৯
মহাকালের মন্দির	সন্দেশ/ছুটির ঘণ্টা	কার্তিক-চৈত্র—১৩৭৯	১৯৭২
রবিনহুড (কালো সাপ)	চন্দনা	আশ্বিন—১৩৮১	১৯৭৪
রক্তমাখা চাঁদ	নবকল্লোল	১৩৭১	১৯৬৪
এক নাম অন্য মুখ	সন্দেশ	ফাল্গুন-চৈত্র—১৩৮১	১৯৭৫
		বৈশাখ-আষাঢ়—১৩৮২	১৯৭৫
দ্বৈরথ	সন্দেশ/ছুটির মজা		১৯৯৬
ইতিহাসে অস্ত্র	সন্দেশ/শুকতারা	১৩৮৬	১৯৭৯
ইতিহাসে পলাতক	সন্দেশ/পলাতক		
স্মারক	বিভাবরী	আশ্বিন—১৩৯০	১৯৮৩
যাত্রী	আরাধনা	আশ্বিন—১৩৯১	১৯৮৪
অধ্যাপক ত্রিবেদীর বিচিত্র কীর্তি	কিশোর ভারতী	বৈশাখ—১৩৮০	১৯৭৩
নন্টে আর ফন্টে	কিশোর ভারতী	আশ্বিন—১৩৭৮	১৯৭১
বন্ধু	শুকতারা	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ—১৩৭৯	১৯৭২
মুক্তি পেল রতনলাল	শুকতারা	আষাঢ়-ভাদ্র—১৩৯৭	১৯৯০
অন্ধমাকড়সা	শুকতারা	বৈশাখ-শ্রাবণ-১৩৭২-৭৩	১৯৬৫
রূপকথা নয়	শুকতারা	ভাদ্র-শ্রাবণ-১৩৭৩-৭৪	১৯৬৬
পদক্ষেপ	কিশোর ভারতী	পৌষ-পৌষ—১৩৮৮-৮৯	১৯৮১
অপরাধী কে?	নবকল্লোল	অগ্রহায়ণ--১৩৮৬	১৯৭৯

নারায়ণ দেবনাথ- চিত্রিত ময়ূখ চৌধুরী

শক্তিপ্রসাদ রায়চৌধুরী সাহিত্য – মনোরঞ্জনে একাধিক নামে আবির্ভূত হয়েছেন প্রসাদ রায়, ময়ূখ চৌধুরী, সূত্রধর গুপ্ত, আত্মনাম গুপ্ত ; আবার কখনো রাজা রায়, তবে ময়ূখ চৌধুরী নামেই তিনি বেশি পরিচিত। তাঁর কমিক্স একবার যে পড়েছে আজীবন তার হৃদয়ে গাঁথা হয়ে রয়েছে। এই কমিক্সগুলির মূল আকর্ষণ অ্যাডভেঞ্চার, রোমাঞ্চ ও উত্তেজনা— প্রধানত জীবজন্তু ও ইতিহাস-নির্ভর বিষয় নিয়ে তাঁর চিত্রকাহিনি। ১৯৬২-তে প্রকাশিত হয় ময়ূখ চৌধুরীর প্রথম ছবিতে গল্প 'ঋণশোধ'।

তাঁর আঁকা যেকোনো পশুর ড্রয়িং শুধু ভারতবর্ষে কেন সারাবিশ্বের শিল্পীদের চমক দেওয়ার মতো। তুলিতে নিখুঁত রূপ দেওয়ার জন্য তিনি দিনের পর দিন চিড়িয়াখানায় গিয়ে বহু সময় ধরে পশুদের গতিপ্রকৃতি লক্ষ করতেন। তাঁর প্রতিটি গল্পে হৃদয়ের সহানুভূতি দেখা যায়— একটি সাপ তার সন্তানের জীবনরক্ষাকারী একটি মানুষকে নিজের জীবন দিয়ে ঋণ শোধ করে, পশুরাজ সিংহ সারারাত একটি মানুষকে পাহারা দিয়ে রক্ষা করে কারণ ওই মানুষটি একদিন তার প্রাণ রক্ষা করেছিল... ময়ূখ চৌধুরীর গল্পের মধ্যে আছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও অত্যাচারীর শাস্তি এবং নতুন কিছু আবিষ্কার বা পাওয়ার আনন্দ, সেইজন্য প্রতিটি পাঠকের মন জয় করে তাঁর কমিক্স সাহিত্য।

প্রকাশক